প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৬

ইতিহাস

সম্পাদক
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

নবপর্যায় দ্বিতীয় খণ্ড ১ম সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪

ইতিহাস

[ত্রৈমাসিক পত্রিকা]

সম্পাদক

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক

অরুণকুমার দাশগুপ্ত

অমলেন্দু দে

শোভন বসু

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি

৩৩/১, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা আড়াই টাকা
বার্ষিক আট টাকা

71

ইতিহাস কার্যালয়
কাশিমবাজার হাউস
৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
অটো প্রিন্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯, বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা-৬

ইতিহাস বর্ষ ২ সংখ্যা ১ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কর্ণ সুবর্ণ সুধীর রঞ্জন দাস	১
স্মৃতিকথা রমেশচন্দ্র মজুমদার	২২
মাদাম তুসোঁ অজিত নিয়োগী	৩৩
বহু বিবাহ সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা অমীন মুখোপাধ্যায়	৪১
প্রাচীন শিবিজাতির ইতিহাস বেলা লাহিড়ী	৫৪
ভারতে গ্রামীণ সংস্কৃতির উদ্ভব ও প্রসার দিলীপ কুমার চক্রবর্তী	৬২
পত্র পত্রিকায় ইতিহাস	৬৮

ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড] বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৪ [১ম সংখ্যা

কর্ণসুবর্ণ

সুধীররঞ্জন দাশ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কর্ণসুবর্ণের অবস্থান

(১)

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধিশালী রাজধানী কর্ণসুবর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারণ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ বিদ্যমান। ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে পুরাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণ প্রয়াসী হইয়াছেন। কেবলমাত্র হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াই পণ্ডিতগণ বাঙলা ও বিহারের বিভিন্ন প্রত্ন-স্থলের সহিত প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের সম্পর্ক ও স্থিতি নির্ধারণ করিয়াছেন। কর্ণসুবর্ণের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় সম্পর্কিত মতবৈষম্যের প্রধান কারণ :— (১) হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ-বিবরণ সংকলনসমূহে পরস্পর বিরোধী উক্তি এবং (২) বর্তমান স্থিতি নির্ধারণের নিমিত্ত নিশ্চিত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের অবিদ্যমানতা। অতএব প্রথমতঃ প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে প্রকাশিত সর্বপ্রকার অভিমতের ও প্রস্তাবের আলোচনা প্রয়োজন।

(২)

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লেয়ার্ড সর্বপ্রথম কর্ণসুবর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক স্থিতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করেন। কানিংহাম (১৮৭১), বেগলার (১৮৭২), মার্টিন

(১৮৩৮), ফার্গুসন (১৮৭৩) প্রভৃতি কর্ণসুবর্ণের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন স্থান নির্দেশের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ওয়াডেল উপরোক্ত পণ্ডিতগণের প্রস্তাবিত স্থানসমূহ অগ্রাহ্য করিয়া কর্ণসুবর্ণের বর্তমান অবস্থান নির্ণয়ের নিমিত্ত এক নূতন প্রত্নস্থলের সন্ধান প্রদান করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বেভারিজ লেয়ার্ডের অভিমত ও ইঙ্গিত সমর্থন করিয়া মুর্শিদাবাদ জিলায় রাঙামাটি (বর্তমান চিরুটি রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্তী) নামক স্থানের সহিত প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের একত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। বেভারিজ কর্তৃক প্রস্তাবিত কর্ণসুবর্ণের বর্তমান অবস্থিতি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন চক্রবর্তী অগ্রহণীয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ওম্যালে মুর্শিদাবাদের গেজেটিয়ারে বেভারিজের প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। উপরন্তু তিনি মনোমোহনের অভিমতই গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বিভূতিভূষণ বর্তমান রাঙামাটিতে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

(৩)

লেয়ার্ডের প্রস্তাব :

লেয়ার্ডই (১৮৫৩) সর্বপ্রথম মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত ভাগীরথী তীরবর্তী বর্তমান রাঙামাটি অঞ্চলে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে বর্তমান রাঙামাটি 'কার্ণ-সোনা-কা-গড়' (কর্ণসৌবর্ণ-নগর বা কর্ণসুবর্ণ-নগর) নামক প্রাচীন নগরের উপরই অবস্থিত। লেয়ার্ডই সর্বাগ্রে অখ্যাত ও অবিদিত রাঙামাটি-গ্রামের প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা বিবৃত করিয়াছেন। রাঙামাটি অঞ্চলে উচ্চ ঢিবি বা ভাঙা, বিক্ষিপ্ত ইষ্টকখণ্ড ও ইষ্টকস্তূপ এবং অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নবস্তুর নিদর্শন হইতে লেয়ার্ড অনুমান করিয়াছেন যে, এই তল্লাটে একটি প্রাচীন নগর অবস্থিত ছিল। তিনি মনে করেন যে, কর্ণসুবর্ণ মহানগরী বাংলা দেশের মহারাজা 'কার্ণসেন' (কর্ণসেন) নামক এক বিখ্যাত নৃপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই কর্ণসেন নৃপতি সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায় না। লেয়ার্ড মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার অভিমত উইলফোর্ড (১৮০৭) কর্তৃক বর্ণিত মহানগরী কর্ণসুবর্ণ (রাঙামাটি) ধ্বংসের কাহিনী দ্বারা সমর্থিত। তিনি রাঙামাটি অঞ্চলে কর্ণসেনের রাজবাড়ী (রাজবাড়ীডাঙ্গা) ও রাক্ষসীডাঙ্গার উল্লেখও করিয়াছেন। কর্ণ-

রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিরাজমান। রাজবাড়ীর বিশেষ অংশ ভাগীরথী গ্রাস করিয়াছে। লেয়ার্ড বলিয়াছেন যে, রাজবাড়ীর পূর্বদিকে কয়েক বৎসর পূর্বেও একটি তোরণ ও দুইটি বড় বুরুজ ছিল। কিছুদিন পূর্বে উহাও ভাগীরথীর গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমানে এই প্রকার কোন কীর্তিচিহ্নের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বেভারিজ অনুমান করিয়াছেন যে, বর্তমান রাজবাড়ীডাঙ্গা একটি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপেরই প্রত্নস্থল। বেভারিজের এই অনুমান পরবর্তী উৎখনন দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু ১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কানিংহামের প্রত্নতাত্ত্বিক পরিক্রমার বিবরণে রাঙামাটির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমন কি কানিংহাম কর্তৃক প্রকাশিত মানচিত্রেও রাঙামাটির স্থান নির্দেশ চিহ্নিত করা হয় নাই।

(৪)

কানিংহামের প্রস্তাব :

ক্যানিংহাম (১৮৭১) সর্বপ্রথমে চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় স্থানসমূহের বর্তমান ভৌগোলিক স্থিতি সনাক্ত করিবার প্রয়াস আরম্ভ করেন। এই প্রয়াসে কানিংহাম প্রধানতঃ সি-ইউ-কির ভ্রমণ বৃত্তান্তের বর্ণনার উপরই নির্ভর করিয়াছেন। চৈনিক এক লি এক মাইলের $\frac{1}{7}$ বা $\frac{1}{5}$ পরিমাণ দণ্ড নির্দিষ্ট করিয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানের দূরত্ব নির্ধারিত হইয়াছে। কানিংহাম সি-ইউ-কিতে বর্ণিত দিক ও দূরত্বের নির্দেশানুসারে তাম্রলিপ্তি হইতে উত্তর-পশ্চিমে সাতশত লি পথক্রম পরিমাপ করিয়া সিংভূম ও মানভূম জিলার অন্তর্গত পর্বত ও অরণ্যসঙ্কুল স্থানসমূহে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থিতি নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কানিংহাম বলিয়াছেন যে, সুবর্ণরেখা তীরবর্তী সিংভূম ও মানভূমের অন্তর্গত কতিপয় তল্লাটে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অনুসন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু এই পর্বতসঙ্কুল অরণ্য এত অপরিচিত যে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানীর প্রকৃত অবস্থান-নির্দেশের ইঙ্গিত প্রদান করাও সম্ভবপর নহে। বড়বাজার বড়াভূমের প্রধানতম নগর। এই নগরের অবস্থানের সহিত হিউয়েন-সাঙ বর্ণিত কর্ণসুবর্ণের নির্দেশের সঙ্গতি বিদ্যমান। কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের পরিধি ছিল ৪৪০০-৪৫০০ লি অর্থাৎ ৭৩৩-৭৫০ মাইল। সুতরাং সিংভূম ও মানভূমের পর্বতসঙ্কুল স্থানসমূহ কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কানিংহাম কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের সীমারেখার নির্দেশও প্রদান করিয়াছেন।

তিনি মনে করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিমে মেদিনীপুর হইতে সারগুজা এবং উত্তর ও দক্ষিণে দামুদা ও বৈতরণী নদীদ্বয়ের উৎপত্তি স্থলের ভূভাগই কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অঞ্চলে বিশেষতঃ সুইসা এবং সুফরণ (সুফারণ) নামক স্থানদ্বয়ে কতিপয় প্রত্নবস্তুরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বড়বাজার হইতে ১৬ মাইল পশ্চিমে গণ্ডক নামক স্থানে লেখমালাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেগলার (১৮৭২) এই লেখমালাসমূহ শশাঙ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

(৫)

বেগলারের প্রস্তাব :

১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে বেগলার প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ সাফরণ নামক স্থানেই অবস্থিত ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বর্তমান তুলথী হইতে দশ মাইল দূরবর্তী সুইসার সন্নিকটে সুবর্ণরেখা নদীর বামপার্শ্বে 'সাপরণেই' হিউয়েন-সাঙের 'কিরণ-সুফালানার' অবস্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন। বেগলার মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'শাপহরণ' শব্দের অর্থ 'শাপ-বিনাশকারী'। 'সুফালন' ও 'শাপহরণ' অভিন্ন। সুতরাং ইহার সহিত কর্ণসুবর্ণ ও শশাঙ্কের একত্ব করা সম্ভবপর। এইস্থানে অনেক টিবি ও প্রত্নবস্তুর সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু মার্টিন (১৮৩৮) বিহারের ভাগলপুরের নিকটবর্তী কর্ণগড়ের সহিত কর্ণসুবর্ণের সনাক্ত করিয়াছেন।

কানিংহাম ও বেগলার উভয়েই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের বর্তমান স্থান নির্দেশের সন্ধানার্থে কেবলমাত্র সি-ইউ-কির ভ্রমণ-বিবরণের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। উভয়েই জীবনচরিতে বর্ণিত পরিভ্রমণ কাহিনীর সহিত পরিচিত ছিলেন না। তাঁহারা আমাদের প্রস্তাবিত অঞ্চলে প্রাচীন রাজধানী কর্ণসুবর্ণের কোন গুরুত্বপূর্ণ ধ্বংসাবশেষের ও স্মৃতিচিহ্নের সন্ধান বা নির্দেশ পরিবেশন করিতে পারেন নাই। প্রস্তাবিত স্থানসমূহের ভৌগোলিক পরিবেশ এবং জনসাধারণের প্রকৃতি ও চরিত্রের সহিতও সি-ইউ-কির বর্ণনার কোন সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না। কানিংহাম কর্তৃক প্রস্তাবিত স্থানের ভূমি নিম্ন এবং কর্দমাক্ত নহে। উপরন্তু এই নির্দিষ্ট অঞ্চল উচ্চাবচ পর্বতসঙ্কুল এবং মাকড়া-পাথর ও কঙ্কর দ্বারা আবৃত। এই ভৌগোলিক পরিবেশে ঘন লোকবসতি ও নিয়মিত কৃষিকার্য সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু এই স্থানের অধিবাসীদিগকে অনার্যিক ও

জ্ঞানান্বেষণকারী বলিতে পারা যায় না। সুবর্ণরেখা তীরবর্তী সাফারানও রক্তাভ নাকড়া-পাথর ও কঙ্করাবৃত। পরন্তু এইস্থান হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে ওড্র দেশাভিমুখে অধিগমনও সম্ভবপর নহে। মার্টিন কর্তৃক (১৮৩৮) প্রস্তাবিত বিহারের কর্ণগড়ের সহিতও হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ বিবরণের কোন সাদৃশ্য নাই। এমন কোন প্রত্নবস্তুরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই যাহার সাহায্যে উপরোক্ত প্রস্তাবিত স্থানসমূহে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান দৃঢ়তার সহিত প্রতিপন্ন করা সম্ভবপর।

(৬)

ফার্গুসনের প্রস্তাব :

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ফার্গুসন পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জিলার নাগর নামক স্থানে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থান নির্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বর্তমান বর্ধমান জিলার উত্তরাংশ এবং বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জিলা প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফার্গুসন অনুমান করিয়াছেন যে, পরবর্তী-কালে কর্ণসুবর্ণ রাজধানী মুর্শিদাবাদ জিলাস্থ রাঙামাটি নগরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। তাঁহার মতে চীন পরিব্রাজকের কর্ণসুবর্ণ পরিভ্রমণও সন্দেহজনক। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, হিউয়েন-সাঙ পুণ্ড্রবর্ধন পরিভ্রমণান্তে দক্ষিণ-পূর্বদিকে যাত্রা করিয়া সমতটে পৌঁছিয়াছিলেন এবং ভ্রমবশতঃ হিউ-লীর বিবরণে কামরূপের পরিবর্তে কর্ণসুবর্ণের নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফার্গুসনের মতে ভ্রমাত্মক সন্নিবেশ স্বীকৃতও হইয়াছে, কারণ জীবনচরিতের বর্ণনে কর্ণসুবর্ণ হইতে সমতটের দূরত্বের পরিমাপ লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। ফার্গুসন কর্ণসুবর্ণের সীমারেখাও নির্দিষ্ট করিয়াছেন—বর্ধমান জিলার উত্তরাংশ, কৃষ্ণনগর ও যশোহর জিলার বাস্তুভূমি, মুর্শিদাবাদ জিলা (পূর্বদিকে কুমারকালী, পশ্চিমে বিহারের পরিসীমানা এবং দক্ষিণে দামুদা নদী)। উপরন্তু ফার্গুসন তাম্রলিপ্তির সহিত বর্তমান তমলুকের (মেদিনীপুর) একত্ব অস্বীকার করিয়া বীরভূম জিলায় বিন্যস্ত করিয়াছেন।

কিন্তু ফার্গুসনের মতবাদের সহিত হিউয়েন-সাঙের বিবরণের কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না। সি-ইউ-কির ও জীবনচরিতের উভয় বিবরণীতে হিউয়েন-সাঙের কর্ণসুবর্ণ-পরিভ্রমণ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। হিউয়েন-সাঙের বিবরণে দিক-নির্দেশ ও দূরত্বের বর্ণনায় অসামঞ্জস্যের বহুল কারণ

বিদ্যমান। ফার্গুসনের প্রস্তাবিত নাগর নামক স্থানের সহিত হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বিবরণের কোন সঙ্গতিরও সন্ধান পাওয়া যায় না। নাগরের ভূমি নিম্ন ও উর্বর নহে। এতদঞ্চলের জলবায়ু এবং কৃষিকার্য স্বাস্থ্যকর ও ফলপ্রদ বলিয়া মনে হয় না। ভ্রমণ বিবরণে বর্ণিত দূরত্ব ও দিক্-নির্দেশের সহিত চীন-পরিব্রাজকের কর্ণসুবর্ণের পরবর্তী পর্যটনেরও কোন

ঐক্য নাই। ফার্গুসন অবধারণ করিতে পারেন নাই যে, চৈনিক বিবরণে রক্তমৃত্তিকা (রাঙামাটি) নামক বৌদ্ধ সঙ্ঘারামই উল্লিখিত হইয়াছে—রাঙামাটি নগরের নাম নহে (কিন্তু মালয় উপদ্বীপ হইতে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর একটি লেখমালায় রক্তমৃত্তিকা নামক স্থানের উল্লেখ বর্তমান)। উপরন্তু হিউয়েন-সাঙের বিবরণের আলোচনা করিলে প্রমাণিত হয় যে

ফার্গুসনের প্রস্তাবিত নাগর নামক স্থানে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থান সমর্থনযোগ্য নহে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে তাম্রলিপ্তির সহিত বর্তমান তমলুকের একত্ব নিশ্চায়ক।

(৭)

ওয়াডেলের প্রস্তাব :

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ওয়াডেল লেয়ার্ডের প্রস্তাবিত প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তমলুক হইতে উত্তর-পশ্চিমে ৭০ মাইল দূরবর্তী কাঞ্চননগর নামক স্থানের সহিত কর্ণসুবর্ণের একত্ব স্থিরনিশ্চিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কাঞ্চননগর একটি প্রাচীন সহর। ওয়াডেলের মতে কানসোনা নগর কাঞ্চননগরেরই রূপান্তর বা অপভ্রংশ। ওয়াডেল কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রত্নস্থলের মৌলিক ভিত্তি ও তথ্যসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—(ক) কাঞ্চননগর বা কাঞ্চননগর ব্যতীত দামুদা তীরবর্তী কানসোনা খাল বরাবর অপর কোন প্রত্নস্থলের সন্ধান অবিদিত ; (খ) কর্ণসুবর্ণের রূপান্তরিত আকার কাঞ্চননগর এবং কাঞ্চন বা কাঞ্চনের অপভ্রংশ কানসোনা অধিকতর সহজসাধ্য ; (গ) কানসোনা নগরের তাৎপর্য কানসোনা রাজ্যের রাজধানী ; (ঘ) প্রাচীন কাঞ্চননগর নদীগর্ভস্থ হইবার পরে বর্তমান বর্ধমান সহরের প্রতিষ্ঠা ; (ঙ) অধুনা বর্ধমানের নগরোপকণ্ঠে কাঞ্চননগরের অবস্থান ; (চ) প্রাচীন কাঞ্চননগরের স্মৃতিচিহ্ন, পুরাকীর্তি নিদর্শন প্রভৃতি।

প্রাচীন কাঞ্চননগর কারুশিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। কাঞ্চন-নগরের কাঞ্চনথালা বিশেষ প্রসিদ্ধ। বর্ধমানের কোন এক রাজা কাঞ্চননগরের কারুশিল্পীদিগকে নগরের উপকণ্ঠে নূতনগঞ্জ নামক অঞ্চলে স্থানান্তরিত করেন। কাঞ্চননগরে ঢিবি, বিক্ষিপ্ত ইষ্টকখণ্ড, ইষ্টকস্তূপ, প্রভৃতি প্রত্ননির্শন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ওয়াডেল মনে করেন যে হিউয়েন-সাঙের সাধারণ বর্ণনা দ্বারাও কাঞ্চননগর অঞ্চলে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থান সমর্থিত হয়। কিন্তু ওয়াডেল স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, যে, চৈনিক ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্ণিত তমলুক হইতে কর্ণসুবর্ণের দূরত্বের পরিমাপের সহিত বর্তমান কাঞ্চননগরের দূরত্বের কোন ঐক্য নাই। ওয়াডেলের প্রস্তাবিত প্রত্নস্থল তমলুক হইতে

উত্তর-পশ্চিমে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু চীন পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্তে তমলুক হইতে উত্তর-পশ্চিমে কর্ণসুবর্ণের দূরত্ব ১১৬·৬ মাইল। ওয়াডেল মন্তব্য করিয়াছেন যে, হিউয়েন-সাঙের বিবরণে বর্ণিত দিক্-নির্দেশ ও দূরত্বের পরিমাপ গ্রহণ করিলে কর্ণসুবর্ণ মহানগরীকে বিন্ধ্যপর্বতসঙ্কুল অঞ্চলে বিন্যস্ত করিতে হইবে। সুতরাং ওয়াডেল দূরত্বের পরিমাপ হ্রাস করিয়া দামুদা উপত্যকায় কাঞ্চননগরে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের বর্তমান স্থিতি নির্ধারণ করিয়াছেন।

এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে ওয়াডেল যে সব যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন উহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) কাঞ্চননগরে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের বর্তমান অবস্থান চীন-পরিব্রাজকের পরবর্তী উড়িষ্যা পর্যটনের বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত। ওয়াডেল চৈনিক বিবরণে বর্ণিত ইউ-চ উড়িষ্যার অন্তর্গত জাজপুরেই অবস্থিত ছিল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, হিউয়েন-সাঙ কর্ণসুবর্ণ হইতেই উড়িষ্যা পরিভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলেন। (২) চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বর্ণিত কর্ণসুবর্ণের ভৌগোলিক ও অন্যান্য বিষয়ের সাধারণ বর্ণনার সহিত প্রস্তাবিত কাঞ্চননগর অঞ্চলের সাদৃশ্য বর্তমান। (৩) ওয়াডেল কাঞ্চননগরের সন্নিকটে অবস্থিত শশাঙ্ক-নামাঙ্কিত অঞ্চলেরও উল্লেখ করিয়াছেন। (৪) উপরন্তু কাঞ্চননগর অঞ্চলে সোনা নামধেয় কতিপয় গ্রামের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। (৫) এই তল্লাটে কৌরবগণের গড় বা দুর্গেরও স্থিতি ছিল। (৬) এতদঞ্চলের প্রত্নবস্তু-নিদর্শনও কাঞ্চননগরে কর্ণসুবর্ণের অবস্থান সমর্থন করে।

(৮)

ওয়াডেল কর্তৃক নির্ণীত প্রত্নবস্তু-নিদর্শনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখনীয় :—

(ক) কাঞ্চননগরের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঙামাটি নামক স্থানে অনেক ঢিবি, ইষ্টকস্তূপ, বিক্ষিপ্ত ইষ্টকখণ্ড প্রভৃতি কোন প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ বা সঙ্ঘারামের নির্দেশক; (খ) বেলাসুর কাহিনীর স্মৃতিবাহক বেলাপুর গ্রামের পুষ্করিণী হইতে উদ্ধৃত একটি ক্ষুদ্র চৈত্য ও বুদ্ধমূর্তি; (গ) কাঞ্চননগরের সন্নিকটে শালগচ্ছ, খইরপুর, বনগচ্ছ প্রভৃতি অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষ; (ঘ) দামুদা উপত্যকায় অবস্থিত প্রাচীন কানসোনার

স্মৃতিবাহক বর্তমান কানাদীঘি ও কানাপুকুর ; (৬) কাঞ্চননগরের ১২ মাইল দূরবর্তী ও নেমারী হইতে দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে হিউয়েন-সাঙ বর্ণিত বিধর্মীদিগের দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি। এই সকল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে উচ্চ ঢিবির উপর অবস্থিত একটি অলংকৃত মন্দির এবং অন্যান্য ধ্বংসস্তূপ হইতে 'সতদেউলের' বা সপ্তদেবালয়ের অস্তিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক জৈন মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। যেমন—লেখসম্বলিত চন্দ্রপ্রভের মূর্তি, নবগ্রহের প্রতিকৃতি-পরিবেষ্টিত নেমীনাথের মূর্তি প্রভৃতি।

(৯)

উপরোক্ত তথ্য ও প্রত্নিদর্শনের উপর নির্ভর করিয়াই ওয়াডেল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ নগর বর্ধমানের সন্নিকটে কাঞ্চননগরেই অবস্থিত ছিল। তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, বর্তমান বর্ধমান ও হুগলীর বৃহত্তরাংশ, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর পরগণা এবং মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ওয়াডেলের এই সিদ্ধান্ত সর্বাত্মক এবং সর্বসিদ্ধ নহে ঃ—

(১) ওয়াডেল সি-ইউ-কির বিবরণের সাহায্যেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি জীবনচরিতের বর্ণন-তথ্য গ্রহণ করেন নাই। (২) ওয়াডেল রাঙামাটিতে কৌরবগণের গড় বা দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কোন পণ্ডিতই উক্ত গড়ের কাহিনী বর্ণনা করেন নাই। (৩) সি-ইউ-কিতে বর্ণিত দূরত্বের পরিমাপ দ্বারাও ওয়াডেলের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় না। বেভারিজ বলিয়াছেন যে, তাম্রলিপ্তি হইতে দূরত্বের নির্দেশ অনুসারে বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ জিলার রাঙামাটির মধ্যে সামান্য ঐক্য বিদ্যমান। কিন্তু বর্ধমানে কর্ণসুবর্ণের অস্তিত্বের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা সম্ভবপর নহে। (৪) সপ্তম শতাব্দীতে উড়িষ্যার রাজধানী বর্তমান জাজপুরে অবস্থানের কোন যুক্তি নাই। (৫) ওয়াডেল মনে করেন যে, সি-ইউ-কিতে দিক্-নির্দেশ ও দূরত্বের বর্ণনা এক রাজধানী হইতে অপর রাজধানীর সীমারেখায় নিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিউয়েন-সাঙ এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যের সীমান্তরেরই বর্ণন প্রদান করিয়াছেন। (৬) উপরন্তু তমলুক হইতে বর্ধমানের দিক্-নির্দেশ মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি

অপেক্ষা অধিকতর পশ্চিমদিকে। (৭) সি-ইউ-কিতে কর্ণসুবর্ণের ভৌগোলিক ও সাধারণ বর্ণনার সহিতও কাঞ্চননগরের কোন সাদৃশ্য নাই। কাঞ্চননগর একটি অজ্ঞাত গণ্ডগ্রাম। প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের এতদঞ্চলে অবস্থানের কোন নিশ্চায়ক প্রমাণও পাওয়া যায় নাই। (৮) ওয়াডেল বেলাসুরের কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু এই কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি অজ্ঞাত। লেয়ার্ড (১৮৫৩) কেবলমাত্র বেল-তালাওর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন—বেলাসুর নহে। (৯) জীবনচরিতে হিউয়েন-সাঙের বাংলাদেশ পর্যটনের বর্ণনানুসারে চীন-পরিব্রাজক পুণ্ড্রবর্ধন হইতে কর্ণসুবর্ণ মহানগরীতে আগমন করিয়াছিলেন। এই বিবরণ মুর্শিদাবাদ জিলাস্থ বর্তমান রাঙামাটি অঞ্চলেই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের স্থিতির সমর্থক। (১০) কাঞ্চননগর যে কর্ণসুবর্ণের পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত আকার তাহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। (১০) ওয়াডেল কর্তৃক উল্লেখিত ধ্বংসস্তূপ ও প্রত্নবস্তুর বা পুরাকীর্তির মধ্যে এমন কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায় নাই যাহার সাহায্যে হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ এবং উহার উপকণ্ঠে অবস্থিত বহু বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, দেবমন্দির, প্রভৃতির অস্তিত্ব নির্ধারণ করা যায়।

(১০)

বেভারিজ (১৮৯৩) ওয়াডেলের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া লেয়ার্ডের (১৮৫৩) অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি সি-ইউ-কি এবং জীবন-চরিতের তুলনামূলক আলোচনান্তে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কর্ণসুবর্ণ সম্বন্ধে জীবনচরিতের বর্ণনা বহুলাংশ যথার্থ। জীবনচরিতের বর্ণনা অনুসারে চীন-পরিব্রাজক পুণ্ড্রবর্ধন হইতে কর্ণসুবর্ণে উপনীত হইয়াছিলেন। কর্ণসুবর্ণ পরিভ্রমণান্তেই তিনি সমতট পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সমতট পরিক্রমণ সমাপ্ত করিয়া সমুদ্রপথে সিংহল অভিমুখে যাত্রা করিবার অভিপ্রায়ে প্রাচীন বাঙলার প্রধানতম বন্দর তাম্রলিপ্তিতে পৌঁছিয়াছিলেন। অবশেষে চৈনিক-পরিব্রাজক সমুদ্রযাত্রার সংকল্প ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে উড়িষ্যা পরিদর্শনের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। বেভারিজ বলিয়াছেন যে, পুণ্ড্রবর্ধন হইতে দক্ষিণে রাঙামাটির দূরত্ব প্রায় ৭৫ মাইল। কিন্তু চীন-পরিব্রাজক যদি প্রকৃতই বাচপপা (বাসিভা) সঙ্ঘারাম হইতে কর্ণসুবর্ণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া ছিলেন তাহা হইলে মুর্শিদাবাদ জিলার রাঙামাটি

পুণ্ড্রবর্ধন হইতে দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বদিকে হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাঙামাটি পুণ্ড্রবর্ধন হইতে প্রায় ৯৬ মাইল দূরবর্তী। মনে হয় সমতটও রাঙামাটি হইতে পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে ১৮০ বা ১৩৫ মাইল দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। সমতটের সমুদ্র উপকূলে অবস্থান হিউয়েন-সাঙের প্রথম বিবরণের বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয়। এই পরিক্রমণ এবং পথক্রম তথ্য সাধারণতঃ জীবনচরিতের বিবরণের সমর্থক।

(১১)

সি-ইউ-কি বর্ণিত পথ-নির্দেশ দ্বারাও ভাগীরথী তীরবর্তী রাঙামাটি অঞ্চলে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থান প্রতিপাদিত হয়। মুর্শিদাবাদ জিলাস্থ রাঙামাটি তমলুক হইতে প্রায় ২০৭ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। উপরন্তু হিউয়েন-সাঙ কর্তৃক বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর উপকণ্ঠে অবস্থিত রক্তমৃত্তিকা (সঙ্ঘারাম) যথার্থই মুর্শিদাবাদ জিলার রাঙামাটি। বর্তমান রাঙামাটি অঞ্চলে ভাগীরথীর পুরাতন পর্যাঙ্ক হইতে উত্থিত অতি উচ্চ রক্তাভ মাটির খাড়া পাহাড় বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রক্তাভ মৃত্তিকা হইতেই রক্ত মৃত্তিকা বা রাঙামাটি নামের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। এই রাঙামাটি অঞ্চলই পূর্বে কর্ণসুবর্ণ গড় বা কর্ণগড় নামে খ্যাত ছিল। কর্ণসুবর্ণগড় বা কর্ণগড় রাঙামাটি অঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তীমূলক আখ্যা। সুতরাং বেভারিজ মনে করেন যে, মুর্শিদাবাদ জিলায় ভাগীরথী তীরবর্তী বর্তমান রাঙামাটি অঞ্চলেই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থান নিঃসন্দেহে ও দৃঢ়ভাবে স্থিরীকৃত করা যায়।

(১২)

মুর্শিদাবাদ জিলাস্থ রাঙামাটি অঞ্চলে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন যুক্তির ও তথ্যের সংক্ষিপ্ত সারমর্মের উল্লেখ আবশ্যক :—

(১) জীবনচরিতে বর্ণিত পুণ্ড্রবর্ধন হইতে কর্ণসুবর্ণের দিক-নিদর্শন ও দূরত্ব প্রস্তাবিত রাঙামাটি অঞ্চলের সমর্থক। (২) বর্তমান রাঙামাটির কিংবদন্তীমূলক আখ্যা কর্ণসুবর্ণ গড় বা কানসোনাগড় প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থানের স্মৃতিবাহক ; (৩) এতদঞ্চলে প্রচলিত জনশ্রুতি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বর্তমান রাঙামাটি অঞ্চল মহাভারতে বর্ণিত দাতা কর্ণের সহিত সংশ্লিষ্ট। মহাভারতের বিবরণে কর্ণ অঙ্গ দেশেরই রাজা ছিলেন। পুরাকালে

কর্ণসুবর্ণ এই অঙ্গ রাজেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল : (৪ চৈনিক লো-টো-বী-চী বা লো-তো-মো-চীর সংস্কৃত রূপান্তরিত আকার রক্তমৃত্তিকাই বর্তমান রাঙামাটি। রাঙামাটি নাম রক্তমৃত্তিকারই স্মৃতিবাহক। (৫) রাঙামাটির প্রাচীনত্ব মালয় উপদ্বীপে আবিষ্কৃত পঞ্চম শতাব্দীর লিপি হইতে প্রমাণিত হয়। ঐ লিপিতে লিখিত আছে যে, মহানাবিক বুধগুপ্ত রক্তমৃত্তিকার আবাসিক ছিলেন। (৬) বিক্ষিপ্ত ধ্বংসাবশেষ, উচ্চ ঢিবি, ইষ্টক স্তূপ প্রভৃতি পুরাকীর্তি নিদর্শন বর্তমান রাঙামাটি অঞ্চলের প্রাচীনতার নিশ্চায়ক চিহ্ন। এতদঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত প্রস্তর মূর্তি, লেখ সম্বলিত সীল মোহর, মুদ্রা, ষ্টাকো মুণ্ড প্রভৃতি রাঙামাটির প্রাচীনত্বের নির্দেশক। ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নবস্তুর নিদর্শন হইতে স্থিরীকৃত হয় যে, এই রাঙামাটি অঞ্চলেই প্রাচীনকালে একটি মহানগরী সগৌরবে বিরাজমান ছিল। বেভারিজ এই প্রকার উপাদানের উপরই নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জিলার রাঙামাটিতেই যে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের স্থিতি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। এতদঞ্চলেই যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ পরিভ্রমণার্থে আগমন করিয়াছিলেন তাহাও নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

(১৩)

প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বেভারিজের প্রস্তাবিত রাঙামাটি ব্যতীত উপরোক্ত বিভিন্ন পণ্ডিতগণের মনোনীত স্থান সমূহের কোন যৌক্তিক ভিত্তি বা যুক্তি নাই। প্রকৃতপক্ষে রাঙামাটি ভিন্ন পুণ্ড্রবর্ধন হইতে ৯০০ লি দূরবর্তী অপর কোন প্রত্নস্থলের সন্ধানও পাওয়া যায় না। যদি বর্তমান রাঙামাটি অঞ্চলেই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থান অনুমোদিত হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে. হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্ণিত তাম্রলিপ্তি হইতে কর্ণসুবর্ণের দিক্ নির্দেশ উত্তর-পশ্চিমের পরিবর্তে উত্তর-পূর্ব হওয়া সঙ্গত। মুর্শিদাবাদ জিলাস্থ ভাগীরথী তীরবর্তী চিরুটি-রাঙামাটি অঞ্চলে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থানের প্রস্তাব জাপানী পণ্ডিত আদাচিকিতোকু কর্তৃক প্রকাশিত হিউয়েন-সাঙের পরিক্রমার সংশোধিত পথক্রম দ্বারাও সমর্থিত।

(১৪)

কিন্তু বেভারিজের বর্তমান রাঙামাটি অঞ্চলে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থানের প্রস্তাব পরবর্তী পণ্ডিতগণ যুক্তিসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ারে ওম্যালে রাঙামাটি অঞ্চলে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থানের প্রস্তাব অনিশ্চায়ক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু ওম্যালে কর্ণসুবর্ণের অবস্থানের অপর কোন স্থান নির্দেশের সমর্থনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা তথ্য পরিবেশন করিতে পারেন নাই। তিনি কোন বৈকল্পিক প্রস্তাবও উত্থাপন করেন নাই। ওম্যালে কেবল মাত্র রাঙামাটি সম্বন্ধে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মনোমোহনের অভিমত ও যুক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। মনোমোহন মনে করেন যে, রাঙামাটির সহিত প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের একত্ব-করণের তথ্য ও যুক্তি-রক্তমৃত্তিকা ও রাঙামাটির নামের অনুরূপতা, ইওয়ান চোঙ কর্তৃক বর্ণিত দিক্-নির্দেশ এবং বিভিন্ন প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার গ্রহণযোগ্য নহে। উপরন্তু রক্তাভ নাকড়া-পাথর বিশিষ্ট মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত রাঙামাটি নামক অনেক অঞ্চলের (রাজমহল হইতে ময়মনসিংহ জিলা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে) সন্ধান পাওয়া যায়। রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের ভূমিকার বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে রাঙামাটি অঞ্চলই কোন এক সময় কর্ণস্বর্ণ বা কানসোনা নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু মনোমোহন মনে করেন যে, এই সাধারণ নামসাদৃশ্য হইতে বর্তমান রাঙামাটি অঞ্চলে কর্ণসুবর্ণের অবস্থান প্রতিপন্ন করা সঙ্গত নহে। তাঁহার মতে রাঙামাটি গ্রামের নাম কোন প্রাচীন হিন্দু বা মুসলমান গ্রন্থে উল্লেখিত হয় নাই। প্রাক্-ভ্যালেনটিন (১৭২৬) মানচিত্রে রাঙামাটি অঞ্চল নামাঙ্কনেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। মনোমোহন মন্তব্য করিয়াছেন যে, রাজা মানসিংহ ফতেসিং পরগণার অন্তর্ভুক্ত রাঙামাটি অঞ্চল এক উত্তর দেশীয় ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। বর্তমান রাঙামাটি অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষ ঐ ব্রাহ্মণের বা তাঁহার বংশধর কর্তৃক নির্মিত দুর্গেরই স্মৃতিচিহ্ন। অধিকন্তু তিনি কর্ণসুবর্ণের সহিত গৌড়ের (লক্ষ্মণাবতী) একত্ব করিয়াছেন। তাঁহার মতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও লক্ষ্মণাবতীর অস্তিত্ব ছিল। গৌড়ের মৃত্তিকাও রক্তাভ। সুতরাং রক্ত মৃত্তিকা বা রাঙামাটি এবং কর্ণসুবর্ণ গৌড়েই অবস্থিত ছিল।

(১৫)

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বিভূতিভূষণও বর্তমান রাঙামাটিতে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থান সম্পর্কিত মতবাদ অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে রাঙামাটিতে ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দের উৎখননের ফলে এখন কোন অদৃশ্য এবং প্রত্যক্ষ প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার সাহায্যে এতদঞ্চলে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থিতি নিশ্চায়ক বলিয়া ধার্য করা যায়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ফতেপুর পরগণার ইতিহাসে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত জামুই রাজবাটির ধ্বংসাবশেষ হইতে উদ্ধৃত ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত একটি কুলপঞ্জীর সংকলন করিয়াছেন। এই কুলপঞ্জী সংকলন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কমলা রায়ের কংস ও গৌরী নামক দুই পুত্র ছিল। গৌরীর কোন বংশধর জন্মায় নাই। কিন্তু কংসের বংশধর ছিল (কমলারায়তনয়ৌ কংস গৌরীতি বিশ্রুতৌ। জ্যেষ্ঠঃ সন্তানকৃত প্রোক্তো গৌরী রায়ো-হন পত্যাকঃ)। উক্ত সংকলনে বর্ণিত কুলক্রম বা বংশাবলী পত্র হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ফতেপুর পরগণার জামুই রাজবংশের কমলা রায় সবিতা রায়ের পৌত্র ছিলেন। কংসপুত্র মুকুটের কোন বংশধর ছিল না। কিন্তু কংসের ভ্রাতুষ্পুত্র জয়রাম গঙ্গাতীরে অতীব উচ্চ এক শিবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গঙ্গায় অবগাহনের নিমিত্ত সিঁড়িও নির্মিত হইয়াছিল। সবিতা রায়ের প্রত্যেক বংশধর স্বীয় নামাঙ্কিত অনেক গ্রাম ও নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত কুলজীগ্রন্থে বর্ণিত উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া বিভূতি-ভূষণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কানসোনাগড় অর্থাৎ রাঙামাটি ফতেসিং পরগণার অধিনায়ক কংস কর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মনোমোহনের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রাক্ ১৭২৬ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে রাঙামাটি নামাঙ্কিত কোন স্থানের সন্ধান পাওয়া যায় না। অধিকন্তু ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে রাক্ষসীডাঙা নামক প্রত্নস্থলে উৎখননের ফলে এমন কোন প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই যাহার উপর নির্ভর করিয়া রাঙামাটি অঞ্চলে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের প্রকৃত অবস্থান স্থিরীকৃত হয়। বিভূতিভূষণ মনে করেন যে, হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ মহানগরীকে রাঙামাটি অঞ্চলে সংস্থাপন করিবার কোন যুক্তি নাই। পরন্তু রাঙামাটি অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষ কংস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবালয়

ও রাজ প্রাসাদের স্মৃতিচিহ্ন-পরিচায়ক। বর্তমান রাঙামাটির কানসোনা নাম ও কংস বা কন্‌সো শব্দের ব্যুৎপাদক। উপসংহারে বিভূতিভূষণ ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দের উৎখনন-বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, ইতিহাস তথ্যানুসন্ধানকারীগণ কুলপঞ্জিকার তথ্যের প্রামাণিকতা বিচার করিলে রাঙামাটি অঞ্চলে কর্ণসুবর্ণের স্থিতি অপ্রমানিত হইবে। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ও অনেক প্রবন্ধে রাঙামাটি অঞ্চলে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থান সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যুক্তি ও তথ্যের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা যায় না।

(১৬)

১৯০৮ এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন এবং বিভূতিভূষণ কর্তৃক প্রকাশিত অভিমত ও প্রস্তাব যুক্তিসিদ্ধ নহে। মনোমোহন কর্তৃক গৌড়ে কর্ণসুবর্ণের অবস্থানের প্রস্তাব যুক্তিবিরুদ্ধ। গৌড়ে কর্ণসুবর্ণের অবস্থানের সহিত হিউয়েন-সাঙের বিবরণের কোন সঙ্গতি নাই। এমন কোন প্রথা বা নিদর্শনও পাওয়া যায় নাই যাহার সাহায্যে গৌড়ে কর্ণসুবর্ণের অবস্থান স্বীকার করা যায়। কুলজী গ্রন্থোক্ত তথ্যও সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নহে। কুলজী সংকলনের উপকরণ অন্য কোন স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ তথ্য দ্বারা সমর্থিত না হইলে নির্ভরযোগ্য উপাদান বলিয়া স্বীকার করা অনুচিত। এই ক্ষেত্রে কুলজী পঞ্জিকার উপাদান অপ্রমাণিত। উপরন্তু কুলজী সংকলনে বর্ণিত ফতেসিং পরগণার অধিনায়কের নাম কংস—কন্‌সো নহে। কংস শব্দ কানসোনায় রূপান্তরিত হওয়াও সম্ভবপর নহে। কংস বা কানসো কর্তৃক কানসোনা নগর প্রতিষ্ঠার অভিমতও গ্রহনীয় নহে। এমন কোন নিদর্শনও পাওয়া যায় নাই যাহার সাহায্যে স্থিরীকৃত করা যায় যে বর্তমান রাঙামাটির ধ্বংসাবশেষ জামুই রাজবংশের রাজপ্রাসাদের ও দেবালয়ের স্মৃতিচিহ্ন বাহক। অধিকন্তু প্রাক্ ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্রেও রাঙামাটি নামাঙ্কিত স্থানের নির্দেশ অবর্তমান। মানচিত্রে নাম অঙ্কিত না থাকিলেও রাঙামাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিলুপ্ত হয় না। কারণ মুসলমান আক্রমণের ফলেই কর্ণসুবর্ণ মহানগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরবর্তী ইতিহাস আলোচনা হইতে প্রমাণিত হইবে যে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাঙামাটি অঞ্চল প্রখ্যাত ছিল। তবে একথা স্বীকার্য যে, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে

এবং তৎপরেও কোন নিশ্চায়ক প্রত্নবস্তুর সাহায্যে বর্তমান রাঙামাটিতে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থান স্থিরীকৃত করা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু রাঙামাটির সহিত কর্ণসুবর্ণের একত্বের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিদ্যমানতা প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের এতদঞ্চলে অনবস্থিতিও প্রমাণীকৃত হয় না। রাঙামাটি অঞ্চলে ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দের উৎখনন একটি মাত্র টিবিতে সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা সত্ত্বেও উৎখনন-বিবরণে উৎখনক বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের অবস্থিতির প্রমাণের তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। অধিকন্তু কানসোনা নামের বর্তমান অসত্তা রাঙামাটি অঞ্চলে কর্ণসুবর্ণের অবস্থানের প্রতিকূল নহে। শব্দকল্পদ্রুমের ভূমিকায় রাজা রাধাকান্ত দেব মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে কর্ণস্বর্ণ বা কানসোনা নামের অস্তিত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। কুলজী গ্রন্থের এবং অধুনা প্রচলিত কিংবদন্তীর কাহিনী দ্বারা রাঙামাটি অঞ্চলে কান সোনা নামের সত্তা প্রমাণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে লেয়ার্ড রাঙামাটিকেই 'কাণসানা-গড়' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

(১৭)

সর্বপ্রথম লেয়ার্ডই রাঙামাটি অঞ্চলে কানসোণার সত্তা প্রকাশ করেন। শব্দকল্পদ্রুমের ভূমিকায় রাজা রাধাকান্তদেব তাঁহার বংশের কুলপঞ্জী বর্ণন করিয়াছেন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে রাধাকান্ত দেবের পূর্বপুরুষ হরিদেব মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে কর্ণস্বর্ণ সমাজে বাস করিতেন। শব্দকল্পদ্রুমের বর্ণনানুসারে রাজা রাধাকান্ত দেব হরিদেব হইতে পঞ্চবিংশ বংশপুরুষ ছিলেন। রাধাকান্ত দেব ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতি পুরুষানুক্রমের নিমিত্ত ২৬ বৎসর ধার্য করিলে প্রমাণিত হয় যে, হরিদেব দ্বাদশ শতাব্দীতে কর্ণস্বর্ণ সমাজে বাস করিতেন। বেভারিজের (১৮৯২) মতে সিংহলের রাজা পরাক্রমবাহু কর্তৃক বিধ্বস্ত হইবার পূর্বে হরিদেব কর্ণসুবর্ণেই বাস করিতেন। পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে যে কর্ণস্বর্ণ এবং কানসোনা কর্ণসুবর্ণেরই রূপান্তরিত এবং প্রাকৃত রূপ। দেববংশধরগণ যে কর্ণস্বর্ণ বা কান সোনা নামক স্থানে বসবাস করিতেন উহার প্রমাণ পূর্বোল্লিখিত কুলজীগ্রন্থের বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হয়।

(১৮)

শব্দকল্পদ্রুমের ও কুলপঞ্জিকার বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, কর্ণস্বর্ণে বা কাণসোনায় দেববংশজাত কায়স্থগণ বাস করিতেন। উপরোক্ত তথ্য দ্বারা মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে কর্ণস্বর্ণ বা কানসোনার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। বর্তমান মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী রাঙামাটি ব্যতীত কর্ণস্বর্ণ বা কানসোনা নামধেয় অপর কোন স্থানের সন্ধান অদ্যাপি অজ্ঞাত। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লেয়ার্ডই প্রথম মুর্শিদাবাদস্থ বর্তমান রাঙামাটি অঞ্চলকেই কানসোনা নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন-সাঙের ভারত-পরিভ্রমণ বিবরণে বর্ণিত কর্ণসুবর্ণের বর্তমান রাঙামাটি অঞ্চলেই অবস্থিতির প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য। কিন্তু ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এমন কোন নিশ্চায়ক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় নাই যাহার সাহায্যে বর্তমান রাঙামাটি অঞ্চলে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অবস্থান দৃঢ়তার সহিত স্থিরীকৃত করা যায়। এই কারণ বশতঃই ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান অজ্ঞাত ও অনিশ্চায়ক ছিল। এমন কি মুর্শিদাবাদ জিলাস্থ বর্তমান রাঙামাটি অঞ্চলে কর্ণসুবর্ণের অবস্থিতি সন্দেহজনক বলিয়াও অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে।

(১৯)

উপরোক্ত আলোচনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক স্থান-নির্দেশ সম্পর্কিত মতান্তরের প্রধান কারণ—হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সংকলনসমূহে কর্ণসুবর্ণ সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী বর্ণনা এবং অদৃশ্য বা নিশ্চায়ক প্রত্নবস্তুর অবিদ্যমানতা। কোন পণ্ডিতই কর্ণসুবর্ণের বর্তমান অবস্থানের স্বীয় প্রস্তাবের পক্ষে কোনপ্রকার প্রত্যক্ষ বা নিশ্চায়ক প্রমাণ উপস্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই। এই কারণ বশতঃই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান বহুদিন যাবৎ নিশানদিহি বা সনাক্তকরণ সম্ভবপর হয় নাই। পণ্ডিতগণের সর্বপ্রকার ঐকান্তিক প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রাচীন বাঙলার প্রখ্যাত রাজধানী কর্ণসুবর্ণ কালস্রোতে যে কোন্ এক অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট স্থানের মৃত্তিকাগর্ভে বা নদী গর্ভে শায়িত তাহা অবিদিত রহিল।

(২০)

চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর এবং উহার উপকণ্ঠে অবস্থিত বিখ্যাত রক্তমৃত্তিকা-সঙ্ঘারামের বর্তমান অবস্থান প্রমাণসিদ্ধ এবং নিশ্চায়ক প্রত্নবস্তুর সাহায্যে স্থিরীকৃত করিবার নিমিত্ত ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ মুর্শিদাবাদ জিলাস্থ সদর মহকুমার অন্তর্গত চিরুটি রেল ষ্টেশনের নিকটবর্তী বহুপুর গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত রাজবাড়ীডাঙা নামধেয় প্রত্নস্থলে উৎখনন আরম্ভ করে। প্রথম বৎসরের উৎখননেই বহু ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়। উৎখনিত প্রত্নবস্তুর মধ্যে বহু লেখসম্বলিত পোড়ামাটির সীলমোহরের অবিষ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল সীলমোহরের মধ্যে রক্তমৃত্তিকা-মহাবিহার কর্তৃক প্রচারিত কতিপয় সীলমোহর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র সরকার এই সীলমোহরের লেখ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। সীলমোহরে লিখিত আছে— এই সীলমোহর প্রখ্যাত রক্তমৃত্তিকা-মহাবিহারের ভিক্ষুসংঘের। পরবর্তী উৎখননেও রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার নামাঙ্কিত আরও অনেক সীলমোহর উদ্ধৃত হইয়াছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে রাজবাড়ীডাঙার উৎখনন বিবরণে সীলমোহর সম্পর্কিত সর্বতঃ তথ্য নির্ণয় করা হইবে। লেখ সম্বলিত সীলমোহর ও আবিষ্কৃত অন্যান্য প্রত্নবস্তুর সহায়তায় রাজবাড়ীডাঙা অঞ্চলে হিউয়েন-সাঙ বর্ণিত রক্তমৃত্তিকা সঙ্ঘারামের বর্তমান অবস্থান সুদৃঢ়রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ বিবরণের সকল সংকলনেই কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর উপকণ্ঠে বা সন্নিকটে অবস্থিত রক্তমৃত্তিকা সঙ্ঘারামের উল্লেখ ও বর্ণনা বিদ্যমান। সুতরাং রাজবাড়ীডাঙার নিকটবর্তী অঞ্চলেই যে হিউয়েন-সাঙ কর্তৃক বর্ণিত কর্ণসুবর্ণের অবস্থান ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। রাজবাড়ীডাঙার উৎখনন বিবরণ দ্বারাই এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হইবে। প্রাচীন বাংলার প্রথম সার্বভৌম নৃপতি মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ জিলার রাঢ়ভূমির অন্তর্গত চিরুটি অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। রাজবাড়ীডাঙা উৎখননের ফলে বহুদিন যাবত অজ্ঞাত ও অনিশ্চিত রক্তমৃত্তিকা এবং কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান সম্প্রতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। [ক্রমশঃ]

প্রমাণ পঞ্জী

Bagchi, P. C., She-Kia-Fang-Che, 1959.

Basak, R. G., History of North Eastern India, 1934.

Beal, S.,Life of Hiuen Tsang, 1911.

Beal, S., Si-Yu-Ki, Buddhist Records of the Western World, Vols. I&II, 1884 (1906).

Beglar, Archaeological Survey of India Report, Vol. VIII., 1878.

Beveridge, H., The Site of Karnasuvarna (J. A. S. B. 1893).

Beveridge, H., Old Places of Murshidabad (Calcutta Review, 1892).

Blochman, H., Contributions to the Geography and History of Bengal (J. A. S. B., Vols. XLII & XLIII, 1873).

Buchanan, F., An Account of the District of Bhagalpur, 1939.

Chakravarti, M., Notes on the Geography of Old Bengal (J. A. S. B. 1908).

Chakravarti, R., History of Gauda (in Bengali), 1909.

Cowell, E. B. and Thomas, F. W., Harshacharita of Bana (Eng. Trans), 1897.

Cunningham, A., Archaeological Survey of India Reports, Vols. XV (1882) and Vol. VII (1878)

Cunningham, A. The Ancient Geography of India, 1871.

Dey, N. L., Notes on the History of the District of Hughli or the Ancient Rada (J. A. S. B., 1910).

Dey, N. L., Notes on Ancient Anga or the District of Bhagalpur (J. A. S. B. 1914).

Epigraphia Indica, Vols. XII & XVIII.

Fleet, Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III., 1888.

Fergusson, J., On Hiouen-Thsang's Journey from Patna to Ballabhi (J. R. A. S., 1873).

Gastrel, J. E., Statistical and Geographical Report of Murshidabad, 1860.

Hunter, W. W., Statistical Account of Bengal, Vol. IX., 1876 ; Vol. VII, 1878.

Indian Antiquary, Hiwan Thsang's Account of Harshavardhana from Julien's Memoirs.

Indian Antiquary, Vol. IX., Extract from Ma-Twan-Lin, Book CCXXXVIII, Fol. 14.

Julien, S., Si-Yu-Ki, 1857.

Julien, S. Life of Hiuen Tsang, 1853.

Layard, F. P., The Ancient city of Kansonapuri now called Rangamutty (J. A. S. B., 1853).

Long, Rev. The Banks of the Bhagirathi (Calcutta Review, 1846).

Majumdar, R. C., History of Bengal, Vol. I., 1943.

Majumdar, R. C., The History and Culture of the Indian People, Vol, III., 1954.

Martin, M., Eastern India, Vols. I & II, 1836-38.

Mukherji, B. B., Final Report on the Survey Settlement in the District of Murshidadad, 1938.

Mukherji, B., Indian Literature in China, 1931.

O'Malley, L. S. S., Bengal District Gazeteer, Murshidabad, 1914.

Ray, H. C., Dynastic History of Northern India, Vol. I., 1931.

Ray, N. N., History of Murshidabad (in Bengali), 1309 B. S.

Reinard, Memoir on India before the 11th Century, 1849 (Quoted in Beveridge's article).

Sabdakalpadruma By Radhakanta Deva (Ist Kanda). (Athargrantha Kartuvam Savarnanastokah), P. 110

Sastri, S. N., Cunningham's Ancient Geography of India, 1924.

Sen, B. C., Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal, 1942.

Sen, P. C., Some Janapadas of Ancient Radha (I. H. Q., Vol. VIII).

Stewart, C., History of Bengal, 1847.

Vasu, N. N., The Castes and Sects of Bengal (in Bengali), Vols. I (1321), VI (1340), IV (1336) and III (1335).

Waddell, L. A., Discovery of the Exact Site of Asoka's Classical Capital of Pataliputra, the Palibothra of the Greeks and Description of the Superficial remains, 1892.

Watters, T., On Yuan Chwang's Travels in India, Vols. I & II., 1904-5.

Wilford, F., An Essay on the Sacred Isles in the West... (Asiatick Researches, Vol. IX. 1807). An account of the Karna Kings (Asiatick Researches Vol. IX, 1807).

স্মৃতিকথা

রমেশ চন্দ্র মজুমদার

[আমার স্মৃতিকথা প্রকাশিত হবে, একথা কয়েক দিন পূর্বেও ভাবতে পারিনি। ডঃ প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত এ দায়িত্বভার আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অনেক কাজের মধ্যে স্মৃতিকথা রচনার পরিশ্রম নিজে করতে পারব এমন সময় ও সুযোগ আমার নেই। শ্রীঅমলেন্দু দে আমার সামনে বসে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমার জীবনের ঘটনাবলীর খসড়া নোট করে নিচ্ছেন। আমি পড়ে এবং সংশোধন করে প্রকাশের অনুমতি দিচ্ছি। এভাবেই স্মৃতিকথা ধারাবাহিকভাবে লেখা হবে। ডঃ প্রতুল চন্দ্র গুপ্তের আগ্রহ ও শ্রীঅমলেন্দু দের চেষ্টায় এই স্মৃতিকথা প্রকাশ সম্ভব হল।]

আদি নিবাস ও আমার শৈশবকাল : পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার খান্দারপাড়া নামক এক ছোট গ্রামে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর আমার জন্ম হয়। এই গ্রাম তখন মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে গোপালগঞ্জ মহকুমার অধীনে আসে। আমার পিতা হলধর মজুমদার ত্রিপুরা স্টেটের আগরতলা রাজার উকিল ছিলেন। তিনি সেখানে একা থাকতেন। মাঝে মাঝে ছুটিতে গ্রামে আসতেন এবং পরিবারের দেখাশোনা করতেন। আমার ঠাকুর্দ্দা রতনমণি মজুমদার জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন। আমার জ্যাঠাইমার কাছে শুনেছি যে, আমার ঠাকুর্দ্দার বিমাতা সহমরণে যান। সম্ভবতঃ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তা অনুষ্ঠিত হয়। আমার জ্যাঠাইমা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং আমি তাঁর মুখে এই বিবরণ শুনেছি। সহমরণের খবর পেয়ে থানার দারোগা আমাদের বাড়ী এসে বললেন, সহমরণে যাওয়া বে-আইনী। তিনি ঠাকুর্দ্দার বিমাতাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি স্বেচ্ছায় সহমরণে যাচ্ছেন? না, কেউ জোর করে, অথবা প্রলোভন দেখিয়ে সহমরণে যেতে বলছে? তিনি বলেন যে, তিনি স্বেচ্ছায়

সহমরণে যাচ্ছেন। মনের দৃঢ় ইচ্ছা প্রমাণ করবার জন্য দারোগার সামনে একটি সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে হাতের একটি আঙুল সম্পূর্ণভাবে তিনি পুড়িয়ে ফেলেন। এই ঘটনার পর দারোগা আর তাঁকে বাধা দেননি। আমাদের গ্রামে একটি কালী মন্দিরের কাছে একটি শ্মশানঘাট ছিল। সেখানেই তিনি সহমরণে যান। হাজার হাজার লোক এসেছিল ঐ দৃশ্য দেখতে। সহমরণের জায়গায় গ্রামবাসীরা একটি বেলগাছ লাগিয়েছিল। ছেলেবেলায় আমরা ঐ গাছের কাছে প্রায়ই যেতাম। তারপর ঐ অঞ্চলে আর কোন সতীদাহ হয়নি।

আমার ঠাকুর্দার ছয় পুত্র—তিন পুত্র দেশে থাকতেন, আর তিনজন বাইরে চাকুরী করতেন। আমাদের ছিল যৌথ পরিবার: পরিবারে লোক ছিল প্রায় ৩০ জন। গ্রামে আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। যে সামান্য জমি ছিল তা থেকে বছরে আয় হত মাত্র ৩০।৪০ টাকা। আমার পিতাকে বৃহৎ পরিবার ভরণ-পোষণ করতে হত। শৈশবে দারিদ্র্যের মধ্যে আমরা মানুষ হয়েছি। কোন রকমে আমাদের সংসার চলত। দুচারদিন অন্ন জোটেনি, এমন ঘটনাও মনে পড়ে। আমার পায়ে জুতাও ছিল না। পাঁচ ছ' বছর বয়সে 'নিমা'র মতো (ফতুয়ার মতো দেখতে) এক প্রকার ৪।৬ আনা মূল্যের জামা প্রথম পরি। সে দিনগুলি ছিল খুব দুঃখের। আমাদের খড়ের ঘর ছিল। লোকে শত্রুতা করে দুবার আমাদের ঘরে আগুন দেয়। আমরা যখন বড় হই, তখন টিনের ঘরে বাস করতাম। আমাদের ঘরে মাটির মেঝে, বাঁশ ও হোগলার বেড়া ছিল। আমার যখন দেড় বছর বয়স তখন আমার মাতা বিধুমুখী দেবী পরলোক গমন করেন। তারপর জ্যাঠাইমাই আমাকে মানুষ করেন। আমার মাতামহ প্রসন্ন কুমার সেন মহারাজা রাজবল্লভের ষষ্ঠ-অধস্তন পুরুষ ছিলেন। আমার মাতা তাঁর একমাত্র সন্তান।

আমি গ্রামের এম. ই স্কুলে পাঁচ বছর বয়সে ভর্তি হই। একটি খড়ের ঘরে (পূর্ববঙ্গে ছন বলে) আমাদের ক্লাস হত। কাঠের বেঞ্চিতে আমরা বসতাম। শিক্ষকদের জন্য কাঠের চেয়ার ও ছোট টেবিল ছিল। চারজন শিক্ষক ছিলেন। কয়েকজন মুসলমান ছাত্রও ছিল। তবে আমাদের স্কুলে কোন মৌলবী ছিলেন না।

আমাদের গ্রামের চারপাশে কেবল মুসলমান ও নমঃশূদ্র পরিবারের বাস ছিল। ঐ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক ভাল ছিল। ক্লাসে কয়েকজন মুসলমান ছাত্রের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। আমাদের গ্রামের পাশের লস্কর পাড়ার লালমিঞা বা জলিলুর রহমান লস্করের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। লালমিঞা তালুকদার ছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি আমার কলকাতার বাড়ীতে এসেও আমার সংগে দেখা করে গেছেন। সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন। আমি ক্লাসের মুসলমান বন্ধুদের বাড়ীতে যেতাম। তাঁদের বাড়ীতে ফলমূল খেয়েছি। আবার ওঁরা আমাদের বাড়ীতে আসতেন। আমার পরিচিত মুসলমান পরিবারের মহিলারা পর্দ্দানশীন ছিলেন।

গ্রাম অঞ্চলে খাল-বিল-নদী-নালা ছিল বলে ছেলেবেলাতেই আমি সাঁতার কাটতে শিখি। বড়দের সংগে মাছ ধরতে যেতাম। আমি নৌকা ও ডোঙ্গা বাইতে শিখেছিলাম। এমনকি কলাগাছের 'ভেলা'য় চড়েও বেড়িয়েছি। বর্ষাকালে গ্রামের লোকেরা নৌকা, ডোঙ্গা বা কলাগাছের ভেলায় চড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করত।

কলকাতায় আগমন ও আমার ছাত্রজীবন : গ্রামের স্কুলে আমি শেষ পরীক্ষা ('মাইনর' পরীক্ষা) দিতে পারিনি। সেখানে সেকেণ্ড ক্লাশ পর্যন্ত আমি পড়েছি। আমার বড়দাদা প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এক সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ৭৫ টাকা বেতনে শিক্ষকতার কাজ পাওয়ায় আমি ও মেজদাদা সতীশচন্দ্র মজুমদার পড়ার জন্য কলকাতায় চলে আসি। আমার বড়দাদা আমার চেয়ে এগার বছরের বড় ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে আমি কলকাতায় আসি। আমি ও মেজদাদা মাতামহ প্রসন্ন কুমার সেনের সঙ্গে কালীঘাটের সিকদার পাড়া রোডের (এখন মহিম হালদার রোড) একটি খোলার ঘরে থাকতাম। তখন আমার মাতামহের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তাঁর দুখানি খোলার ঘর ছিল। বড়দাদা আমাদের খরচ পত্র দিতেন। তিনি কুমারটুলীর গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজের (বড়দাদার দাদাশ্বশুর) বাড়ীতে থাকতেন। আমরা তিন ভাই ছিলাম। বড়দাদা খুবই কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তাঁর সাহায্য ও যত্নে আমার ও মেজদাদার পড়াশোনা চলে। বড়দাদা কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং

পরে হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁর একটি প্রেস ও চা বাগান ছিল। সম্ভবতঃ বড়দাদা গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে তিনি কোনদিন আমাদের কিছু বলেননি। তিনি কখনও জেলে যাননি। তবে তিনি রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান করতেন। বড়দাদার 'কমলা প্রেস' থেকে ভূপেন দত্তদের 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রথম ছাপানো হয়। পুলিশের গণ্ডগোলের সময় 'যুগান্তর' কমলা প্রেস থেকে সরিয়ে অন্যত্র ছাপানো হয়। ডঃ ভূপেন দত্তের গ্রন্থে প্রকাশচন্দ্র মজুমদার সম্পর্কে যে-সব তথ্য রয়েছে তা থেকে বড়দাদার সঙ্গে গুপ্ত সমিতির যোগাযোগের খবর পাওয়া যায়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বড়দাদা পরলোক গমন করেন।

আমার মেজদাদা সতীশ চন্দ্র মজুমদার আমার চেয়ে চার বছরের বড় ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ ভাব ছিল। কারণ দীর্ঘকাল আমরা একসঙ্গে থেকেছি। বড় হয়েও এই সম্পর্ক বজায় ছিল। মেজদাদা গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস. সি ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। তিনি 'ইম্পিরিয়াল সার্ভিস' নিয়ে প্রথমে মাদ্রাজে যান ; পরে বদলী হয়ে বাংলা দেশে আসেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মেজদাদা পরলোক গমন করেন। মেজদাদা ইঞ্জিনিয়ারিং (জলসেচন) সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি River system of Bengal সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

আমি কলকাতায় প্রথমে 'সাউথ সুবার্বন স্কুলে' ফিফ্থ ক্লাশে ভর্তি হই। তখন ঐ স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন বেনীমাধব গাঙ্গুলী। আমাদের দুটি কি তিনটি সেক্সান ছিল। প্রতি সেক্সানে প্রায় পঞ্চাশ জন করে ছাত্র ছিল। পরীক্ষায় ভালো ফল করে ফিফ্থ ক্লাশ থেকে ফোর্থ ক্লাশে উঠলাম। এ জন্য স্কুল থেকে পুরস্কার পাই। ফোর্থ ক্লাসে দ্বিতীয় কি তৃতীয় হয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। তারপর আমি 'জেনারেল এসেম্বলী স্কুলে' থার্ড ক্লাশে ভর্তি হই। ঐ স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন মন্মথ বসু। কিন্তু ওখানেও আমি বেশীদিন ছিলাম না। ঐ স্কুলে থাকাকালীন আমার জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। আমার এক জেঠতুতো ভাই কটন স্কুলে কাজ করতেন। তিনি এক জমিদার পুত্রের 'গার্ডিয়ান টিউটর' হয়ে কলকাতায় থাকার প্রস্তাব

পেলেন। ঠিক হল, আমি ও মেজদাদা তাঁর সঙ্গে থাকব। এই আশায় মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের কাছে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে আমি ও মেজদাদা বাস করতে লাগলাম। কিন্তু সেই জমিদার পুত্র আর কলকাতায় পড়তে আসেনি। এক মাস ঐ বাড়ীতে ছিলাম। বাড়ীওয়ালা আমাদের কাছে ভাড়া চায়। কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ ছিল যে, বাড়ীভাড়া দিতে না পারায় আমরা দুভাই একদিন গভীর রাতে ঐ বাড়ী থেকে পালিয়ে যাই। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকের ঘটনা। ওখানে যখন ছিলাম তখন আমরা এক 'বিশুদ্ধ হিন্দু হোটেলে' ৮ পয়সা কি ১০ পয়সা খরচ করে ডাল-ভাত-মাছ খেতাম। ঐ বাড়ী পরিত্যাগের পর অবস্থা এমন হয় যে, আর কলকাতায় থাকা সম্ভব হল না।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমি ও মেজদাদা ঢাকা শহরে চলে যাই। সেখানে আমার মায়ের মামার বাড়ীতে ছিলাম। তিনি উকিল ছিলেন। আমরা দু'ভাই ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলে ভর্তি হই। তিন মাস মায়ের মামার বাড়ীতে থেকে আমরা স্কুল হোষ্টেলে চলে গেলাম। প্রতি মাসে হোষ্টেল খরচ ছিল ৭৷৷ টাকা। বড়দাদা আমাদের টাকা পাঠাতেন। ঢাকার 'রাজেন্দ্র হিন্দু হোষ্টেলে' আমরা ভালোই ছিলাম। ঢাকায় আমি থার্ড ক্লাশে পড়ি। পরীক্ষায় ভালো ফল করে পুরস্কার পাই। আমি এক বছর ঢাকায় ছিলাম। সেখানে অধ্যাপক সত্যেন ভদ্র আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি ঢাকা কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমাকে সেক্সপীয়রের একটি ইংরাজী নাটকে পার্ট দেন। ভালো অভিনয় করায় অনেকেই আমার প্রশংসা করেন।

সেকেণ্ড ক্লাশে উঠে আমি হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে চলে আসি এবং সেখানে হোষ্টেলে থাকি। মেজদাদা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকাতে এনট্র্যান্স পরীক্ষা দেন। তিনিও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হুগলী কলেজে ভর্তি হন। বড়দাদা হুগলী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক হয়ে আসেন। তখন আমরা তিন ভাই একবাড়ীতে থাকতাম। বড়দাদা ওখানে এক বছর ছিলেন। তারপর তিনি হিন্দু স্কুলে চলে যাওয়ায় আমি ফার্স্ট ক্লাশে হিন্দু স্কুলে ভর্তি হই। আবার বড়দাদা সেখান থেকে কটকে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে বদলী হন। আমিও ঐ স্কুলে চলে যাই। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মেজদাদাও কটকে কলেজে ভর্তি হন। বাবাও অবসর গ্রহণ করে কটকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এই প্রথম বিদেশে

বাবাকে নিয়ে একসাংগে থাকবার সুযোগ হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কটক স্কুল থেকে আমি এনট্রান্স পরীক্ষা দিই। ডঃ সুশীলকুমার দে আমার সহপাঠী ছিলেন। আমরা দুজনেই বৃত্তি পাই। মেজদাদাও বৃত্তি পেয়েছিলেন।

বড়মামা চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি সুরু করেন। আমি এফ. এ পড়তে বরিশাল যাই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে আমি ব্রজমোহন কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হই। রজনীকান্ত গুহ ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। তখন মহাপ্রাণ অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালের বিখ্যাত নেতা। তিনি প্রতি সপ্তাহে কলেজে ধর্ম ও নীতিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের পাঠ দিতেন। সবাই অশ্বিনীবাবুকে দেবতা জ্ঞান করতেন। বিখ্যাত বিপ্লবী সতীশ চক্রবর্তী তখন বরিশালে ছিলেন। এঁদের সবাইকে দেখবার ও তাঁদের বক্তৃতা শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়। আমি কলেজ বোর্ডিং-এ একটি খড়ের ঘরে থাকতাম। একদিন তা ঝড়ে উড়ে যায়। অশ্বিনীবাবুর নির্দ্দেশে এই কলেজের ছাত্রদের নিয়ে একটি সেবাদল গঠন করা হয়। দুঃস্থ ও রুগ্নদের সেবা করাই ছিল এর কাজ। আমিও একবার একজন কলেরা রোগীর শুশ্রূষা করেছিলাম। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সমাজ সেবার মনোভাব জাগ্রত করা হত। আবাসিক বিদ্যালয়ের আদর্শ সামনে রেখে কলেজটি পরিচালিত হত। কলা-বিজ্ঞান মিলিয়ে প্রায় ৬০০ ছাত্র ছিল। আমার মনে পড়ে যে. ক্ষেত্রমোহন ঘোষ (অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষের পিতা) আমাদের ইংরাজী পড়াতেন। কিন্তু বরিশালে আমি বেশীদিন থাকতে পারিনি। ওখানে আমি প্রায়ই হজমের গোলমালে ভুগতাম। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমি কলকাতায় এসে রিপন কলেজে ভর্তি হই।

অবশ্য শারীরিক কারণ ছাড়া আরও দুটি কারণে আমি রিপন কলেজে পড়বার সিদ্ধান্ত করি। প্রথমতঃ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের কাছে পড়বার আগ্রহ এবং দ্বিতীয়তঃ, রিপন কলেজে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ। আমার জ্ঞাতি ভাই অম্বিকা মজুমদার, যিনি পরে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের কাছে আমাকে

বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য একটি চিঠি লেখেন। তার ফলে রিপন কলেজে সুবিধা পাই। তখন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রিপন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিপিন বিহারী গুপ্ত, রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিত ও হারান বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ কলেজে অধ্যাপনা করতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়। তাঁর সংগে আমার পরিচয় ছিল। আমি রিপন কলেজে এফ, এ ক্লাসে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে আমি এফ, এ পাশ করি। সেবার মাত্র ৫২ জন প্রথম বিভাগে পাশ করে ছিলেন। তখন পরিচিতরা সবাই আমাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ পড়তে উপদেশ দেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কলেজের বি. এ ক্লাসে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে ভর্তি হই। এই সময় থেকে একটি বিষয় নিয়ে অনার্স পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। পূর্বে দুইটি বিষয় নিয়ে অনার্স পরীক্ষা দেওয়া চলত।

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পার্সিভাল আমাদের ইতিহাস ও সেক্সপীয়র পড়াতেন। অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ সেন ও অধ্যাপক জে এন দাশগুপ্তের কাছে আমি ইতিহাস পড়েছি। অধ্যাপক দাশগুপ্ত ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস পড়াতেন। বি. এ পরীক্ষায় আমরা তিনজন ঐ কলেজ থেকে অনার্স পেয়েছিলাম। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই। কিন্তু 'পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ' ৩২ টাকা করে পাই। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকেই আমি এম. এ পড়তাম। অধ্যাপক ওটেন, অধ্যাপক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, অধ্যাপক জে. এন. দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক নীলমণি চক্রবর্তী আমাদের ইতিহাস ক্লাস নিতেন। অধ্যাপক দাশগুপ্ত অশোকের শিলা-লিপি সম্বন্ধে পড়াতেন। তিনি অবশ্য এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। নীলমণিবাবু সংস্কৃত ও পালির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমার ঐহিক বিষয় 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস' পড়াতেন। নীলমণিবাবু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জানতেন। নীলমণিবাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন, এবং তাঁর অধীনে তিন বছর গবেষণা করেছিলেনন। আমাকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আমি এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি। প্রথম হয়েছিলেন শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়। পাশ করার পর সুবোধ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক হন। আমি এম. এ পাশ করে আইন পড়ি। ফার্স্ট পার্ট পাশ করে কিছুদিন আমি গুণদাচরণ সেনের আর্টিকল্ড ক্লার্কও ছিলাম।

অধ্যাপক নীলমণি চক্রবর্তীর পরামর্শে আমি গবেষণা সুরু করি। গবেষণার কাজে সুবিধা হবে মনে করে নীলমণিবাবু আমাকে পটলডাঙ্গা স্ট্রীটে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ীতে নিয়ে যান। আমি গবেষণা করতে চাই শুনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'গবেষণা করে কিছু হবে না. চাকুরী কর গিয়ে। আশুবাবুর আমলে কোন গবেষণা হবে না ইত্যাদি।' বুঝলাম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপর খুব ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন। তখনও তিনি আমাদের বসতে বলেন নি। তারপর নীলমণিবাবু আস্তে আস্তে বললেন যে, 'এই ছেলেটি খুব ভালো, ওকে দেখিয়ে দিন, দেখবেন গবেষণায় সাফল্য লাভ করবে।' তখন তিনি আমাদের বসতে বললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি সত্যি পড়াশোনা করবে তো ? ঐ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এখন মস্তবড় হয়ে গেছে. আর দেখাই করে না'। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে গবেষণা করতেন। তিনি রাখালবাবুকে খুব স্নেহ করতেন। এই সব কথা বলার পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে কতকগুলি বই পড়তে বললেন এবং পরে আবার দেখা করতে বললেন। একদিকে গবেষণার জন্য পরিশ্রম করছি. আবার চাকুরীরও খোঁজ করছি। কারণ চাকুরী না করলে আমার চল্‌বে না। এমন সময় ঢাকা কলেজে একটি পদ (প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস) খালি হল। আমি আবেদন করলাম। কিন্তু আমার ঐ কাজটি হল না। আমার সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম. এ পাশ করেছিল এমন এক সহপাঠী ঐ পদে মনোনীত হলেন। কারণ তাঁর দাদামশায় রায়বাহাদুর ও রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে পি. আর এস-এর জন্য আমি থিসিস দাখিল করি। একেবারে শেষ তারিখে থিসিস জমা দিতে গিয়ে দেখি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিনী ভট্টাশালী. পি. আর. এস.-এর জন্য থিসিস জমা দিতে এসেছেন। আমি রাখাল বাবুকে বললাম, 'আপনি এবার থিসিস দিচ্ছেন জানলে আমি দিতাম না। কারণ আপনি যখন থিসিস জমা দিচ্ছেন তখন আমার পি. আর. এস পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।' কিন্তু ফল বের হলে দেখলাম আমি পি. আর. এস পেয়েছি। আমার থিসিসের পরীক্ষক ছিলেন ডঃ

জি, থিবো। আমার বিষয় ছিল 'অন্ধ্র কুষাণ আমল' (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় অব্দ থেকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)। 'বিক্রম সম্বতের' উৎপত্তি সম্বন্ধে আমি নূতন মত ব্যক্ত করি। ডঃ থিবো আমার থিসিসের খুবই প্রশংসা করেন। পি. আর. এস হওয়ায় আমি ৪০০০ কি ৪৫০০ টাকা পেলাম। বাৎসরিক গবেষণার রিপোর্টের ভিত্তিতে তিন বছরে এই টাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাই। প্রতি বছর আমার গবেষণার রিপোর্ট আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীলকে দিতে হত। এই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় এবং আমার গবেষণা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হত। প্রথমবার তিনি আমার গবেষণা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটা রিপোর্ট পাঠান যার মর্ম সিণ্ডিকেট ঠিক বুঝতে পারেনি। ফলে আমার টাকা বন্ধ হয়ে যায় এবং ভয়ানক অসুবিধায় পড়ি। রেজিষ্ট্রার জ্ঞান ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের রিপোর্টের কথা আমাকে বললেন। আমি ডঃ শীলের কাছে গিয়ে আমার অসুবিধার কথা বলতেই তিনি আমাকে টাকা দেওয়ার জন্য জোর সুপারিশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চিঠি দেন। সব কথা শুনে তিনি মন্তব্য করেন, 'এই তো সিণ্ডিকেটের সদস্যরা, যারা একটি ইংরাজী রিপোর্টও বুঝতে পারেন না।'

আমি পি. আর. এস. পাওয়ার পর আমার বাবার খুব ইচ্ছা হল যে, আমি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হই। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যায় ঐ পদের জন্য দুটো নাম মনোনীত করে সরকারকে পাঠাতো। তারমধ্য থেকে একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নির্বাচিত হত। বাবা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন আমার নাম পাঠাবার জন্য। স্যার আশুতোষ বাবাকে বললেন, 'আপনার পুত্রকে গবেষণা করতে দিলেই সব দিক থেকে ভাল হত।' শেষ পর্যন্ত বাবার অনুরোধে স্যার আশুতোষ আমাকে মনোনীত করলেন এবং আমার নামই প্রথমে দিলেন। যথারীতি দার্জিলিং-এ ইণ্টারভিউ দেওয়ার জন্য সরকার থেকে নির্দেশ এলো। আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারিনি এবং আমার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরীও হয়নি। কেন ? সে-কথাই এখন বলব।

বি. এ পরীক্ষা দেওয়ার ৫।৬ মাস পূর্বে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আমার বিবাহ হয়। আমার শ্বশুর দীনবন্ধু সেন বরিশালের একজন বড়

উকিল ছিলেন। তাঁর জমিদারীও ছিল। তাঁর আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলায়। তাঁর চার ছেলে ও চার মেয়ে। তাঁর ছোট মেয়েকে আমি বিবাহ করি। দার্জিলিং-এ ইণ্টারভিউ দিতে যাওয়ার কয়েক দিন পূর্বে পূজার সময় আমার স্ত্রী ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা তখন কলকাতায় চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীটে বাস করতাম। বাড়ীতে আমি ও আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না। এই অবস্থায় স্ত্রীকে ফেলে রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। সব খবর দিয়ে দার্জিলিং-এ জরুরী টেলিগ্রাম করলাম। আমার যাওয়া সম্ভব হল না। সরকার দ্বিতীয় ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন। এই ঘটনায় পরিবারের সকলেই খুব বেদনা অনুভব করেন। কিন্তু এই ঘটনা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। ঐ দিনগুলির কথা ভাবলে বারে বারে আমার মনে হয় যে, বিধিনির্দ্দিষ্ট পথ বেয়েই তো আজীবন আমাকে চলতে হল। তাই আমার পক্ষে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়া সম্ভব হল না। ইতিহাস গবেষণার পথ বেছে নিলাম।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা ট্রেনিং কলেজে একটি পদ খালি হওয়ায় সরকার থেকে আমাকে নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেয়। ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ কাজে যোগ দিই। এখানে বয়স্ক শিক্ষকদেরও পড়াতে হত। তারমধ্যে আমার দুজন শিক্ষকও ছাত্র ছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত আমি সেখানে কাজ করি। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায় ভারত সরকারের ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের অফিসার নিযুক্ত হওয়ায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী ছেড়ে দেন। সুবোধ স্যার আশুতোষের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে তিনি আমার খবর জিজ্ঞেস করেন ও সুবোধকে বলেন যে, 'তুমি রমেশকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দাও সে যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেয়।' সুবোধ আমাকে টেলিগ্রাম করল। আমি কলকাতায় এসে স্যার আশুতোষের সঙ্গে দেখা করলাম। স্যার অশুতোষ বললেন যে, 'ডঃ থিবো তোমার খুব প্রশংসা করেছেন। আমি স্নাতকোত্তর ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা ও গবেষণা দুইই নূতন করে ভালভাবে গড়ে তুলতে চাই। তোমাকে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিতে হবে। এখন কিছু অসুবিধা এবং অনিশ্চয়তা থাকলেও ভবিষ্যৎ তোমার ভালোই হবে।' আমি ভেবেচিন্তে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করি এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে

অধ্যাপনার কাজে যোগদান করি। এখানে কাজে যোগ দেওয়ায় ঢাকা ট্রেনিং কলেজ থেকে এপ্রিল, মে ও জুন মাসের আমার প্রাপ্য বেতন পাইনি। প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি প্রাচীন ভারত ও ইউরোপের ইতিহাস পড়াতাম। এইভাবে আমার জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

[ক্রমশঃ]

মাদাম দুপ্লেক্স

অজিত নিয়োগী

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচেরীতে দুপ্লেক্সের মর্মর মূর্তি উন্মোচন উপলক্ষে মঁসিয়ে এফ্ লো (Monsieur F. Laude) নামে এক ভদ্রলোক একটি ঐতিহাসিক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তিকার ভূমিকায় ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনায় দুপ্লেক্সের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন যে, দুপ্লেক্সের যে কোন ঐতিহাসিক মূল্যায়ন অপূর্ণ থাকবে যদি ঐ প্রসঙ্গে ইতিহাসের পাতায় মাদাম দুপ্লেক্সের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কোন সঙ্গত বিচার না হয়। যে রমণী দুপ্লেক্সের সুখ-দুঃখের সাথী, যিনি দুপ্লেক্সকে রাজনীতি ও কূটনীতির জটিল সমস্যায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক পটে যাঁর প্রভাব নানাভাবে প্রতিফলিত—ইতিহাসে তাঁর কৃতিত্ব বিচার বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। মঁসিয়ে এফ্ লো-এর মন্তব্যই বোধ হয় মঁসিয়ে লুই গুয়ে (Monsieur Louis Guet) নামে আর এক ইতিহাস রসিককে "Revue Maritime et coloniale-এর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর সংখ্যায় "Les origins de L' Inde Francaise Jeanne Begum" লিখতে প্রেরণা দেয়। ঐ প্রবন্ধে মঁসিয়ে লুই গুয়ে মাদাম দুপ্লেক্সের সৌন্দর্য, নিখুঁত আচার-ব্যবহার, সাহসিকতা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং ক্ষুরধার বুদ্ধির উচ্চ প্রশংসা করে উল্লেখ করেন যে, ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পণ্ডিচেরীতে যে-সব ঘটনা ঘটেছিল তার প্রত্যেকটির উপর মাদাম দুপ্লেক্সের প্রভাব বিদ্যমান। প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি লিখেছেন, "পণ্ডিচেরীতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি (মাদাম দুপ্লেক্স) তাঁর প্রাচ্য দেশের ভাষা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের সাহায্যে হিন্দু রাজন্যবর্গের রাজনৈতিক গোলক ধাঁধার মধ্যে অগ্রসর হলেন। সতর্ক প্রহরিণী, বুদ্ধিমতী, সাহসিনী, চমৎকার দোভাষী এই রমণী ভারতীয় ভাইসরয়ের রক্ষাকর্ত্রী জাদুকরীর ভূমিকায় আবির্ভূতা হলেন, যাঁর জাদুদণ্ড হল একটি সোনার কলম, একটি ঐন্দ্রজালিক রাজদণ্ড।" চন্দননগরে থাকাকালীন এই অনন্যসাধারণ মহিলা ছিলেন দুপ্লেক্সের ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক প্রধান সচিব,

ইংরেজ কর্তৃক পণ্ডিচেরী অবরোধের সময় তাঁর আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী এবং দক্ষিণ ভারতে হিন্দু রাজন্যবর্গের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনায় বৈদেশিক মন্ত্রী। সুতরাং ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে এই ধুরন্ধর রাজনীতি-সচেতন এবং কূটনৈতিক বিদ্যায় পারদর্শিনী রমণীর ভূমিকা কোন কারণেই অবহেলা করা যায় না। দীর্ঘকাল পরে মাদাম গাবলে (Madame Gaebele) এই রমণীর বহুমুখী কর্ম-তৎপরতার বিচার করেছেন "Creole et grande Dame" গ্রন্থে। এই প্রবন্ধটি রচনার জন্য মাদাম গাবলের গ্রন্থের উপর বেশী নির্ভর করতে হয়েছে। ইতিহাসে এই রমণী Jeanne Theodore, Jeanne Vincent এবং Madame Dupleix—এই তিন নামেই পরিচিত।

১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন পণ্ডিচেরীতে জঁান-এর (Jeanne) জন্ম হয়। পিতা থিয়োদর আলবার জ্যাক্ (Theodore Albert Jacques) ছিলেন কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর সার্জেন্ট আর মাতার নাম ছিল এলিজাবেথ, রস্ দ্য ক্যাস্ত্রো (Elizabeth, Rose de Castro)। এলিজাবেথের পিতা ছিলেন পর্তুগীজ এবং মাতা দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রমণী। ক্যাথলিক মিশন জঁানকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করে জোহানা বেগন (Johanna Begnon) নামটি উপহার দেয়। সে যুগের পণ্ডিচেরীর ইউরোপীয় সমাজে জঁান-এর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ঈর্ষা ও লুব্ধতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছিল। সামাজিক আচার ব্যবহারেও তিনি ছিলেন বেশ কেতাদুরস্ত। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে জঁান-এর সঙ্গে জ্যাক ভঁাসাঁত্বের (Jacques Vincent) বিবাহ হয়। জ্যাক ভঁাসাঁত্ব ছিলেন ফরাসীদেশের মঁপিল্যার প্রদেশের বাসিন্দা। প্রথমে তিনি পণ্ডিচেরীর Societie Maritimes des Messieurs de Saint Malo-এর গ্রন্থাগারিক ছিলেন। কিছুকাল পরে ঐ প্রতিষ্ঠানটি লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় জ্যাক্ পণ্ডিচেরীর তৎকালীন গভর্ণরের কৃপায় পণ্ডিচেরীর মন্ত্রণা পরিষদে একটি চাকুরী পান। বিবাহের সময় জঁান্-এর ভাই বোনেরা ছিল নাবালক। তাই পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে নাবালক ভাইবোনদের লালন পালন ব্যাপারে মাকে সাহায্য করতে পিতৃগৃহে চলে আসতে হয়।

১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট আতলান্ত জাহাজে জ্যাক্ ফ্রঁাসোয়া দুপ্লেক্স পণ্ডিচেরীতে আসেন। ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সাতাশ বছরের

এই যুবককে পণ্ডিচেরীর মন্ত্রণা পরিষদের প্রধান সদস্য এবং সৈন্য বাহিনীর প্রধান পদের দায়িত্ব দিয়ে ভারতবর্ষে পাঠান। এই যুবকের কর্তৃত্ব অনেকেরই ঈর্ষার কারণ হয় এবং শীঘ্রই তাঁকে কোম্পানীর কর্মচারীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বলি হতে হয়। কিছুদিন পরেই ফ্রান্স থেকে প্রেরিত এক আদেশনামা বলে তাঁর পদাবনতি ঘটে। তাঁকে মসুলিপট্টমের বাণিজ্য বিভাগের সহকারী এজেন্টের পদ গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। দুপ্লেক্স অত্যন্ত বিরক্ত এবং অপমানিত বোধ করেন এবং কর্তৃপক্ষের আদেশ অগ্রাহ্য করার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু কয়েকজন সহানুভূতিশীল সহকর্মী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি মন্ত্রণা পরিষদের চতুর্থ পদটি গ্রহণ করেন। এই সময়ে দুপ্লেক্স ছিলেন প্রায় নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব এবং অসহায়। বিদেশ-বিভূঁইএ জীবনের চরম হতাশার মুহূর্তে যে ব্যক্তি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এলেন তিনি হলেন জ্যাক ভাঁসান্ত। জ্যাক ভাঁসান্তের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাঁধা-ধরা বৈচিত্র্যহীন কর্মজীবনের একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভাঁসান্ত পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করতেন। জাঁন-এর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিদিনই দুপ্লেক্সের সঙ্গে জাঁন্-এর গল্প গুজব হত অধিকাংশ সময়েই দুপ্লেক্স বক্তা, আর জাঁন্ শ্রোতা। দুপ্লেক্স বলতেন সুদূর ফরাসী দেশের কথা, সেখানকার সমাজ জীবন এবং ভার্সাই প্রাসাদের নানা বিচিত্র গল্প। অচেনা দেশের গল্প শুনতে শুনতে জাঁন্ ধমনীর মধ্যে উত্তেজিত রক্তের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করতেন—অনুভব করতেন অদেখা-অজানার প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ। গল্পের সঙ্গে সমান তালে চলত খানা-পিনা। ভাঁসান্ত পরিবারেই তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় রান্নার সঙ্গে পরিচিত হন। ক্রমেই দুপ্লেক্স জাঁন্-এর প্রতি এক আকর্ষণ বোধ করতে লাগলেন। ভিন্‌দেশী এই অপরিচিত মানুষটি প্রত্যহের গতানুগতিক জীবন ও মানসিক অশান্তি থেকে কিছুক্ষণের জন্যও মুক্তি পাওয়ার আশায় জাঁন-এর সাহচর্য কামনায় উৎসুক হয়ে থাকতেন এবং ঐ সখ্যতাকে স্মরণীয় করতে প্রায়ই জাঁন্‌কে মূল্যবান উপহার দিতেন। পরবর্তীকালে ফরাসী দেশে দারিদ্র্য যখন চূড়ান্তভাবে তাঁদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তখন এই মূল্যবান উপহারগুলি বিক্রী করে সংসারের প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহ করা হত।

দুপ্লেক্স এবং জাঁন্-এর মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হ'ল যখন দুপ্লেক্স

চীনদেশ থেকে ফিরে এলেন। তিনি চীনদেশে পাড়ি দেন ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে। ক্যাণ্টন বন্দরে কোম্পানীর কোন এক কর্মচারীর কাছ থেকে কোম্পানীর অর্থ তছরূপ করার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হন এবং এই অভিযোগের তদন্ত কালে তিনি সাময়িক ভাবে কর্মচ্যুত হন। পরে এই অভিযোগ প্রত্যাহার করে ডুপ্লেক্সকে তাঁর পূর্বপদে অধিষ্ঠিত করা হয়। অনেকেই এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কপর্দকহীন অবস্থায় দীর্ঘ আঠার মাস তিনি পণ্ডিচেরীতে ভাঁসাস্ত পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। মার্টিনো এই অভিমত সমর্থন করেন না। সে যুগে একবার চীন দেশে যেতে পারলে যে কোন লোকই সহজে পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা রোজগার করতে পারত। ডুপ্লেক্সও একথা স্বীকার করেছেন। সুতরাং অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য আতিথ্য গ্রহণ না করলেও জাঁন্-এর অতিথি পরায়ণতায় মুগ্ধ হয়েই তিনি ভাঁসাস্ত পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

১৭৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি ঘটনা জাঁন্-এর জীবনকে বিষাদময় করে তোলে। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে জাঁন্-এর এগার বছরের কন্যা ক্যাথারিণের মৃত্যু হয় এবং ডিসেম্বর মাসে মৃত্যু হল পুত্র ফ্রাসোয়া যোশেফের। পুত্রকন্যাদের মৃত্যু সত্ত্বেও জীবনে সবচেয়ে বেশী ব্যথা পেলেন ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যখন ডুপ্লেক্স চন্দননগরের গভর্ণর এবং মন্ত্রণা পরিষদের সদস্য হয়ে চলে গেলেন। পুত্র কন্যাদের মৃত্যুতে তিনি শোকগ্রস্থা হয়েছিলেন ঠিকই; কিন্তু প্রিয় বন্ধুর বিচ্ছেদ বেদনায় তিনি মুষড়ে পড়লেন। এবং চন্দননগরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ডুপ্লেক্সও অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলেন।

চন্দননগরে চলে এলেও ভাঁসাস্ত পরিবারের সঙ্গে ডুপ্লেক্সের সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ভাঁসাস্ত পরিবারকে বাংলাদেশের সম্পদের কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশে চলে আসার আমন্ত্রণ জানালেন এবং একথা স্পষ্ট করেই লিখলেন যে, বাংলাদেশে এলে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁদের উপর প্রসন্নই হবেন। জ্যাক্ ভাঁসাস্তও এতদিনে বুঝেছিলেন যে পণ্ডীচেরীতে পদোন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। ডুপ্লেক্সের আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি ভাবলেন বাংলাদেশ তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই নূতন পরিবেশের সঙ্গে তিনি সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারবেন কিনা—এটাই হল সমস্যা। কিন্তু জাঁন-এর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং প্রভাবের কাছে তিনি নতি স্বীকার করলেন এবং বাংলাদেশে পাড়ি দেওয়ার দুঃসাহসিক

সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেললেন। যে রমণীর ধমনীতে পর্তুগীজ রক্ত প্রবাহিত তাঁরপক্ষে নিজেকে শান্ত এবং নিরাপদ গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব নয়। তাই জঁান-এর তাগিদে জ্যাক্ ভাঁসান্ত চললেন ভাগ্যোন্নতির সন্ধানে; আর স্বামীর ভাগ্যোন্নতির অজুহাতে জঁান পুরানো বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হতে। জঁান-এর এই মিলন-আকাঙ্খার মধ্যে রোমান্স রস-স্নিগ্ধ কোন এক সম্ভাব্য পরিণতিকে কি একেবারেই উপেক্ষা করা চলে?

১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি ভাঁসান্ত পরিবারের সকলেই চন্দননগরে হাজির হলেন। কিছুদিন আগেই দুপ্লেক্স চন্দননগরের কাছেই সাতগাছিয়াতে একটি বাগান বাড়ী কিনেছিলেন। ভাঁসান্ত পরিবারের সাতগাছিয়াতে ঐ বাগানবাড়ীতেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। দুপ্লেক্স অবশ্য থাকতেন অরলিয়ঁ দুর্গে।

চন্দননগরে দুপ্লেক্সকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হ'ত। শাসন যন্ত্র পরিচালনা ছাড়াও ফরাসী কোম্পানীর বাণিজ্যিক উৎকর্ষের দিকে তাঁকে দৃষ্টি দিতে হ'ত। এছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসাও বেশ প্রসার লাভ করেছিল। কিছুদিন তিনি ক্রীতদাস ব্যবসা করেছিলেন; পরে অবশ্য সে ব্যবসা গুটিয়ে দেন। ফরাসী বাণিজ্য জাহাজগুলি সে যুগে মানিলা ফিলিপাইন, মোজাম্বিক, জেড্ডা প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যিক সামগ্রীর আদান প্রদান করত। ব্যক্তিগত ব্যবসা তত্ত্বাবধানের জন্য দুপ্লেক্সের একজন বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন ছিল। অন্য বিদেশী বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগের জন্য এবং চিঠিপত্র মুসাবিদা করার জন্যও ঐ ধরণের আর একজনের সাহায্য তিনি বহুদিন ধরেই অনুভব করছিলেন। ভাঁসান্ত পরিবার চন্দননগরে চলে আসায় তাঁর এই সমস্যার সমাধান হ'ল। জ্যাক ভাঁসান্তকে দুপ্লেক্স তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করলেন। কর্মোপলক্ষে জ্যাক্‌কে প্রায়ই ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন দেশে অভিবাহিত করতে হ'ত এবং একাজে তিনি বেশ কিছু উপার্জ্জন করতেও সক্ষম হন। আর জঁান্‌কে নিযুক্ত করলেন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে। দুপ্লেক্স ফরাসী ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা জানতেন না অথচ বিদেশী বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সংযোগ রক্ষার জন্য বিদেশী ভাষা জানা আবশ্যক। একাজে তাঁকে সাহায্য করলেন জঁান্। কয়েকটি ভারতীয়

এবং বিদেশী ভাষার উপর তাঁর বেশ দখল ছিল। ফরাসী ছাড়াও ইংরেজী, তামিল, পার্সী এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলতে পারতেন। চন্দননগরে থাকার সময় বাংলাও কিছু কিছু শিখেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন দুপ্লেক্সের একজন অনুরক্ত সচিব। গৃহস্থালির কাজে যেমন তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সাংগঠনিক কাজেও তিনি সমান দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রাখলেন। বস্তুতঃপক্ষে দুপ্লেক্সের ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব জঁান নিজের হাতে তুলে নিলেন। এছাড়া যে কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলেই দুপ্লেক্স জঁান-এর সঙ্গে আলোচনা করতেন। দুপ্লেক্সের প্রধান সচিবের পদে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এর পর থেকে তাঁদের সম্পর্ক স্বাভাবিক ভাবেই আরও ঘনিষ্ঠ হতে থাকে।

দুপ্লেক্স এবং তাঁসান্ত পরিবারের চন্দননগরের দিনগুলি বেশ সুখেই কাটছিল। কিন্তু পণ্ডিচেরীকে তাঁরা ভুলতে পারেননি। সুতরাং পণ্ডিচেরীতে ফিরে যাওয়ার একটা প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা তাঁরা সব সময়েই পোষণ করতেন। একটি সুযোগ এল ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছর পণ্ডিচেরীর অস্থায়ী গভর্ণর লেনোয়ার (Lenoir) মারা গেলেন। দুপ্লেক্স আশার আলো দেখলেন। লেনোয়ারের পদে তিনি নিযুক্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুমাকে (Dumas) ঐ পদে নিযুক্ত করা হল। আশাহত হলেন বটে, কিন্তু অধৈর্য হয়ে পড়লেন না। ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কেরাজান (Kerajan) নামে দুপ্লেক্সের এক ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু তাঁকে বেশ বিচলিত করে তোলে। কেরাজান ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁকে নানা ভাবে সাহায্য করতেন। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে পিতৃবিয়োগের সংবাদে তিনি শোকে ভেঙ্গে পড়লেন। এ সময়ে তিনি একবার ফ্রান্স থেকে ঘুরে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে এ ইচ্ছা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। জঁান্ জীবনে আরও একটি অপ্রত্যাশিত আঘাত পেলেন ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে। জ্যাক্ তাঁসান্ত দুপ্লেক্সের ব্যক্তিগত ব্যবসা তত্ত্বাবধানের জন্য নানা দেশে যাতায়াত করতেন। দীর্ঘদিন একটানা পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর জেড্ডা থেকে ফেরার ন'মাস পরে তিনি পরলোক গমন করেন। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে জঁান্ বিধবা হলেন। সাতটি সন্তানের জননী জঁান-এর সর্বকনিষ্ঠ কন্যাটির বয়স তখন মাত্র তিন বছর।

স্বামী এবং পুত্র-কন্যা হারিয়ে জঁান অসহায় হয়ে পড়লেন। তাঁর ভবিষ্যত তখনও অনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু দুপ্লেক্সের সঙ্গে জঁান-এর ক্রমবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতা যাঁদের নজরে এসেছিল তাদের অনেকেই জ্যাক্ ভাঁপাস্তের জীবদ্দশাতেই গোপনে জঁান্‌কে মাদাম দুপ্লেক্স নামে ডাকতেন। স্বামী-পুত্র-কন্যাদের বিয়োগে ব্যথিত হলেও খুব শীঘ্রই শোকের আঘাত কাটিয়ে উঠে তিনি ১৭৪১ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল চন্দননগরে দুপ্লেক্সের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। তখন থেকে প্রকাশ্যে তিনি মাদাম দুপ্লেক্স নামেই পরিচিত।

এই বিবাহ দুপ্লেক্স এবং জঁান-এর জীবনে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই মিলনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাও ছিল। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জঁান-এর কর্মপটুতা কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যদিও তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বহুবিচিত্র গুণাবলীর সঙ্গে সে সময়ে অনেকেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের পর জঁান-এর কর্মক্ষেত্র আরও প্রসারিত হল এবং দক্ষিণ-ভারতের রাজনীতিতে তিনি প্রায় প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়লেন। এই বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁর চরিত্রের সুপ্ত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ ঘটল। আর দুপ্লেক্সের জীবনেও জঁান্-এর প্রয়োজন ছিল ব্যক্তিগত কারণে, প্রয়োজন ছিল ফরাসীদের স্বার্থে এবং ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থে।

দুপ্লেক্স পণ্ডিচেরী ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা একেবারে ত্যাগ করেননি। ডুমা পণ্ডিচেরীর গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ার পরেও দুপ্লেক্স পণ্ডিচেরী তথা দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক গতির উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে চলছিলেন। দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে তখন পণ্ডিচেরীর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া পণ্ডিচেরীর কয়েক মাইল দূরেই অবস্থিত মাদ্রাজ ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরাজদের শক্ত ঘাটিরূপে খ্যাতি অর্জন করে ফেলেছে। সুতরাং দক্ষিণ-ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য, ঐ অঞ্চলে দেশীয় রাজন্য-বর্গের দরবারে ফরাসী প্রভাব সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে এবং ইংরেজদের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির সঙ্গে মোকাবিলার জন্য দুপ্লেক্স পণ্ডিচেরীতে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের প্রথম থেকেই তাঁকে পণ্ডিচেরীর গভর্ণর এবং মন্ত্রণা পরিষদের প্রধান মন্ত্রকের পদে নিযুক্ত করবার কথাবার্তা চলছিল। কথাবার্তা পাকাপাকি হল ঐ বছরের মে মাসে এবং পরের বছর জানুয়ারী মাসে

ফরাসীরাজ পঞ্চদশ লুই কর্তৃক প্রেরিত এক আদেশনামাবলে তিনি পণ্ডিচেরীর গভর্ণর মনোনীত হলেন। ভাগ্যদেবীর এই প্রসন্নতায় তাঁরা খুশীই হয়েছিলেন। এখন থেকে তাঁদের যৌথজীবন এক নতুন অথচ দায়িত্বপূর্ণ ধারায় চালিত হতে থাকে। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁরা সপরিবারে পরিচিত পণ্ডিচেরী শহরে পুনরায় ফিরে এলেন। [ক্রমশঃ]

বহু বিবাহ সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা

অসীম মুখোপাধ্যায়

বহুবিবাহ নিবারণ আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কৌলিন্য রক্ষার অজুহাতে বহু বিবাহ প্রথা এদেশের অসহায় নারীজাতির বর্ণনাতীত দুঃখ যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছিল। সে যুগের বাঙালী সমাজে যাঁরা এই কুপ্রথা নিবারণের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের পূর্বে কিশোরী চাঁদ মিত্র, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রভৃতি ব্যক্তির পক্ষ থেকে বহু বিবাহ প্রথা নিবারণের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় এক আবেদন পত্র প্রেরিত হয়েছিল। এক রকম তখনই বহু বিবাহ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হল বলা চলে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এসে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুললেন। ১৮৫৫ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর, বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদ; কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র ও তাঁর পুত্র সতীশচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিরা বহুবিবাহ বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে ভারত সরকারের কাছে এক আবেদন পত্র পাঠালেন। তখন থেকেই রক্ষণশীল কুলতিলকরা তাঁদের উপর খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। শাস্ত্র তোলপাড় করে বিদ্যাসাগরের যুক্তি খণ্ডন করা এবং তাঁর উদ্দেশ্যে কটূক্তি করা তখন থেকেই বেশ সুরু হয়ে গিয়েছিল। মাঝে সিপাহী বিদ্রোহের জন্য আন্দোলনে কিঞ্চিৎ ভাঁটা পড়লেও ১৮৬০ সালের পর থেকে তা আবার জোরদার হয়ে ওঠে। ১৮৬৬ সালের ১৯শে মার্চ্চ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণনগরের রাজা সতীশচন্দ্র, রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, কৃষ্ণদাস পাল, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে ছোটলাট সিসিল বিডনের কাছে আর এক আবেদন পত্র পাঠালেন।

১৮৭১ সালে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের সমালোচনা করে তাঁর "বহুবিবাহ পুস্তক" প্রকাশ করেন। বাঙালী সমাজের তথাকথিত ধারক ও বাহক কুলীনদের অধোগতির এক প্রমাণ্য দলিল এই বইটি। বলাবাহুল্য তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা পিছিয়ে থাকেননি। পত্র পত্রিকা, পুস্তিকা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁরাও বহুবিবাহের সমর্থনে যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কটূক্তি, বক্রোক্তিও

যথেষ্ট করেছেন। সম্প্রতি একখানি পুস্তিকা আমার হাতে এসেছিল, বহু-বিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরোধীদলেরই রচনা। লেখক অজ্ঞাত-নামা "কস্যচিৎ উচিৎবাদিনঃ," ১৮৭১ সালের রচনা। পুস্তিকাটির নাম "প্রেরিত তেঁতুল"। লেখকের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের যুক্তি পাঠকদের অতৃপ্তির কারণ ঘটিয়েছে। যেমন জ্বরের পর মুখের স্বাদ ফিরিয়ে আনবার জন্য তেঁতুলের প্রয়োজন তেমনি বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ বিরোধী যুক্তি পাঠে অতৃপ্ত পাঠকদের বিকৃত ভাবকে দূর করবার জন্যই লেখক এই পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন এবং এর নামকরণ করেছেন "প্রেরিত তেঁতুল"।

আমাদের দেশে প্রকৃত "Satire" বড় একটা আছে কিনা জানি না। উনিশ শতকের বাঙালা দেশের সামাজিক অন্দোলনের ইতিহাস খুঁটিয়ে পড়লে বিভিন্ন দলের মধ্যে বাঙ্গোক্তি বিনিময়ের অনেক পরিচয় পাওয়া যাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ বাঙ্গোক্তি উচ্চপর্যায়ের হয়েছে। আলোচ্য পুস্তিকাটি সেদিক থেকে প্রকৃষ্ট satire রূপে গণ্য হতে পারে।

পুস্তিকাটির শেষে একটি ছড়া রয়েছে। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে "কোন প্রধানা কুলীন কামিনীর উক্তি" প্রেরণ করেছেন—"কস্যচিৎ বরিসাল বাসিনঃ।" কুলীনের ঘরের মেয়েরা যে বহুবিবাহে কোন দোষ দেখতে পাচ্ছেন না এবং বিদ্যাসাগরের এই অপচেষ্টা যে তাঁদের শান্তি নষ্ট করছে এবং তাঁর কথামত

"দিলে সাগরেতে ঝাঁপ, দিলে সাগরেতে ঝাঁপ,
অপমৃত্যু হবে ভবে রবে মহাপাপ
ভবে রবে মহাপাপ।

এই হচ্ছে ছড়াটির মূল বক্তব্য।

এই পুস্তিকাটি সম্পর্কে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য আশা করছি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকে বিরোধী পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে "প্রেরিত তেঁতুলের" উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পুস্তিকাটির কয়েকটি অংশ কেবল উদ্ধৃত হয়েছে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় পুস্তিকাটির শেষ ভাগে যে ছড়াটি আছে তার কোনও উল্লেখই করেননি। অথচ ছড়াটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। নীচে সম্পূর্ণ পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হল।

প্রেরিত তেঁতুল

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাগরের রসাস্বাদন করিয়া বিকৃত ভাব অবলম্বন করিয়াছেন,—তাঁহাদিগকে প্রকৃত ভাবস্থ করিবার নিমিত্ত এই তেঁতুল প্রেরিত হইল বলিয়া "প্রেরিত তেঁতুল" নামে গ্রন্থের নাম নির্দ্দিষ্ট হইল। এইক্ষণে প্রার্থনা এই যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে, প্রথমতঃ সামান্য নাম শ্রবণ করিয়াই কেহ পরিত্যাগ করিবেন না। ইহার কেবল অম্লরস নহে, মধ্যে মধ্যে মধুরতাও আছে। অতএব আদ্যোপান্ত অবলোকন করা আবশ্যক।

১২৭৮ সাল
তারিখ ২২ শে আশ্বিন।

অলমতি বিস্তরেণ।
কস্যচিৎ উচিতবাদিনঃ

প্রেরিত তেঁতুল

অনেকেই শ্রুত আছেন বহুদিন বিগত হইল একবার সাগরের তরঙ্গ উঠিয়াছিল; ঐ তরঙ্গ যে কত রঙ্গ দেখাইয়া ছিল—তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। অনেকেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন, কেহ কেহ একেবারে জ্ঞান হারাইয়াছেন, অদ্যাপিও তাদৃশ জ্ঞান হয় নাই। সাগর অতি গম্ভীর স্বভাব এবং ধীর প্রকৃতি; আকৃতি দেখিলেও মনের ভাবান্তর হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সাগরে যখন তরঙ্গ উঠিয়া থাকে তখন নানা প্রকার আশ্চর্য্য ভয়ানক শব্দ প্রকাশ পায়। ঐ সময় পণ্ডিতগণও শ্রুতিরক্ষার জন্য যত্নবান হন,—ইষ্টমন্ত্রও স্থির থাকে না, ভুলিয়া যাইতে হয়; মনেরও চাঞ্চল্য জন্মে। আর অধিক কি বলিব পূর্ব্বের ভাবেরও পরিবর্ত্তন হয়। সাগরের রসাস্বাদন করা বড় কঠিন। সাগরের প্রকাশ্য-রসের যদি বিকার না থাকিত, তবে সকলেরই আদরণীয় হইত, সন্দেহ নাই; কেবল বিকার দোষে দূষিত বলিয়া বর্ষ্য বর্গেরা ঐ রসে বিরত হইয়াছেন। যাঁহারা ভ্রমবশতঃ ঐ রস একবার আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা অদ্যাপিও বিকৃত ভাব ত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। বিশেষতঃ ঐ সাগর বেগবান্ হইয়া পুনর্ব্বার ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে এবং প্রায়ঃ স্থান আক্রমণ করাতে ভয়ানক গোল উপস্থিত হইয়াছে।

কেবল চারিদিকে "একি একি এমত কেহ কোন দিন শ্রুত ও দৃষ্ট হয় নাই ইহাতে যে হুস্বকূল থাকিবে তাহা নিতান্ত অসম্ভবনীয়; কিন্তু প্রসিদ্ধ পথ ডুবিয়া গেলে ভদ্রলোকের যে কিরূপ গতি হইবে তাহার উপায় কিছু ভাবিয়া পাই না।" আহা! যাহারা কখনও কুপথে পদার্পণ করেন নাই, সর্ব্বদাই প্রসিদ্ধ পথে গমন করিতেছেন তাঁহারা কি প্রকারে প্রসিদ্ধ রাজ নির্ম্মিত পথ পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ নবীন পথের পথিক হইবে, কি প্রকারেই বা স্বঘর রক্ষা করিবে। মর্য্যাদাপন্ন ব্যক্তির যদি মর্য্যাদার ব্যাঘাত হয় এবং স্বঘর রক্ষা করিতে সামর্থ্য না থাকে, তবে তাহাদের জীবিতেই মরণ। স্বঘর এবং মর্য্যাদা রক্ষা করাও দুঃসাধ্য কেবল সহজ ব্যাপার নহে।

স্বঘর না থাকিলে যে, স্বভাবের অভাব হইবে তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় নাই। তথাচ সহৃদয় মহাজন বাক্য যথা "দুঃখাতি দুঃখং ধনহীনতাচেৎ ততোতি দুঃখং কৃপণস্য সেবা। ততোতি দুঃখং সুচির প্রবাসঃ ততোতি দুঃখং পরগেহ বাসঃ। অতএব পরস্পরের আশ্রয়তা স্বীকার হইতে আর দুঃখের বিষয় কি আছে? উপায়ও কিছু দেখিতেছি না। এবার সাগরের যেরূপ প্রবল স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার প্রতিরোধ করাও কঠিন ব্যাপার। তবে ভরসার মধ্যে এইমাত্র লক্ষিত হইতেছে যে, অনেকগুলি ভদ্রসন্তানেরা ঐ বেগ নিবারণে নিতান্ত যত্নবান্ আছেন। বোধ করি তাঁহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত যত্নবান্ থাকিলে সাগরের তরঙ্গে কাহারও কোন বিশেষ অপকার ঘটিবে না। বিশেষতঃ দেখিতেছি ও শুনিতেছি, সাগরের ভয়ানক তরঙ্গ অধিক কাল থাকে না, যে পর্য্যন্ত পবনের প্রাদুর্ভাব থাকে ঐ পর্য্যন্তই সাগরের চাঞ্চল্য হয় এবং ভীষণ ভাব লক্ষিত হইতে থাকে। পবনের সমতা হইলে ততক্ষণেই তরঙ্গেরও সমতা হয়। কিন্তু তাহা ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা শ্রেষ্ঠ লোকের উচিত নহে। কি জানি কখন কি হয়, নদী, নদ ইত্যাদিকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। তথাচ "নদীনাঞ্চ নখিনাঞ্চ শৃঙ্গিনাং শাস্ত্রপাণিনাং। বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষুরাজকুলেষুচ" নদী অর্থাৎ সাগরাদি যাহাতে তরঙ্গের সম্ভাবনা আছে, নখি, কুক্কুরাদি, শৃঙ্গি মহিষাদি, এবং অস্ত্রধারি, ইহাদিগকে বিশ্বাস করিবে না, কারণ তাহারা হঠাৎ অপকার করিতে পারে এই কারণই পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে অবিশ্বাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরও এক আশ্চর্য্য কথা শুনিতেছি কিন্তু তাহা অতি অসম্ভবনীয় তথাপি জনশ্রুতি যেরূপ

হইয়াছে তাহা নিতান্ত বিরুদ্ধ অর্থাৎ ঐ ভীষণ সাগরকে অবলম্বন করিয়া কোন সংবাদ দূর দেশে প্রেরিত হইবে ইহা নিতান্ত অন্যায় নহে। কারণ সে দেশে গমন করিতে হইলে সাগর অবলম্বন ভিন্ন আর গতি নাই।

ধন্য সাহস। যে সাগর প্রসিদ্ধ পথ ভাসাইয়া দিতে উদ্যত ঐ সাগরকে অবলম্বন করিয়া মনোভিলাস পূর্ণ করিতে বাসনা করিয়াছেন, করুন্ তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই। তবে একটি কথা না কহিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারলাম না। সাগর স্বভাবতঃ গাম্ভীর্য, ধৈর্য গুণবিশিষ্ট, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বায়ু ভরে প্রফুল্লিত হয়। ঐ সময়ে তাহার আপন পর জ্ঞান থাকে না। তখন উৎপথে স্রোত যায় অর্থাৎ বায়ুতে যে মুখে নয়ন করে ঐ মুখেই ধাবমান হইতে থাকে। ঐ সময়ে যাহারা সাগরে থাকেন তাহাদের ডুবিবার সম্ভাবনা আছে। ঈশ্বর না করেন আশ্রয়ের মজ্জন হইলে উত্তরকালে আরোহিগণের যে কত দুরবস্থা ঘটিবে তাহা বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না। দাঁড়াইবেই বা কোথা? এইটি প্রথমেই বিবেচনা করা আবশ্যক. অভিপ্রেত কার্য সিদ্ধ করিতে না পারিলে অবশ্যই লজ্জা হয়, কিন্তু পণ্ডিতগণ এবং পরিণামদর্শী লোকেরা তাহাতে বিশেষ দুঃখিত হন না, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোত্র দোষ"। অল্পবুদ্ধি, অত্যন্ত অভিমানী ব্যক্তিরা তাদৃশ বিবেচনা না করিতে পারিয়া মনের খেদে সাগরে ঝাঁপ দেওয়া স্থির করে। ঐ সময়ে সজ্জনগণের উচিত যে নানাবিধ উপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করেন? তাহাতেও যদি ঐ ব্যক্তিরা সাগরে ঝাঁপ দেওয়া ভাল বোধ করে, করুক, তাহাতে সহৃদয়গণের কিছুমাত্র দোষ হইবে না। ঐ ব্যক্তিরাই আত্মঘাতি বলিয়া জনসমাজে ঘৃণিত হইবে। সম্প্রতি আর একটি বিষয় বক্তব্য আছে তাহা এই স্থানেই ব্যক্ত করিলাম।

সকলেই জানেন যে যাহাকে আশ্রয় করিলে নানাপ্রকার সুখের সম্ভাবনা আছে এবং ইষ্ট ধর্ম্মও রক্ষা হয়, কুলাভিমান আর থাকে না, সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি হয়, উত্তম অধম ইত্যাদি ভেদজ্ঞানেরও তিরোভাব হইতে থাকে, স্বয়ং চন্দ্রশেখর যাহার ভার বহন করেন এবং সর্ব্বদা পঞ্চাননে গুণগান করেন, দেবগণেরাও যাঁহাকে সমাদর করেন, প্রার্থনা করিলেই অভিলাষ পূর্ণ করেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই সেবনীয়া, আশ্রিতের জাতিকুল বিচার করেন না, দর্শন মাত্রই অপূর্ব্ব এক অসদ্ভাবের উদয় হয়। বিশেষতঃ কলিযুগে সাগরের সহিত অন্তঃ সলিল বাহিত্যক্রমে যাঁহার সহিত

নিয়ত সঙ্গম হইতেছে, তাঁহাকেই সাক্ষাৎ সুরতরঙ্গিনী বলিয়া সকলে স্বীকার করিয়াছেন। স্মার্ত চূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও ইহার যুক্তি প্রদর্শন করাইয়াছেন। আমরাও ঐ সকল ভাবের তুল্যতা বিধায় কোন প্রসিদ্ধা সভাকে সুরতরঙ্গিনী বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলাম। সম্প্রতি একটী আশ্চর্য্য ভাব বিদিত হইয়া সন্দেহ হইতেছে। শ্রুত আছি 'ভবনানি বিচিত্রাণি বিচিত্রাভরণাঃ স্ত্রিয়ঃ। আরোগ্যং বিত্ত সম্পত্তী গঙ্গা স্মরণং ফলং' নানাপ্রকার গৃহ, নানা আভরণযুক্তা অনেক স্ত্রী, আরোগ্য, বিত্ত সম্পত্তি, এই সকল গঙ্গা স্মরণের ফল। কিন্তু কথিত সভার নিয়মে নানাবিধ স্ত্রীলাভ হইবে না। যাহারা পূর্ব্বে লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও সম্প্রতি নিরন্তর কটু কথা শুনিতেছেন, এক স্ত্রীরও যদি বিধান না দিতেন তবে বরং ঐ সভাকে ভীষ্ম প্রভৃতি বলিতাম, এযে আবার একটী পাণিগ্রহণ আবশ্যক বলিতেছে এবং বন্ধ্যাদি কতকগুলি দোষ নিবন্ধন বহু বিবাহের বিধি আছে, ইহাও প্রকাশ করিতেছে; এইক্ষণে বিবেচনা করুন ঐ সভাকে কি বলা যাইতে পারে? যদি গঙ্গা বলা না গেল তবে সামান্যতম নিম্নগা বলাই উচিত। কারণ ঐ সভার আশ্রিত জনগণের সন্তাপ থাকে না, ইচ্ছামত অপরিমিত পরিষ্কৃত জল লাভ হয়, এই কারণই অনেকের অনেক ভাবের প্রকাশ হইতেছে। অলমতি বিস্তরেন॥ ইদানীং প্রকৃতমনুসরামঃ।

এক পুরুষের অনেক নারীর পাণিগ্রহণ করা উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া নানাপ্রকার বিবাদ চলিতেছে। কতকগুলি ব্যক্তি বলিতেছে উচিত, আর কতকগুলি বলিতেছে উচিত না। আমরা এপর্য্যন্ত কোন বিষয় লিপি-বদ্ধ করি নাই সম্প্রতি উল্লিখিত বিষয়ের বিবরণ যুক্ত একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া জানিলাম বহু বিবাহ অনুচিত, ইহারই পোষকতার জন্য নানাবিধ ভাবযুক্ত সুললিত বঙ্গ ভাষাতে অনেকগুলি রচনা করা হইয়াছে। সে সব রচনার আলোচনাতে সকলেই সন্তোষ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই. কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যবসায়ী এবং মনু প্রভৃতি সংহিতার রসাস্বাদন করিয়াছেন এবং জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগের নবম অধ্যায় টীকার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা বলিতেছেন, এমন যে উত্তম রচনারূপ দুগ্ধ সমূহ তাহাকে "কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃস্যুঃ ক্রমশো বরাঃ শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য" ইত্যাদি বচনের নূতন অর্থরূপ গোমূত্র দ্বারা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছে, না হইবেই বা কেন যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্যের লাঠি বাজে এই কারণই

নিম্ন ভাগে, জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগের নবম অধ্যায়ের টীকার সহিত কতিপয় পঁক্তি উদ্ধৃত করা গেল। নিরপেক্ষ সুবিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবশ্যই আদর করিবেন সন্দেহ নাই।

নবম অধ্যায়

সংপ্রত্যেক পিতৃকাণাং সবর্ণাসু লোম পরিণীত
স্ত্রী জাতানাং পুত্রানাং বিভাগঃ কথ্যতে
অস্তি চ সবর্ণাসু লোমস্ত্রী পরিণয়নং তথাচমনুঃ
সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তাদার কর্ম্মনি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃখ্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচবিশঃ স্মৃতে।
তেচস্বাচৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্র জন্মনঃ।
শূদ্রৈবে ত্যেবকারঃ সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে সাতে তা
ইত্যানন্তর পূর্ব্বোক্ত পরামর্শাৎ প্রতিলোম পরিণয়নং
সর্ব্বথৈবন কার্য্য মিত্যার্থঃ—কামতস্তু প্রবৃত্তানা
মিতি দোষান্নত্বং নতু দোষাভাবঃ তদাহতুঃ
শঙ্খলিখিতৌ ভার্য্যাঃ কার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ
সর্ব্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুরিতি প্রথমঃ কল্পঃ
ততোনুকল্পঃ তেস্রোব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্বেণ
তিস্রোরাজন্যস্য একা শূদ্রস্য জাত্যবচ্ছেদন
চতুরাদি সংখ্যা সমাধ্যতে। ইতি জীমূতবাহনঃ।

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিত্যাদি এতেন সোপি বিবাহো ভবতি কিন্তু তত্রগার্হস্থ ধর্ম্মোণ প্রবর্ত্তকঃ কিন্তু কামএব। অতএব শঙ্খলিখিতাভ্যাং. তদ্বিবাহানা মনুকল্পবং রক্ষ্যতে অনুকল্পেচ মুখ্য ধর্ম্ম প্রাপ্তৌ বাধকা ভাবাৎ ইত্থঞ্চ কামতোধিবেদনাদি নিমিত্ত মন্তরেণ সবর্ণা বিবাহেপি বোধ্যং বিবাহত্বে সিদ্ধ এব কামস্য হেতুতা কথ্যতে তথাহি পুংসঃ কামোস্তি সচ বিবাহ মন্তরেন কন্যায়াং পরস্ত্রিয়াং বা উপজায়মানঃ প্রত্যবায়জনক ইতি তদভাবে বিবাহো ভবতীতি কামস্য বিবাহ হেতুত্বাৎ। তদ্বিবাহস্য. ন ধর্ম্মত্বং নতু বিবাহত্বাভাবঃ অন্যথা তদুৎপন্ন পুত্রানামপরিনীতা পুত্রবেনাবিভাগা ইহাপত্তেঃ। ইতি শ্রীনাথাচার্য্য চূড়ামনি টীকা।

মনুপ্রতিজ্ঞেয়ং বাস পলপিত নেব ঐতেরেব শুনৈ যুক্তিঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়োবরঃ ইতি যাবদ্বচ্ছেন সবর্ণা বিবাহ মাত্রস্য প্রতি পাদনাৎ অসবর্ণা বিবাহস্যা প্রসক্তে রত আহ। অস্তিচেতি প্রশস্তা পাইসেছাচিত যজ্ঞাদি ধর্ম্মোপযোগিনী সবর্ণায়া এব সহত্বেন ধর্ম্ম কর্ম্মাধিকারস্য ভর্তুঃ শরীর সুশ্রূষাং ধর্ম্মঃকার্য্যঞ্চ নৈত্যিকং। স্বা দৈবকার্য্যাঃ সর্ব্বেষনং নান্য জাতিঃ কথঞ্চনেতি মনুনা প্রতিপাদনাৎ—কামতঃ বিষয় গোচরাতিরাগতঃ নতু গৃহিধর্ম্মনি পসরা তে নৈতিষাং বিবাহো ভবত্যেব কিন্তু কেবলং রাগাধীন এব সইতি প্রতিপন্নং। অতএব চতস্রো ব্রাহ্মণস্য পরিনীতাঃ তিস্রোদ্বেচৈকা চেতরেষামিতি সখ্যয়াপ্যাহস্ম—জাত্যবচ্ছেদেনেতি জাতাইত্যর্থঃ তেন ব্রাহ্মণস্য পঞ্চষড় ব্রাহ্মণী বিবাহোন বিরুদ্ধ ইতি। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার টীকা—শ্রীরামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার—অচ্যুতানন্দ চক্রবর্ত্তি মহেশ্বর ভট্টারমপীদৃশ রত্যা সমাধানং।

এই ক্ষণে বিবেচনা করুন, কামতঃ বিবাহের যে প্রকার উক্ত মহোদয়েরা বিধান এবং মীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে সকলেই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন যে, কামতঃ অধিক বিবাহ করিতে হইলে প্রথমতঃ সবর্ণাই শ্রেয়স্করা। তদভাবে অসবর্ণাদির গ্রহণ সবর্ণা বহু বিবাহ যে, শাস্ত্র সম্মত, ইহাই মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, পাঁচ, ছয় ইত্যাদি বিবাহ ও ব্রাহ্মণে করিতে পারিবে। তাহাও বিরুদ্ধ নহে। আর বহু বিবাহের শাস্ত্র বোধিতদ্বের শঙ্কা কি থাকিল? ইহাতে যাহাদের চিত্ত হইতে ভ্রম রোগ দূর না হইবে তাহাদের আর ঔষধ নাই। সে যাহা হউক, এই স্থলে পরিসংখ্যা করিয়া যে, কি প্রকারে সবর্ণারকামতঃ বিবাহ নিষেধ এবং অসবর্ণার কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা অস্মদাদির বুদ্ধিগম্য নহে। আমরা "তাশ্চস্বাচাগ্র জন্মনঃ" ইহা দ্বারা এইমাত্র বুঝিতে পারি যে, সেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্বা অর্থাৎ ব্রাহ্মণী পরিত্যাগ করা কোন শাস্ত্রীয় পরিসংখ্যা তাহা সংখ্যাশূন্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারেন। পঞ্চনখ ভোজন করিবে এই স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুক্কুরাদি ভক্ষণ করিবে না, ইহাতে পঞ্চনখির মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না। সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্য, শূদ্র ইহা ভিন্নের কামতঃ বিবাহ করিতে পারিবে না, ইহাই বোধ করিয়া এইক্ষণে পরিসংখ্যা-লেখক মহাশয়ের উচিত যে, ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে প্রকাশ করুন তবেই আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি এবং জিজ্ঞাসুদিগের নিকটে তাহার অভিপ্রায়ও বলিতে পারি। আমাদের ঐ

পরিসংখ্যার বিষয়ে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছার কারণ এই কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্মার্ত্তের মধ্যে শিরোমণি বহুদর্শী প্রাচীন মহাত্মাও ঐ পরিসংখ্যা দর্শন করিয়া 'যথার্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে এটি বড়ই উত্তম অর্থ হইয়াছে' এইরূপ বারবার মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন। তিনিই বা কি বুঝিয়া ঈদৃশ প্রশংসা করিলেন? অপর কোন নূতন দ্বাপোৎপন্ন প্রসিদ্ধ তার্কিক কুলোৎপন্ন নব্য স্মার্ত্ত মহাশয় যে নানাবিধ বচনাদিযুক্ত রচনা দ্বারা বহু বিবাহ অনুচিত বলিয়াছেন, তিনি কি কামতন্ত্র প্রবৃত্তানা মিত্যাদি বচনে লোচন দিয়া "আলোচনা করেন নাই? অথবা কামত বিবাহই স্বীকার করেন না? কেবল শ্রীরামের ধর্ম্মই রক্ষা করিবেন; তাহার কিছুই ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু ঐ সকল বচনের মীমাংসা করা আবশ্যক ছিল। তাঁহাকে আর অধিক বলা উচিত নহে। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বহু বিবাহ বিরোধী দলেরই এক সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে যে, যে স্থলে এক ব্যক্তির অধিক বিবাহ শুনিতে পাওয়া যায় ঐ স্থলেই বন্ধ্যাত্ব দোষ কারণ, সে স্থলে একদিনে অনেক বিবাহ শুনা যায় অর্থাৎ চন্দ্র সপ্তবিংশতি নক্ষত্রকে এক দিনে বিবাহ করেন ঐ স্থলে "তেজীয়সাং ন দূষণং" এইটিই উত্তর। ধন্য তাহাদের কল্পনা! আমরা দেখিতেছি "বন্ধ্যাষ্টমে" ইত্যাদি বচন পুত্রার্থ ধর্ম্মার্থ বিবাহস্থলে। ইহাই 'ধর্ম্ম প্রজা সম্পন্নে দারেনান্যঃ কুর্ব্বীত" ইত্যাদি আপস্তম্ব রচনা দ্বারা স্পষ্টিকৃত হইয়াছে। দেবল বচনেও ধর্ম্মতঃ স্ত্রীয়ং ইহার দ্বারা ধর্ন বিবাহ স্থলের বোধ হইতেছে। অপর কেবল কাম বিবাহ স্থলেই সবর্ণার বিবাহ বিধান হইয়াছে। তাহাই কামতন্ত্র প্রবৃত্তনা মিত্যাদি বচন দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। বিবাহ ভেদে বচন ভেদ করিলেই কোন বিরোধ থাকে না। তবে মীমাংসানভিজ্ঞ বিজ্ঞাভি মানি পণ্ডিতগণেরা বুদ্ধির কৌশলে আর কি করিবেন নানাবিষয়ক বচনগুলিকে এক বিষয়ক কল্পনা করিয়া জল্পনা জাল বিস্তার করিয়াছেন। যেমন পৃথক পৃথক রস না জানিয়া বালকগণ তিক্ত অম্ল মধুর কটু ইত্যাদি সকল রস একত্রিত করিয়া আস্বাদন করে ইহাদের মীমাংসাও সেইরূপ। অলমতি বিস্তরেন।

পরিশেষে পাঠকগণের প্রতি একটি বিজ্ঞাপন না করে ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। মহোদয়গণ, জীমূতবাহন এবং শ্রীনাথ, অচ্যুতানন্দ, রামভদ্র, মহেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ কামতঃ বহুবিবাহের স্পষ্ট বিধান

দিয়াছেন এবং বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন তাদৃশ সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতিরও এইরূপ মীমাংসা। অতএব আপনাদের যেমত গ্রহণ করা অভিপ্রায় করিবেন ইতি।

———

এডুকেশন গেজেটের প্রেরিত পত্রের স্তম্ভে প্রকাশিত কুলীন কামিনীর আক্ষেপ দর্শনে কোন প্রধানা কুলীন কামিনীর উক্তি।

কেন কান্দে বল হেমা কেন কান্দে বল হেমা,
কামারের করে কেন দেখিতেছি বেমা
কেন দেখিতেছি বেমা।
বলি বন্দ্য-মহাশয় বলি বন্দ্য মহাশয়,
রচিত উচিত নহে এসব বিষয়
এসব বিষয়।
যদি থাকে হে ক্ষমতা যদি থাকে হে ক্ষমতা,
দারুন কর পীড়ন এবে করহে সমতা
এবে করহে সমতা।
জান কুলীনের কুল জান কুলীনের কুল,
তবু কেন লেখ হেন হয়ে প্রতিকূল
হেন হয়ে প্রতিকূল।
পড়ে তোমার রচনা পড়ে তোমার রচনা,
আমরা করি না কভু ভাল বিবেচনা
কভু ভাল বিবেচনা।
ভাল লেখ একাবলী ভাল লেখ একাবলী,
সকলেই বলে আমি নহি একাবলী
আমি নহি একাবলী।
কিন্তু তব এ লেখায় কিন্তু তব এ লেখায়,
হবে তুষ্ট কুল দুষ্ট করিতে যে চায়
দুষ্ট করিতে যে চায়।

মোরা যে ভাবেই রই মোরা যে ভাবেই রই,
তোমার কাছেতে কভু দুঃখিত না কই
কভু দুঃখিত না কই।
তুমি লেখ নাম ধরে তুমি লেখ নাম ধরে,
কেন্দেছে কুলীনা কেবা তব হাত ধরে
কেবা তব হাত ধরে।
মোরা জানি কুলমান মোরা জানি কুলমান,
কুল না থাকিলে মোরা হই ম্রিয়মান
মোরা হই ম্রিয়মান।
আছে ব্যাভিচার দোষ আছে ব্যাভিচার দোষ,
ঐ দোষে কোন ঘর না করে পরশ
ঘর না করে পরশ।
দিলে সাগরেতে ঝাঁপ দিলে সাগরেতে ঝাঁপ,
অপমৃত্যু হবে ভবে রবে মহাপাপ
ভবে রবে মহাপাপ।
রবে অকুলে মা বাপ রবে অকুলে মা বাপ,
পড়িবে চক্ষেই জল সদা মনস্তাপ
জল সদা মনস্তাপ।
আর কি কব অধিক আর কি কব অধিক,
এমন কন্যারে দেই শতব'র ধিক
দেই শতবার ধিক।
দিব শাকায় উদরে দিব শাকায় উদরে,
তথাপি সমাজে সবে ডাকিবে আদরে
সবে ডাকিবে আদরে।
মোরা নাহি ভাবি দুঃখ মোরা নাহি ভাবি দুঃখ,
কুলমানে আছি, মনে সেই বড় সুখ
মনে সেই বড় সুখ।
বলি ওমা মহারাণী, বলি ওমা মহারাণী
একবার শুন গো মা দুঃখিনীর বাণী
গো মা দুঃখিনীর বাণী।

এতো তব অধিকার এত তব অধিকার,
তুমি মা থাকিতে কেন হেন অবিচার
কেন হেন অবিচার।
যত কুলহীন জুটে যত কুলহীন জুটে,
কুলীনের পদ দেখে মরে মাথা কুটে
দেখে মরে মাথা কুটে।
তারা করেছে শপথ তারা করেছে শপথ,
কুল পাশ করে পুরাইবে মনোরথ
পুরাইবে মনোরথ।
যারা আছে কুল হত যারা আছে কুল হত,
সেই না সমভাব হইতে উদ্যত
ভাব হইতে উদ্যত।
একি সহে গো জননী একি সহে গো জননী,
শৃগাল সিংহের সহ বসিবে এখনি
সহ বসিবে এখনি।
তারা মিথ্যা করি সবে তারা মিথ্যা করি সবে,
কুলীনের কুচ্ছা করি কত মত কবে
করি কত মত কবে।
তুমি শুন গো মা তাই তুমি শুন গো মা তাই,
জননী গো! যোড় করে সে সব জানাই
করে সে সব জানাই।
যারা কুলটা হয়েছে যারা কুলটা হয়েছে,
তারাতো ত্যজিয়ে কুল অকুলে রয়েছে
কুল অকুলে রয়েছে।
সেই দোষে কি সবাই সেই দোষে কি সবাই.
অকুলে ডুবাবে কুল শুনে ভয় পাই
কুল শুনে ভয় পাই।
কুল ত্যজিতে না চাই কুল ত্যজিতে না চাই,
নগরে মাগিয়ে খাব তাহে ক্ষতি নাই
খাব তাহে ক্ষতি নাই।

মাগো তোমারে জানাই মাগো তোমারে জানাই,
তোমা বই কারে কব কোথা বা দাঁড়াই
বল কোথা বা দাঁড়াই।
যদি না থাকে স্বঘর যদি না থাকে স্বঘর,
স্বভাব অভাব এবে হইবে সত্বর
এবে হইবে সত্বর।

কস্যচিৎ
বরিসালবাসিনঃ।

প্রাচীন শিবিজাতির ইতিহাস

বেলা লাহিড়ী

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মৌর্যোত্তর ও গুপ্তপূর্ব যুগকে 'অন্ধকারময় যুগ' বলা হয়। এ সময়ে এমন কোন কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না যার একছত্র আধিপত্য সবাই বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারত। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে যবন, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি নানা বৈদেশিক জাতি উত্তর ভারতে অভিযান ও তার পশ্চিমাংশে তাদের শাসন বিস্তার করে। এই যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে যেসব গবেষণা হয়েছে তাতে এই সব বিদেশীদের শাসনকেই সাধারণতঃ প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু যেসব ভারতীয় জাতি এ সময় বিদেশীদের অধীনতাপাশ থেকে নিজেদের বহুকষ্টে বাঁচিয়ে রেখে দুর্গম পাহাড় বা মরুভূমির আশ্রয়ে নিজেদের স্বাধীন সত্তা বজায় রেখেছিল তাদের ধারাবাহিক ইতিহাস আজও রচিত হয়নি। প্রাচীন সাহিত্যে এইসব জাতির বহু উল্লেখ পাওয়া গেলেও বিভিন্ন স্থানে পাওয়া এদের সমকালীন মুদ্রাগুলিই এই সব জাতির স্বাধীন অস্তিত্বের একমাত্র প্রামাণ্য সাক্ষ্য। মুদ্রা থেকে যেসব স্বাধীন জাতি ও রাজ্যের কথা জানা যায়, তাদের মধ্যে শিবিজাতি অন্যতম।

শিবিরা একটি অতি প্রাচীন জাতি। এদেশের বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে, এমনকি গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখা আলেকজান্দারের ভারত অভিযানের কাহিনীতেও, শিবিদের উল্লেখ আছে। এদের নামের উৎপত্তি পুরাণের শিবিরাজার নাম থেকে। এই শিবি ছিলেন অনুর বংশধর উশীনরের পাঁচ পুত্রের একজন। পাঞ্জাবের যেসব জাতি উশীনরের বংশজাত ব'লে দাবী করে, তাদের মধ্যে শিবিরাই প্রধান। শিবিদের উত্থানপতনের কোন ধারাবাহিক কাহিনী পাওয়া যায়নি, তবে নানা প্রাচীন সাহিত্যে বিক্ষিপ্ত এবং মুদ্রার প্রমাণ থেকে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পারা যায়, তা থেকে আমরা তাদের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তার একটি চিত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করব।

প্রায় ঋগ্বেদের সময় থেকেই শিবিদের অস্তিত্বের আভাষ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের এক সূক্তে (১৮.৭) দেখা যায়, রাজা সুদাস যেসব

জাতিকে পরাজিত করেন তাদের মধ্যে 'শিব' একটি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮.২৩) 'শৈব্য' (শিবিদের রাজা ?) কথার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ কিংবদন্তীতে কোন এক শিবিরাজার আদর্শ আত্মোৎসর্গের কাহিনী আছে। বৌদ্ধ জাতকে 'শিবিদেশ' ও তার রাজধানী অরিট্ঠপুর (অরিষ্টপুর ?) ও জেতুত্তরের (?) নাম পাওয়া যায়। 'মহাবস্তু'র 'ষোড়শমহাজনপদে'র তালিকায় কাম্বোজ ও গন্ধারের স্থানে শিবি ও দশার্ণের নাম আছে। পতঞ্জলি রচিত পাণিনির টীকায় উত্তর ভারতে অবস্থিত যে 'শিবপুরের' উল্লেখ আছে তা সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের 'শিব'দেরই রাজধানী ছিল। পুরাণে কথিত 'শিবদেশ' ও 'শিবপৌর' অর্থে শিবিদের দেশ ও তাদের রাজধানী শিবপুরের অধিবাসীকেই বোঝায়। মহাভারতের সভাপর্বে (৫২.১১) দেখা যায় যে শিবিরা যৌধেয়, ত্রিগর্ত প্রভৃতি পাঞ্জাবের অন্যান্য জাতির সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করে। বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতায়'ও (১৫.২৬) মালবজাতি ও তক্ষশীলার অধিবাসীদের সঙ্গে শিবিদের নাম পাওয়া যায়।

এই সব প্রাচীন সাহিত্যের উল্লেখ থেকে মনে হয়, যেসব বহু প্রাচীন বৈদিক জাতি প্রথম পাঞ্জাবে এসে বসবাস সুরু করে শিবিরা তাদেরই একটি। ক্রমে এই বৈদিক জাতিগুলি উত্তর ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে তাদের ছোট ছোট নিজস্ব স্বাধীন জনপদ বা রাষ্ট্র গ'ড়ে তোলে। দেখা যায়, বুদ্ধের সময় এদের মধ্যে ষোলটি 'ষোড়শ মহাজনপদ' নামে বিশেষ ক্ষমতাশালী হ'য়ে ওঠে। শিবিরের জনপদ প্রধান ষোলটির মধ্যে না পড়লেও এই সব স্বাধীন জনপদেরই অন্যতম ছিল। আলেকজান্দারের ভারত অভিযানের সময়ও যে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় ছিল তা গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে জানা যায়। তাঁরা বলেন আলেকজান্দার বিপাশার তীর থেকে ফিরবার পথে যেসব জাতি তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করে, তাদের মধ্যে 'শিবয়' (Siboi) একটি। এই 'শিবয়'ই যে শিবিজাতি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আলেকজান্দারের ঐতিহাসিকদের মতে শিবিরা তখন ছিল একটি বর্ব্বর জাতি, পশুচর্মই ছিল তাদের পরিধেয় ও গদা ছিল তাদের প্রধান অস্ত্র। তাদের অধীনে তখন ৪০,০০০ পদাতিক বাহিনী ছিল। এ সময়ে শিবিরা বিতস্তা (Jhelum) ও চন্দ্রভাগার (Chenub) সঙ্গমের কিছু দক্ষিণে ঝঙ্গ (Jhang) জেলার অধিবাসী ছিল।

ঝঙ্গের কাছে শোরকোটে (Shorkot) যে একটি বিরাট তাম্রপাত্রের গায়ে ৮৩ বর্ষে উৎকীর্ণ একটি প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে, এই শোরকোটই পতঞ্জলি উল্লিখিত প্রাচীনকালের 'শিবিপুর'। এখানে যেসব প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ এবং তার ভিতর বহু প্রাচীন মুদ্রা ও সংক্ষিপ্ত ব্রাহ্মীলিপিযুক্ত ইষ্টকখণ্ড পাওয়া গেছে তা থেকে বেশ প্রমাণিত হয় যে, শোরকোট একটি অতি প্রাচীন স্থান। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, এই স্থানের আদি নাম 'শিবনগরী' বা 'শেওপুর' ক্রমে 'শোর' নামে রূপান্তরিত হয় ও পরে তার সঙ্গে 'কোট' (দুর্গ) যুক্ত হয়ে 'শোরকোটে' পরিণত হয়। স্থানীয় হিন্দুদের ধারণা শোরকোটের দুর্গ 'শোর' নামক কোন হিন্দু রাজার তৈরী। ফোগেলের মতানুযায়ী শোরকোট লিপির অব্দ যদি গুপ্তাব্দে লিখিত হ'য়ে থাকে তবে এর তারিখ হবে ৪০২-৪০৩ খৃষ্টাব্দ (৩২০+৮৩); অর্থাৎ এর থেকে প্রমাণিত হয় যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকেও শোরকোট 'শিবিপুর' নামেই পরিচিত ছিল।

আলেকজান্দারের ভারত ত্যাগের পরে যখন ছোট ছোট সব রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে সারা ভারতে মৌর্যরাজাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখন শিবিদেরও সম্ভবতঃ সেই প্রবল প্রতাপশালী রাজদণ্ডের কাছে মাথা নত করতে হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে আবার তারা নিজেদের স্বাধীন সত্তা ফিরিয়ে এনে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে সে সময়ে প্রবর্তিত তাদের কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা। মুদ্রাগুলির লিপিকাল থেকে অনুমান করা যায় যে সেগুলি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় থেকে প্রথম শতকের মধ্যে কোন সময়ে প্রচলিত হ'য়েছিল। এগুলি সাধারণতঃ চিতোর ও তার নিকটবর্তী নগরী থেকে পাওয়া যায়।

শিবিমুদ্রার মুখ্যদিকে (obverse) প্রতি বাহুতে ব্রাহ্মী 'ম' যুক্ত এক-রকমের স্বস্তিকা চিহ্ন, একটি বৃত্তের ওপর একটি গাছের চিহ্ন ও মুদ্রার কিনারে বৃত্তাকারে ব্রাহ্মীলিপি, এবং গৌনদিকে (reverse) ছয়টি অর্দ্ধবৃত্তযুক্ত মেরুচিহ্নের (6-arched mountain) ওপরে নন্দীপদচিহ্ন ও নীচে বজ্ররেখা (নদী ?) থাকে। শেষোক্ত চিহ্নগুলির সঙ্গে পাঞ্জাবের কুনিন্দ ও কুলূত (Kuninda, Kuluta) জাতীর মুদ্রার এই ধরনের চিহ্নের কিছু সাদৃশ্য আছে।

শিবিমুদ্রায় দুই রকমের লিপি দেখতে পাওয়া যায় :

(১) 'শিবি জনপদস',

(২) 'মঝমিকায় শিবি জনপদস'।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লিপির মঝমিকা বা মধ্যমিকার অর্থ প্রথমে পণ্ডিতরা ঠিক ধরতে পারেননি। কানিংহাম মনে ক'রেছিলেন যে, শিবিদের দেশ তিনভাগে বিভক্ত এবং এতে তার 'মধ্যমিকা' অর্থাৎ মধ্যভাগের কথা বলা হ'য়েছে। এ্যালানও (J. Allan) 'মধ্যমিকা' বলতে মধ্যদেশ বুঝেছিলেন, যদিও এতে 'মধ্যদেশ' নামে প্রাচীন ভারতের যে বিশেষ বিভাগ আছে তা তিনি বোঝাননি। কীলহর্ণই প্রথম দেখান যে 'মধ্যমিকা' একটি স্থানবিশেষের নাম এবং পতঞ্জলিতে এর উল্লেখ আছে। দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মুদ্রার লিপির মর্মোদ্ধার ক'রে বলেন যে, এতে মধ্যমিকা নামক স্থানে অবস্থিত শিবিজাতির 'জনপদ' বা রাষ্ট্রের কথা বলা হ'য়েছে।

মধ্যমিকার নাম প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্নলেখে পাওয়া যায়। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' যবনদের মধ্যমিকা আক্রমণের কথা আছে ("অরুনদ্ যবনঃ সাকেতম্ অরুনদ্ যবনো মধ্যমিকাম্")। মহাভারতে সভাপর্বের দিগ্বিজয় (৩২) অধ্যায়ে দশার্ণদের (দশার্ণর অধিবাসী) সংগে মাধ্যমেকয়দের (মধ্যমিকার অধিবাসী) উল্লেখ আছে। আজমীঢ়ের বর্লিতে (Barli) প্রাপ্ত রাজা ভগবতের (নবম শুঙ্গরাজ ?) রাজ্যাঙ্কের একটি খণ্ডিত ব্রাহ্মীলিপিতে 'মঝিমিকা'র (মধ্যমিকার) এক নাগরিকের দানের সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে। চিতোরগড়ে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমদিকের দুটি খণ্ডিত লিপিতেও দশপুর ও 'মধ্যমা'র (মধ্যমিকার) এক প্রদেশপালের দানধ্যানের কথা আছে। 'কুমারপালচরিত্রসংগ্রহ' গ্রন্থে চৌলুক্যরাজ কুমারপালের (১১৪৫-১১৭১ খৃঃ) ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্পর্কে 'মধ্যমাপুরী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে দেখা যায় 'মধ্যমাপুরী' চিত্রকূট বা চিতোরগড় থেকে তিন ক্রোশ অর্থাৎ প্রায় সাত মাইল দূরে অবস্থিত। কীলহর্ণ দেখান যে চিতোরের প্রায় এগারো মাইল উত্তরে চিত্রকূট—উদয়পুরের বৈরিশ (Biraoh বা Bairish) নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত বর্তমান তস্থাবতী নগরীই প্রাচীন মধ্যমিকা বা মধ্যমাপুরী। এই ধারণা যে নির্ভুল তা প্রধানতঃ এইস্থান থেকে 'মঝমিকায় শিবি জনপদস' এই লিপিযুক্ত মুদ্রার আবিষ্কার থেকেই প্রমাণিত

হয়। তাছাড়া এই নগরী যে একটি প্রাচীন স্থান তা এখানে বহু অঙ্কচিহ্নযুক্ত মুদ্রা (punch-marked coins) ও পাঁচটি ব্রাহ্মীলিপির আবিষ্কার থেকে বোঝা যায়।

শিবিমুদ্রার লিপি ও প্রাপ্তিস্থান থেকে প্রমাণিত হয় যে, খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে যে শিবিজাতি স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার প্রমাণ রেখে গেছে তারা প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত পাঞ্জাবের অধিবাসী নয়, এরা রাজপুতানার 'মধ্যমিকা' বা বর্তমান 'নগরী'র অধিবাসী। সম্ভবতঃ শিবিজাতির অন্য একটি শাখা বহু প্রাচীন কালেই এখানে এসে বসতি স্থাপন ক'রেছিল, অথবা পাঞ্জাবের শিবিদেরই একটি বিশেষ অংশ কোন কারণে ঐ স্থানের মালবজাতীর মত ক্রমে দক্ষিণে অগ্রসর হ'য়ে শেষপর্যন্ত রাজপুতানার অংশবিশেষে নিজেদের অধিকার স্থাপন করে। মনে হয় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে পাঞ্জাবে গ্রীক আধিপত্য স্থাপিত হ'লে শিবিরা বৈদেশিক শাসনের চাপে পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত হ'য়ে রাজপুতানার চিত্রকূট - উদয়পুরের নিকটবর্তী স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ক্রমে সেখানে নিজেদের একটি স্বাধীন 'জনপদ' বা রাষ্ট্র গড়ে তোলে। এইজন্যই মহাভারতের সভাপর্বের আর একস্থানে (৩২·৭) দেখা যায় যে, শিবিরা রাজপুতানার অধিবাসী এবং মালব ও ত্রিগর্ত জাতির সঙ্গে নকুলের কাছে পরাজিত হয়। বৃহৎসংহিতায়ও অন্য এক স্থানে (১৭·১৯) শিবিদের উত্তর রাজপুতানার অধিবাসী আর্জুনায়ন ও যৌধেয় জাতির সঙ্গে উল্লেখ করা হ'য়েছে।

কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে যে শিবিরা মধ্যমিকা অধিকার করে তা জানা যায় না। মহাভারতের সভাপর্বে (৩২·১১৯০) 'শিবি' ও 'মাধ্যমেকয়' দুয়েরই উল্লেখ আছে। এ থেকেই মনে হয় শিবিরা তখনও মধ্যমিকার অধিবাসী হয়নি—কিন্তু মহাভারতের এই অংশের সঠিক রচনাকাল জানা না থাকায় এ থেকে কিছু বলা সম্ভব নয়। পতঞ্জলি যে সময়ে (আনুমানিক খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে) যবনদের মধ্যমিকা আক্রমণের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সে সময়ে মধ্যমিকা শিবিদের অধিকারে ছিল কিনা তার কোন প্রমাণ নেই। বর্লি (Barli) লিপিতে যে মধ্যমিকার নাগরিকের কথা পাওয়া যায় সে শিবিজাতীয় ছিল কিনা তাও জানা যায় না। তবে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর ভেতর যে শিবিরা এসে মধ্যমিকা

অধিকার ক'রে নিজেদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত করে তাদের এ সময়কার মুদ্রাই তার প্রমাণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতা সম্ভবতঃ খুবই স্বল্পকালস্থায়ী হয়। কারণ এর পরে আর তাদের স্বাধীন অস্তিত্বের কোন প্রমাণ আমরা পাই না।

তস্বাবতী নগরীর কাছে ঘোসুণ্ডী, হাথিবাড়া ও আর একটি স্থানে একই ব্রাহ্মীলিপির তিনটি সংস্করণ পাওয়া গেছে। তাতে স্থানীয় রাজা অশ্বমেধ-যজ্ঞকারী সর্বতাতের ভগবান সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের 'নারায়ণবাটিকা' নামক পূজাস্থানের জন্য একটি শিলাপ্রাকার নির্মাণের কথা আছে। এই লিপি খৃঃ পূঃ প্রথম শতকের শেষার্দ্ধের ব'লে অনুমান করা হয়। এতে রাজা সর্বতাতের বংশ ও গোত্রপরিচয় থাকলেও ('রাজ্ঞা ভাগবতেন গাঙ্গায়নেন পারাশরীপুত্রেণ সর্বতাতেন), তিনি শিবিজাতীয় ছিলেন কিনা তার কোন আভাষ পাওয়া যায়না। সম্ভবতঃ শিবিরা এই সময়ে তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে কোন স্থানীয় রাজবংশের অধীনে আসে এবং অশ্বমেধযজ্ঞকারী সর্বতাত সেই বংশেরই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, যদিও এ বংশের আর কোন রাজার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে শিবিদের রাজধানী মধ্যমিকার সমৃদ্ধি যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্তও ছিল তা বৃহৎসংহিতা ও চিতোরগড় লিপি থেকে জানা যায়।

প্রাচীন সাহিত্যে আরও কয়েকটি স্থানে শিবিদের বসবাসের উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মধ্যদেশে অবস্থিত এক উশীনর রাজ্যের কথা আছে। এটিই সম্ভবতঃ মহাভারতে বর্ণিত যমুনার নিকটবর্তী শিবিরাজ্য, যার রাজা ছিলেন উশীনর। পণ্ডিত পার্জিটারের মতে এই শিবি বা উশীনর রাজ্য সরস্বতী, দৃষদ্বতী ও যমুনার উত্তরে সাহারাণপুর ও পাতিয়ালার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। কোন কোন গ্রন্থে সিন্ধু উপত্যকায়ও শিবিদের এক বাসস্থান নির্দেশ করা হয়। 'দশকুমারচরিতে' কাবেরী নদীর তীরে যে শিবিদের কথা আছে ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে তা সম্ভবতঃ চোল রাজবংশকে বোঝায়।

পরিশেষে আমরা শিবিদের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব। প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ থেকে দেখা যায় যে শিবিরা রাজার দ্বারা শাসিত হত।

আলেকজান্দারের ঐতিহাসিকরা কিন্তু শিবিদের একটি গণতান্ত্রিক জাতি ব'লে চিত্রিত করেছেন। কারণ আলেকজান্দার যখন শিবিদের রাজধানীর কাছে শিবির স্থাপন করেন তখন তাদের কয়েকজন মুখ্য নাগরিক তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে আসেন। শিবিরা যে পরবর্তী কালে রাজপুতানার মধ্যমিকাতেও একটি গণতন্ত্র স্থাপন করে তাদের মুদ্রাই তার সাক্ষ্য দেয়। কারণ এই মুদ্রায় কোন রাজার নাম থাকে না, শুধু শিবিজাতির ও 'জনপদে'র অর্থাৎ রাষ্ট্রের উল্লেখ থাকে। এতে মনে হয় যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কোন ব্যক্তিবিশেষের হাতে ছিল না, শিবিদের প্রধান প্রধান নাগরিকদের উপরই তা ন্যস্ত ছিল। এই ধরনের গণতান্ত্রিক জনপদের নাম আমরা পাঞ্জাবের সমসাময়িক কোন কোন জাতির (যথা, অগ্রতা, রাজন্য, ত্রিগর্ত, বেমকী) মুদ্রাতেও পাই। জয়পুরের রাইড়ে (Rairh) প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটির সীলমোহরে 'মালব জনপদে'র নাম আছে। মালবরা যে একটি গণতান্ত্রিক জাতি ছিল তা তাদের পরবর্তীকালের মুদ্রার 'মালব গণস্য জয়ঃ' এই লিপি থেকেই বোঝা যায়। এই রকম যৌধেয় জাতির এক শ্রেণীর মুদ্রায় 'যৌধেয় গণস্য জয়ঃ' এই লেখন দেখা যায়। এই সব মুদ্রার প্রমাণ থেকে জানা যায় যে এই সময় পাঞ্জাব ও রাজপুতানার বিভিন্ন স্থানে বহু ছোট ছোট গণতন্ত্র গ'ড়ে ওঠে। এই গণতন্ত্র-গুলির রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া না গেলেও প্রাচীন ভারতে যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অজানা ছিল না সেকথা প্রাচীন কালের সাহিত্যে উল্লেখ ছাড়াও শিবি প্রভৃতি জাতির মুদ্রাগুলি থেকে অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Alexander Cunningham, Archaeological Survey of India, Reports, Vol. V, pp. 97 ff; Vol. VI, pp. 196 ff: Vol. XIV pp. 145 ff.

2. D. C. Sircar, Select Inscriptions, Vol. I(1942), p 92.
..... . Studies in the Geography of Ancient and Modieval India (1960), pp. 01, 203.

3. D. R. Bhandarkar, "The Archaeological Remains and Excavations at Nagari". Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 4, 1920.

4. H. C. Roy Chaudhuri, Political History of Ancient India, 6th ed , pp. 66, 253.

5. John Allan, A Catalogue of Indian Coins in the British Museum, Ancient India (1936), pp. cxxiv—cxxv.

6. K. P. Jayaswal, Hindu Polity, (1924) Part I, pp. 68, 75 ff., 153 ff.

7. Mc Crindle, The inscription of India by Alexander the Great as described by Arrian (and others) ..... (1896), pp. 285, 366.

8. Epigraphia Indica, Vol XVI, pp. 15 ff. ; Vol. xxxiv, pp. 55ff.

9. Indian Antiquary, Vol. VII, pp 266 f. ; Vol. xxii, pp. 183, 189.

10. Journal of Asiatic Society of Bengal, 1887, p. 74 ff.

11. Journ. of Royal Asiatic Society, London. 1903, p. 685 ff.

12. Journ. of Numismatic Society of India, Vol. ix, p. 82 ff.

13. Journ. of Punjab Historical Society, Vol. I, p. 174 ff.

14. Journ. of Oriental Institute, Baroda, Vol. X, p. 180 f.

ভারতে গ্রামীণ সংস্কৃতির উদ্ভব ও প্রসার

দিলীপ কুমার চক্রবর্তী

আধুনিক প্রত্নতত্ত্বের একটি বিশিষ্ট সমস্যা কৃষির সূত্রপাত ও তৎসঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতির বিস্তৃতি। গ্রামীণ সংস্কৃতির ভিত্তি রচিত হয় সভ্যতা শুরু হওয়ার অর্থাৎ লিপিমালার প্রচলনের আগে। সাধারণভাবে এই পর্যায়কে নবাপ্রস্তরযুগ বলা যেতে পারে। নব্যপ্রস্তরযুগের মূল কৃতিত্ব এই সময়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরণের গ্রামীণ সংস্কৃতি গড়ে ওঠা—যে সংস্কৃতিগুলির বৈশিষ্ট্য যান্ত্রিক যুগ আরম্ভ হওয়ার আগে শেষ হয় নি।

ভারতবর্ষে এই সমস্যা নিয়ে কোন সুসংবদ্ধ গবেষণা এখনও হয় নি। বিভিন্ন অঞ্চলে খননকার্যের ফলে প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা হয়ত কিছু জানি কিন্তু কোন সচেতন গবেষণার ফল না হওয়াতে এই জানা অনেকাংশে অসম্পূর্ণ।

আনুমানিক ৭০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মানুষের ইতিহাসে প্রথম গ্রাম গড়ে ওঠে। এই প্রথম গড়ে ওঠার অঞ্চল ছিল বিস্তীর্ণ—পশ্চিমে তুরস্ক থেকে পূর্বে আফগানিস্থান পর্যন্ত ১২৫০ থেকে ৩০০০ ফুট উচ্চ ভূমি—যেখানে বৃষ্টিপাত ছিল ৩৫০ থেকে ৪৫০ মিলিমিটার-এ সীমাবদ্ধ। এই অঞ্চলে গম ও যব, যা প্রথমে চাষ করা হয়, তা' স্বাভাবিক ভাবে গজাত। গম ও যবের এই স্বাভাবিক ভাবে গজান খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ যেখানে এরা স্বাভাবিক ভাবে গজাত না সেখানে এদের চাষ স্বাধীনভাবে শুরু হয় নি। ভারতবর্ষ এই অঞ্চলের বাইরে। তাই নিঃসন্দেহে ভাবা যেতে পারে ভারতে প্রথম কৃষির সূত্রপাত যা' গম ও যব ভিত্তি করে হয়েছিল তা' পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত সাংস্কৃতিক প্রভাবের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

সম্প্রতি অবশ্য মনে করা হয়েছে বালুচিস্থানে কোয়েটা অঞ্চলে যব অন্ততঃ স্বাভাবিক ভাবে গজাতে পারত যদিও এর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি। যদি এই অনুমান সত্য হয় তবে ভারতে কৃষির সূত্রপাত হয়ত পশ্চিম এশিয়ার কোন প্রভাবের ওপর নির্ভরশীল ছিল না।

ভারতবর্ষে প্রথম গ্রামের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে বালুচিস্থানের কোয়েটা অঞ্চলে। বালুচিস্থান মূলতঃ পর্ব্বতাকীর্ণ. কোথাও কোথাও ১১০০০ ফুট উচ্চ, এর উপত্যকাগুলি দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত। কোয়েটা উপত্যকায় কিলি-গুল-মহম্মদ নামে এক জায়গায় যে চারটি গ্রামীণ সংস্কৃতির স্তর পাওয়া গেছে তা' ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রাচীন গ্রামগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রথম স্তরে কৃষি ভালভাবে আরম্ভ হয় নি, প্রথমে শুধু কাদামাটির, পরে কাদামাটির ইটের ঘর ছিল। পাথর ও হাড়ের হাতিয়ার ব্যবহার হত কিন্তু মৃৎপাত্রের ব্যবহার তখনও জানা ছিল না। দ্বিতীয় স্তরে চিত্রিত মৃৎপাত্র ও বয়ননিল্পের সূত্রপাত হয়েছিল। তৃতীয় স্তরে অল্প তামার নিদর্শন পাওয়া যায়। চতুর্থ স্তরে পাথরের ঘরবাড়ী পাওয়া যাচ্ছে। কি চাষ হত জানা যায় নি, খুব সম্ভবতঃ গম কিংবা যব। প্রথম স্তরটির তারিখ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের মাঝামাঝি. পঞ্চম স্তর সহস্রাব্দও হতে পারে। যদিও কিলি-গুল-মহম্মদ প্রথম স্তর প্রাচীনতম তবু কোয়েটা উপত্যকার বাইরে, উত্তর পূর্ব বালুচিস্থানে ঝোব—লোরালাই উপত্যকায়, কোয়েটার দক্ষিণে কালাত অঞ্চলে, দক্ষিণ বালুচিস্থানে কুল্লি ও নাল উপত্যকায় খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে বা তারও আগে অনেক গ্রামের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের চিত্রিত মৃৎপাত্র—যে মৃৎপাত্রগুলিকে অবলম্বন করেই এক সময়ে সংস্কৃতিগুলির আঞ্চলিক সীমা স্থির হয়েছিল। এদের শেষ পর্যায়ে এরা নিশ্চয়ই সিন্ধু উপত্যকার হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক ছিল কিন্তু এদের প্রথম পর্যায় সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না।

সমতলে, সিন্ধু অববাহিকায় প্রথম তিনটি গ্রাম সিন্ধু প্রদেশে আমরি, কোট ডিজি ও পাঞ্জাবে হরপ্পা (হরপ্পাসভ্যতা স্তরের নীচে)। হরপ্পায় চিত্রিত মৃৎপাত্র ছাড়া কিছু পাওয়া যায় নি। আমরিতে চিত্রিত মৃৎপাত্র ছাড়া কাদামাটি। কাদামাটির ইটের ঘর, পাথরের হাতিয়ার ও অল্প তামার ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে। কোট-ডিজিতে পাথরের প্রকারও পাওয়া গেছে। এদের তারিখ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথমার্দ্ধ। এই গ্রামগুলির উৎপত্তি অস্পষ্ট। প্রথম থেকেই এরা অপেক্ষাকৃত উন্নত সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

প্রায় সমসাময়িক কালে অথবা কিছু পরে রাজপুতানায় সরস্বতী-দৃষদ্বতী অববাহিকায় কিছু গ্রাম গড়ে ওঠে। কালিবঙ্গান, নোহার, সোথি প্রভৃতি

জায়গায় এদের নিদর্শন পাওয়া যায়—বিভিন্ন ধরণের চিত্রিত ও অচিত্রিত মৃৎপাত্র, তামা ও পাথরের হাতিয়ার, কাদামাটির ইটের ঘর ইত্যাদি। এদের উৎপত্তি অস্পষ্ট।

বালুচিস্থান, সিন্ধু উপত্যকা, সরস্বতী-দৃষদ্বতী অববাহিকার এই সমস্ত গ্রাম হরপ্পা সভ্যতার সূত্রপাতের আগে গড়ে ওঠে ও হরপ্পা সভ্যতার সূত্রপাতের পর শেষোক্ত দুই অঞ্চলে অন্ততঃ প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে এদের ছাপ মুছে যায়।

হরপ্পা সভ্যতা আনুমানিক ৫৫০ বৎসর (২৩৫০-১৭৫০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ) স্থায়ী হয়েছিল। তারপর প্রথম গ্রামীণ সংস্কৃতি পাওয়া যায় দক্ষিণ পূর্ব্ব রাজস্থানে বাণস নদীর অববাহিকায়। দুটি জায়গায় খনন করা হয়েছে—আহার ও গিলুণ্ড। বাড়ীঘর ছিল বেশ বড়, কখনও ৩০ ফুট × ১৫ ফুট, ভিত্তি তৈরী করা হত পাথর বসিয়ে, চারদিকে বাঁশ বা কাঠের বেড়ার ওপর মাটি লেপে দেয়া হত, ওপরে ছাউনিও বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে হত। তামার ব্যবহার ভালভাবে জানা ছিল. রাজস্থানে তামার খনি অঞ্চলের ব্যবহার বোধ হয় এই সময় থেকেই সুরু হয়েছিল। পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার অবশ্য উঠে যায় নি। চিত্রিত মৃৎপাত্রের মধ্যে কালো-ও-লাল এক ধরণের মৃৎপাত্র যার ওপর সাদা নক্সা আঁকা থাকত তাই ছিল প্রধান। এই সংস্কৃতির স্থায়িত্বকাল খৃষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত।

দক্ষিণপূর্ব্ব রাজস্থানে এই সংস্কৃতির সূত্রপাতের একটু পরে মধ্যভারতে চম্বল, নর্মদা, বেত্রবতী, বীণা ইত্যাদি নদীর অববাহিকায় আর একটি সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। ঐ অঞ্চলে নভদাতোলি, নাগদা, বিদিশা, এরান প্রভৃতি জায়গা থেকে এই সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। একটি বিশেষ ধরণের চিত্রিত মৃৎপাত্র (লাল রঙের ওপর কালো নক্সা আঁকা) ছিল এই সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাড়ীঘর ছিল মাটি, বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরী। তামার ব্যবহার জানা থাকলেও হাতিয়ার তৈরীতে পাথরের ব্যবহারই বেশী ছিল। শস্যের মধ্যে গম, ধান, মুগ, তিল ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এই সংস্কৃতির তারিখ খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টাদশ-সপ্তদশ শতক হ'তে দ্বাদশ-একাদশ শতক।

আরও দক্ষিণে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ-ত্রয়োদশ শতকে মহারাষ্ট্রে গোদাবরী, প্রবর ভীমা, গির্ণা নদীর উপত্যকায় আর একটি আঞ্চলিক গ্রামীণ সংস্কৃতি পাওয়া যায়। নেবাসা, চান্দোলী, নাসিক, জরওয়ে প্রভৃতি জায়গায় খননকার্য

পরিচালনা করা হয়েছে। এই সংস্কৃতির মূল ধরন অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্কৃতির মতই (চিত্রিত মৃৎপাত্র, পাথরের ও তামার হাতিয়ার, কাদামাটি বাঁশ ও কাঠের ঘরবাড়ী) তবে মৃৎপাত্রের ধরণ ও নক্সা আলাদা। প্রায় একশতেরও বেশী কবর শুধু নেবাসা থেকেই পাওয়া গেছে—বেশীর ভাগ কবরই যদিও শিশুদের। কবর দেওয়ার আলাদা কোন জায়গা ছিল না, ঘরের মেঝের নিচে, বড় মৃৎ পাত্রের ভেতর শরীর পুরে, দরকার হলে একটির বেশী মৃৎপাত্র মুখোমুখি শুইয়ে রেখে কবর দেওয়া হত। কখনও এমনি মাটিতে শুইয়েও কবর দেওয়া হত। কবরগুলি বেশীর ভাগ শিশুদের হওয়ায় কঙ্কাল পরীক্ষা করে সমসাময়িক লোকের বিশেষ কোন জাতিগত পরিচয় পাওয়া যায়নি।

দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার অন্তর্বর্তী রায়চুর দোয়াবে গ্রামীণ সংস্কৃতি আরও প্রাচীন। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ২৩০০ অব্দের কাছাকাছি থেকে খৃষ্টপূর্ব্ব ৯০০ অব্দ পর্যন্ত এখানে নব্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। কিছু বিশেষ জায়গার নাম করা যেতে পারে—উৎপুর, পিকলিহাল, ব্রহ্মগিরি, সাঙ্গানাকাল্লু, নরসিপুর ইত্যাদি। প্রথমদিকে অবশ্য এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ছিল মূলতঃ পশুপালনকারী। এই পশুপালনকারীদের উপর ফ্রান্সিস্ রেমণ্ড অলচিনের গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অন্ধ্রে কৃষ্ণার নিম্ন অববাহিকায় নাগার্জুনকোণ্ডা অঞ্চলে নব্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির স্তর মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে কিন্তু তার চিত্র এখনও খুব অস্পষ্ট।

পূর্ব্বভারতে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে কুচাই, পশ্চিমবঙ্গে অজয় উপত্যকায় রাজার ঢিবির প্রথম স্তর, সিংভূমে বারুডি প্রভৃতি হয়ত এই অঞ্চলে গ্রামীণ সংস্কৃতি প্রথম স্তর সূচনা করে। তারিখ হয়ত খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০০ অব্দের আগে নয়। একটু পরে খৃষ্টপূর্ব্ব নবম-অষ্টম শতকে বিহারের চিরণ, শোনপুর পশ্চিমবঙ্গের রাজার ঢিবি, মহিষাদল, নানুর প্রভৃতি স্থান চিত্রিত মৃৎপাত্র, তামা ও পাথরের হাতিয়ার ব্যবহারকারী অপেক্ষাকৃত উন্নত এক গ্রামীণ সংস্কৃতির অস্তিত্ব বহন করে।

ঊর্দ্ধ গাঙ্গেয় অববাহিকায় খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০০ অব্দ থেকে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র ব্যবহারকারী এক সংস্কৃতির সূচনা হয়। এদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লৌহের ব্যবহার।

একেবারে উত্তরে কাশ্মীর শ্রীনগর উপত্যকায় খৃষ্টপূর্ব্ব ১৯০০ অব্দ থেকেই এক নব্যপ্রস্তরযুগীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি ছিল।

ঐতিহাসিক যুগ সুরু হয় প্রথম গাঙ্গেয় উপত্যকায়—প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে অনুমানিক ৫০০ অব্দ হতে। মোটামুটি ভাবে, খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০০ অব্দের ভেতর ভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান অঞ্চলে গ্রামীণ সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে।

এই আঞ্চলিক সংস্কৃতিগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান স্পষ্টতই অত্যন্ত অল্প। এদের উৎপত্তি কিছু জানা যায় না যদিও দক্ষিণপূর্ব্ব রাজস্থান, মধ্যভারত ও মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতিগুলির উপর সাধারণভাবে ইরাণীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য অঞ্চলের সংস্কৃতিগুলির উৎপত্তি সম্পর্কেও বিশ্লেষণ দেওয়া হয় তবে তা' এখনও কোন সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্তের পর্যায়ে ওঠেনি। বিভিন্ন অঞ্চলের ভিতর যোগাযোগ নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু সেই যোগাযোগের চিত্রও অস্পষ্ট। কি চাষ হত, কি ভাবে চাষ করা হত জানি না, শুধু নভদাতোলি থেকে কিছু শস্য পাওয়া যাচ্ছে। ঐ সমস্ত শস্য এখনও ঐ অঞ্চলে চাষ করা হয়। যব ও গম পশ্চিম এশিয়া থেকে যদিও এসে থাকে তবু ধান চাষ নিশ্চয় ঐ অঞ্চল থেকে আসেনি। ধান সম্পর্কে দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার সঙ্গে যোগের কথা ভাবা হয়ে থাকে কিন্তু উদ্ভিদ্‌বিদ্যার দিক থেকে ভারতেও স্বাধীনভাবে ধান চাষের সূত্রপাত হওয়া সম্ভব। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্য কিছু সংগ্রহ করা হয় নি। প্রথম গ্রামগুলির আয়তন, জনসংখ্যা, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এদের যোগ ইত্যাদি সমস্যা সম্পর্কেও বিশদ গবেষণা হওয়ার দরকার আছে।

একান্ত অযৌক্তিক ভাবে মনে করা হয়ে থাকে সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার পতনের পর ভারতে সাংস্কৃতিক অবনতি হয়েছিল। কিন্তু এই হরপ্পাসভ্যতা পরবর্তী সময়েই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রথম কৃষিসংস্কৃতির পত্তন হয়, প্রথম গ্রাম গড়ে উঠতে থাকে, পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক ভারতের সাংস্কৃতিক পটভূমি রচিত হয়। দুর্ভাগ্য বশতঃ, এই সম্পর্কে এখনও আমাদের কোন বিশদ ধারণা নেই আর এর গুরুত্বও এখনও যথোচিত উপলব্ধি করা হয়নি।

গ্রন্থপঞ্জী

Gordon Childe, Man Makes Himself, 1936.

Braidwood and Howe, Prehistoric investigations in Iraqi Kurdistan, 1960.

Braidwood and Willey, Courses toward Urban Life, 1962.

Robert Raikes, "Physical environment and human settlement in Prehistoric times in the Near and Middle East. A hydrological approach," East and West, Vol 15, No. 3-4, September-December, 1965.

V. D. Krishnaswami, "The neolithic pattern of India," Ancient India, No. 10. 1960.

B. K. Thapar, "The neolithic problem in India," Indian Prehistory 1964, 1965.

H. D. Sankalia, Prehistory and Protohistory in India and Pakistan, 1963.

F. R. Allchin. The neolithic cattle keepers of Deccan, 1963.

B. B. Lal. "A picture emerges—an assessment of the carbon-14 datings.....—...Indo-Pakistan subcontinent," Ancient India, Nos. 18 and 19, 1963.

Chronica Botanica, Vol 13, no 1/6, 1949/50—Selected Writings of N. I. Vavilov, pp. 26, 29.

পত্র পত্রিকায় ইতিহাস

[এদেশে ও বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় ইতিহাস সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশিত হয়। এইসব পত্রিকায় প্রকাশিত ইতিহাস বিষয়ক মূল্যবান প্রবন্ধগুলির সারাংশ 'ইতিহাস' পত্রিকায় প্রকাশের উদ্দেশ্যে এই নূতন বিভাগটি সংযোজিত হইল।]

Bengal Past and Present : 1963—1966.

'Morley Minto Reforms'—Amales Tripathi.

লর্ড কার্জনের পরবর্তী ভাইসরয় 'কনসারভেটিব্' লর্ড মিণ্টো এবং সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট লিবারেল জন মর্লের যৌথপ্রচেষ্টার ফল ১৯০৯ সালের তথাকথিত শাসনতান্ত্রিক সংস্কার। মূল সংস্কারগুলির সংগে পরিচয় থাকলেও তাদের যে পশ্চাৎপট সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা নেই ডঃ ত্রিপাঠী তার উপর আলোকসম্পাত করেছেন। লর্ড মিণ্টো যিনি একই সঙ্গে পদাঘাত এবং চুম্বনপ্রদানের নীতি ('a Policy of Kicks and Kisses') অনুসরণ করেছিলেন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে যিনি কংগ্রেসের প্রতিকূলশক্তির সন্ধানে ছিলেন, কিভাবে তিনি নরমপন্থী এবং মুসলমানদের মধ্যে সেই শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন, ডঃ ত্রিপাঠী তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন। ফুলারের সাম্প্রদায়িকতা এবং দুটি মুসলিম ডেপুটেশন তাঁকে কি ভাবে শক্তি যুগিয়েছিল এবং চরমপন্থীদের বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে জন মর্লেকে অবহিত করে আশু সংস্কার সম্পর্কে তাঁর মতামতকে লর্ড মিণ্টো কিভাবে প্রভাবিত ক'রেছিলেন লেখক তাও সবিস্তারে আলোচনা করেছেন

'Bakimchandra and Extremist Thought'—Amales Tripathi

স্বদেশী অন্দোলনের রুকমন্ত্র 'বন্দে মাতরমে'র উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছু ভ্রান্ত ধারণা

পোষণের অবকাশ আছে এবং একথা অস্বীকার করা যায়না যে সে সম্পর্কে কিছু ভ্রান্তধারণা প্রচলিতও রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বঙ্কিমের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং পৃষ্ঠপোষকতা ও সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ করা হয়ে থাকে। আবার তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের 'গোঁজামিল' এবং রামমোহনকে মার্টিন লুথারের সঙ্গে তুলনা ক'রে বঙ্কিমকে ইগনাসিয়াস্ লয়লার মত প্রতিধর্মসংস্কারের গোঁড়া প্রবক্তা বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। বঙ্কিমের সমাজ সচেতন মনে যে সমস্ত প্রশ্ন জেগেছিল তার সদুত্তর লাভের আশায় প্রথম জীবনে তিনি পাশ্চাত্য দর্শনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং মিল, কোঁৎ (Comte) ও বেন্থামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন একথা যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে ভারতের বেদ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা এবং উপনিষদ থেকেই তাঁর যুক্তিবাদী মন প্রকৃত সত্য এবং তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল। অধ্যাপক ত্রিপাঠী এই প্রবন্ধে বঙ্কিম-চেতনার কয়েকটি অন্ধকার কোনে আলোকপাত ক'রেছেন এবং চরমপন্থী মতবাদের বিবর্তন বঙ্কিমের কাছে কি পরিমাণে ঋণী তাও আলোচনা করেছেন।

'Trends in Bengal 's Swadeshi Movement' -Sumit Sarkar.

আলোচ্য প্রবন্ধে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি এবং কিভাবে স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলন সন্ত্রাসবাদের পথে অগ্রসর হল লেখক তা আলোচনা করেছেন। লেখক বন্দেমাতরম্, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার পত্রিকা, সন্ধ্যা, কেশরী, যুগান্তর, নবশক্তি, চারু মিহির, বরিশাল হিতৈষী, হিতবার্তা ইত্যাদি সমসাময়িক পত্রিকা থেকে তথ্য আহরণ করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা এবং তাঁর স্বাদেশিকতা সম্পর্কে আলোচনা প্রবন্ধটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য। স্বদেশী অন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে কবিগুরুর মনোভাব বিশ্লেষণ প্রসংগে তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতি এবং প্রবন্ধের শেষে 'গোরা' উপন্যাসের গোরা চরিত্র এবং 'ঘরে বাইরে'র 'নিখিলেশ' চরিত্রটির উল্লেখ প্রবন্ধটির মূল্যবৃদ্ধি করেছে।

'Indian Officials under the E. I. Co. in 18th Century Bengal'—P. J. Marshal.

লেখক পলাশীর যুদ্ধ থেকে সুরু করে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় পর্য্যন্ত কোম্পানীর অধীনে ভারতীয় কর্মচারীদের নিয়োগ, তাদের কর্মদক্ষতা এবং

ইউরোপীয়ানদের সহিত তাদের পার্থক্যের কথা আলোচনা করেছেন। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কোম্পানীর অধীন বাংলাদেশে এক আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং তাদের এই উদ্দেশ্য সাধনে ভারতীয় কর্মচারীদের ভূমিকার কথাও লেখক আলোচনা করেছেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পাওয়ার পর রাজস্ব আদায়ই ছিল কোম্পানীর কর্ণধারদের প্রধান উদ্দেশ্য। মুঘলদের প্রবর্তিত জটিল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় ইংরাজদের বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল এবং ভারতীয়দের সাহায্য নেওয়া ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর ছিল না। মিঃ মার্শাল তাঁর প্রবন্ধে তৎকালীন সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করেছেন।

'Bishop Middleton (The First Lord Bishop of Calcutta) and Raja Rammohan Roy'—Nishith Ranjan Roy.

কলিকাতার প্রথম লর্ড বিশপ মিডলটন এবং ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের সাক্ষাৎ এবং তারই ফলে যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা। তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং একে অপরের রচনা, চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের দ্বারা কি পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন তৎসম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ক'রে অধ্যাপক রায় প্রকৃত তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বিজন গোস্বামী

Past and Present : Number 33 : April 1966

'Labour in the Third Reich'—T. W. Mason

এই প্রবন্ধে লেখক ১৯৩৩ সালের পর থেকে জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগতি (development) পর্যালোচনা করেছেন।

১৯৩৩ সালে জার্মানীর ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কিন্তু যেহেতু শ্রমিকেরা সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ, অতএব এই শ্রমিক শ্রেণীকে রক্ষা করা, পরামর্শ দেওয়া ও শোষণ করার কাজে নাৎসী পার্টিকে এগিয়ে আসতে হল (to preserve, exhort and exploit the mutilated body of the German working class)।

ট্রেড ইউনিয়নের অনুপস্থিতির ফলে শ্রমিকেরা অবশ্য বেতন হ্রাস ইত্যাদি মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং তাদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। বিশেষতঃ অনেক শ্রমিক এই সময় বেকার ছিল। কিন্তু হিটলার বুঝেছিলেন যে শ্রমিক শ্রেণীকে বাদ দেওয়ার থেকে তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করাই বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে। শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করা ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য German Labour Front গঠিত হল রবার্ট লে-র নেতৃত্বে। শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষই লেবার ফ্রন্টের সদস্য হল। সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হল যে জার্মানীতে শ্রেণী সংগ্রাম লুপ্ত হয়েছে। উৎপাদন বাড়ল, জার্মাণ সমাজতন্ত্রবাদের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য সাধিত হল।

উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্য অবশ্য শেষ পর্যন্ত সর্বাত্মক যুদ্ধ বা total war। কিন্তু এই বস্তুগত প্রয়োজনের কথা না বলে শ্রমিকদের সব সময়ই উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনের একটা আদর্শগত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এই সময়ে জার্মানীতে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা ছিল কম। অথচ যুদ্ধের মধ্যে উৎপাদন সম্পূর্ণ করতে হবে। বিশেষ বিশেষ শিল্পে—অস্ত্র উৎপাদন গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি—শ্রমিকদের বেতনের হার এবং উৎপাদনের খরচ ক্রমশঃ বেড়ে চলে। আবার বস্ত্র শিল্প প্রভৃতি ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কিছু লাভ হচ্ছিল না, কারণ এসব শিল্পের অবস্থা ভালো ছিল না। শ্রমিকের প্রয়োজন বেশি, সেইজন্য German Labour Frontএর ক্ষমতাও খুব বেড়ে যেতে লাগলো, শ্রমিকদের ব্যাপারে তাদেরই সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল বলে।

হিটলারের কাছে অর্থনীতির চেয়ে রাজনীতি বেশী জরুরী ছিল। অতএব শ্রমিক সমস্যার মত একটি অর্থ নৈতিক সমস্যা তিনি রাজনীতির দিক দিয়ে দেখলেন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বেতনহার এত বেশি বেড়ে যায় যে শ্রম দপ্তর প্রকাশিত বেতনের সংখ্যাতত্ত্ব থেকে দেখা যায় ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৩৮ সালের জুন পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় রোজগারের পরিমাণ গড়ে শতকরা ৫·৫ ভাগ বেড়েছে। প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮·২ ভাগ।

এর পর থেকে শ্রমিক সমস্যা সমাধানের জন্য শাসনতান্ত্রিক উপায়ের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে ডিক্রি জারী করে শ্রমিকদের সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। তাদের

ওপর উত্তরোত্তর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিস্তৃত হয়, কারণ খুব অল্প সময়ের মধ্যে অস্ত্রসজ্জা (rearmament) সম্পূর্ণ করা এবং শ্রমিকদের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখাই ছিল সরকারী উদ্দেশ্য, যদিও শ্রমিকদের চিন্তা ও মনোভাব নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। শ্রমিকদের বেতনও নিয়ন্ত্রণ করা হয় সরকারী ভাবে। ছুটির দিন বা অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য অতিরিক্ত বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু শ্রমিক সমস্যার মত একটি অর্থনৈতিক সমস্যার শাসনতান্ত্রিক সমাধানের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালেই নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে যুদ্ধ-কালীন অর্থনীতি ও শ্রমনীতি বিষয়ে রাইখ-এর সর্বপ্রধান কর্মকর্তাদের একটি আলোচনা সভায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রমিকদের সমস্ত রকমের বিশেষ সুবিধা ধীরে ধীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

'Social Mobility in England 1500—1700' : Lawrence Stone

লরেন্স স্টোন যথেষ্ট অগ্রগতি সম্পন্ন একটি ঐতিহ্যবাহী পাশ্চত্য সমাজের ছবি আঁকতে চেয়েছেন, যে সমাজ ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত যে কোন ইয়োরোপীয় সমাজের প্রতিনিধি হতে পারে। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন ১৫৪০ থেকে ১৬৪০ এর মধ্যে ইংরেজ সমাজ একটি বড় রকমের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। এই পরিবর্তনের অগ্রগতি ও অবসান হবার কারণ, এবং এর রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ফলাফলও বিচার করতে চেয়েছেন তিনি।

ইংল্যাণ্ডের সমাজে শ্রেণীবিভাগ ছিল ঠিকই। তবে সবচেয়ে মূলগত বিভাগ ছিল ভদ্রলোক ও ছোটলোক (gentleman and non-gentleman) —অর্থাৎ যারা কায়িক পরিশ্রম করত, আর যারা করত না। এছাড়াও উপার্জন ও সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ ছিল। সবক্ষেত্রেই শ্রেণীবিভাগের কাঠামো আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে উঠেছিল।

সমাজে শ্রেণীবিভাগ থাকলেও গতিশীলতা (mobility) ছিল যথেষ্ট। উপার্জনের তারতম্যের ফলে বিশেষ কোন কোন শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি প্রভৃতিই সামাজিক পরিবর্তনশীলতার কারণ বলে ধরা যায়।

বিভিন্ন শ্রেণীর চেহারার পরিবর্তন আলোচনা করতে গিয়ে একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে—তা হল, সমাজে ধনী ও দরিদ্র এই বিভাগটি

খুব স্পষ্ট ছিল। উচ্চ শ্রেণীর সংখ্যা এবং উপার্জন বাড়ছিল। নিম্ন শ্রেণীর সংখ্যা বাড়ছিল, উপার্জন কমছিল। আর উচ্চ শ্রেণীর বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অধিকতর সমতা দেখা যাচ্ছিল।

১৫৪০ থেকে ১৬৪০ পর্যন্ত সময়ে ইংল্যাণ্ডের সমাজে অনেক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী শক্তি কাজ করেছে, এর আগে বা পরে যেগুলি অত বেশি পরিমাণে দেখা যায় না। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধি, ব্যবসাবাণিজ্য বৃদ্ধি, জমিবিক্রী ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে সামাজিক গতিশীলতা এই সময়ে খুব বেড়ে যায়।

১৬৪০ থেকে ১৬৬০, এই দুই বৈপ্লবিক দশকে স্বভাবতই গতিশীলতা আরও প্রবল আকার ধারণ করে। তবে ১৬৬০ সালে রাজতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের পর গতিশীলতা বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

সমসাময়িক এবং পরবর্তী লোকেদের ধারণা ইংল্যাণ্ডের সমাজ ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে অত্যন্ত গতিশীল ছিল এবং সেইজন্যই ইংল্যাণ্ডে প্রথম এবং বিনা রক্তপাতে শিল্প বিপ্লব হতে পেরেছে। তবে বর্তমান লেখকের মত এই যে ১৫৪০ থেকে ১৬৬০ সালের মধ্যে যখন জমি খুব বেশি হাত বদলাচ্ছে, তখন ইংরেজ সমাজের ওপরের শ্রেণীতে গতিশীলতা খুব বেশি ছিল, এবং সপ্তদশ শতকেই গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে সাময়িক হলেও এই গতিশীলতার ফলে সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ও ভূস্বামী (squirarchy and gentry) সংখ্যায় বেড়েছে, যার ফলে অষ্টাদশ শতকে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন হতে পেরেছে। ব্যবসায়ী শ্রেণীর জনসংখ্যা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির ফলে তারা সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশ নিতে পেরেছে। ব্যবসায়ীদের সাহায্য করা সরকারের স্বার্থ। ক্রমশঃ বৈদেশিক সামরিক এবং অর্থনৈতিক নীতি বেশি করে উচ্চ শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে এবং তাদের পরামর্শে তৈরী হতে থাকে।

এর পরে বিভিন্ন কারণে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থায়িত্ব আসে ১৬৮৮-র গৌরবময় বিপ্লবের পর, যখন একটি দৃঢ়বদ্ধ অভিজাততন্ত্রের হাতে ইংল্যাণ্ডের শাসনভার চলে যায়।

পত্রলেখা ভট্টাচার্য

International Studies. Vol 8. Nos 1.2. July—October 1966.

'India and Pakistan as Factors in Each Other's Foreign Policies' Jayanta Kumar Ray.

ভারত ও পাকিস্থান দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র। তাদের পারস্পরিকতা দুই দেশের বৈদেশিক জাতিকে স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাবান্বিত করেছে। এই প্রভাব আরও বেশী তীব্র হয়েছে তার কারণ জন্ম মুহূর্ত্ত থেকেই একই ভূখণ্ডের এই যমজ রাষ্ট্র দুটি পরস্পর পরস্পরের প্রতি শত্রু মনোভাব পোষণ করে। তার ফলে, দুই রাষ্ট্রের মূল নীতিতে অনেক তফাৎ থাকলেও পারস্পরিক প্রভাব অনস্বীকার্য্য। যদিও ভারত জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেছে বিশ্ব-শান্তির কথা চিন্তা করে—অর্থ নৈতিক, সামরিক বা রাজনৈতিক মর্য্যাদায় দুর্ব্বল পাকিস্থানের ভয়ে নয়, পাকিস্থান কিন্তু পশ্চিমী সামরিক জোটে যোগ দিয়েছে পশ্চিমী মিত্রদের সাহায্যে শক্তিশালী ভারতের কাছ থেকে রাজনৈতিক সুযোগ আদায় করার জন্য। আবার ১৯৬২র জুনে রাশিয়া কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের পক্ষে ভেটো প্রয়োগ করলে পাকিস্থানের কাছে পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর বন্ধুত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই পাকিস্থান পশ্চিমী শক্তিজোট থেকে সরে এসে চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার সাথে যোগ দেবে ঐরকম সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করে। ১৯৬৩ সালে আয়ুব খান পাক-চীন আঁতাতের কথা খোলাখুলি ভাবেই ঘোষণা করেন। এইভাবে পাকিস্থানের জোটবদ্ধ নীতির মূল কারণ ভারত-ভীতি।

আয়তন ও সম্পদে দুর্ব্বল পাকিস্থানের ওপর ভারতের প্রভাব বেশী পড়বে এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের বৈদেশিক সম্পর্কের ওপরও পাক প্রভাব মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। মূল-নীতি ছাড়া নির্দ্দিষ্ট ঘটনাবলীর দিকে তাকালে এই প্রভাব বেশী চোখে পড়ে। স্বাধীনতা উত্তরযুগে ভারতের একটি অন্যতম ভ্রান্তি তিব্বতের ওপর চীনের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া। এই ভ্রান্তির একমাত্র ব্যাখ্যা পাকিস্থানের ভয়টাই অধিকতর হওয়ায় চীনের হাতে উত্তর সীমার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা ভারতের মনে দেখা দেয়নি। সাম্প্রতিক ঘটনার ক্ষেত্রেও ভারতের এই সীমিত কূটনৈতিক প্রয়াসের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তিব্বতের স্বাধীনতা ও

স্বীয় নিরাপত্তার জন্য ভারত যে U. N. এর সাহায্যে চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়নি তার একমাত্র কারণ তার আশংকা এই পন্থা কাশ্মীরের প্রশ্নে আত্মঘাতী হতে পারে। দক্ষিণ রোডেসিয়ার স্বাধীনতার ব্যাপারে ভারতের নিষ্ক্রিয়তার পেছনে একই আতঙ্ক বর্তমান। এইভাবে পাক-ভীতি ভারতের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে নানাভাবে খর্ব করেছে।

তাছাড়া, ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পারিক শত্রুতা অন্য রাষ্ট্রের প্রতি এদের সম্পর্ককে প্রভাবান্বিত করেছে। তবে এক্ষেত্রে পাকিস্তানের ওপর ভারতের প্রভাব যতটা প্রত্যক্ষ ভারতের ওপর পাকিস্তানের ততটা নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ১৯৬৫র পাক-ভারত অঘোষিত যুদ্ধের পর নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনাকালে মালয়েশিয়া ভারতের অনুকূলে মত প্রকাশ করায় পাকিস্তান তার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে অথচ জর্ডানের পাক-প্রীতিতে ভারত অসন্তুষ্ট হলেও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেনি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পাক-ভারত তিক্ততা যতদিন থাকবে উভয় দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে তার প্রভাব ততদিনই পড়বে। এর একমাত্র সমাধান পারস্পরিক বন্ধুত্ব অথচ এই বন্ধুত্বের আশা ক্রমশই ক্ষীণতর হচ্ছে আক্রমণ-কারী পাকিস্তানের সাথে সাম্রাজ্যবাদী চীনের যোগসাজসে। কচ্ছের রাণ সংক্রান্ত ঘটনা বা ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক অঘোষিত যুদ্ধ এই ক্ষীয়মান বন্ধুত্বেরই প্রকাশ।

শুক্লা বসু

নব
১ম খণ্ড

সংখ্যা
আশ্বিন-আশ্বিন, ১৩৭৪

ইতিহাস

সম্পাদক
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

নবপর্যায় দ্বিতীয় খণ্ড ২য় সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪

ইতিহাস

[ত্রৈমাসিক পত্রিকা]

সম্পাদক
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
শ্রীঅনলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক
অরুণকুমার দাশগুপ্ত
অমলেন্দু দে
শোভন বসু

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি
৩৩/১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা আড়াই টাকা
বার্ষিক আট টাকা

ইতিহাস কার্যালয়
কাশিমবাজার হাউস
৩০৯ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
অটো প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৭৯, বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা-৬

ইতিহাস বর্ষ ২ সংখ্যা ২ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কর্ণ সুবর্ণ সুধীর রঞ্জন দাস	৭৭
জিয়াউদ্দীন বারাণীর ইতিহাস দর্শন গৌতম ভদ্র	৯৯
স্মৃতিকথা রমেশচন্দ্র মজুমদার	১১২
র‍্যালফ্ ফিচের চোখে বাঙালা দেশ সাড়া দত্ত	১২৫
বিদ্রোহী বীর প্রতাপাদিত্য (প্রতিবাদ ও উত্তর) বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৩
মধ্যযুগের যুদ্ধ ও ভারতীয় সমাজ ভক্তপ্রসাদ মজুমদার	১৪৫

ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড] শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪ [২য় সংখ্যা

কর্ণসুবর্ণ

সুধীররঞ্জন দাশ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কর্ণসুবর্ণের পুরাবৃত্ত

(ক) বাংলার ভূভাগ ও কর্ণসুবর্ণ

(১)

পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী প্রাচীন সুহ্ম বা রাঢ় (রাঢ়া) ভূখণ্ডেই মহানগরী কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল। অঙ্গ (ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা, বিহার), বঙ্গ (পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙলা) এবং পুণ্ড্র (উত্তর-বঙ্গ) বাঙলাদেশের সুপ্রাচীন ভৌগোলিক বিভাগ। রাজশেখর পূর্বভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম এবং ব্রহ্ম নামক চতুষ্টয় জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতে বঙ্গ, সুহ্ম এবং তাম্রলিপ্ত নাম বিশিষ্ট ত্রয় অঞ্চলের নির্দেশ বর্তমান। দণ্ডীর দশকুমার চরিতে তাম্রলিপ্ত সুহ্ম ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জৈন উপাঙ্গ-গ্রন্থে তাম্রলিপ্ত বঙ্গ ভূভাগের অন্তর্গত। পরবর্তী সময়ে রাঢ় ও গৌড় সুহ্ম এবং পুণ্ড্র ভূখণ্ডদ্বয় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। সুহ্ম এবং রাঢ় অভিন্ন। টীকাকার নীলকণ্ঠের উক্তিতে 'সুহ্মা-রাঢ়া' একই ভূভাগ। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম বাঙলা সুহ্ম নামে খ্যাত ছিল। পরবর্তীকালে সুহ্ম-ভূভাগই রাঢ় নামে পরিচিত হয়। অঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম ভূভাগের সংযোগে পরবর্তী 'গৌড়রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিস্তৃত গৌড়-ভূখণ্ডের একাংশই রাঢ় নামে প্রসিদ্ধ।

(২)

প্রাচীন সাহিত্যে ও লেখমালায় গৌড়দেশ এবং গৌড়জনের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পাণিনি, কৌটিল্য ও বাৎস্যায়ন প্রভৃতির গ্রন্থে গৌড়-দেশের ও গৌড়জনের বর্ণনা বর্তমান। কিন্তু বিভিন্ন যুগে গৌড়ের ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমা-নির্দেশ পরিবর্তিত হইয়াছিল। হরাহা (৭৫৪ খৃঃ) লেখর বর্ণনা হইতে মনে হয় গৌড়জন সমুদ্রতীরবর্তী ছিল। সম্ভবতঃ বঙ্গ-ভূভাগের অংশও গৌড়-ভূভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় (ষষ্ঠ শতাব্দী) গৌড় এবং বঙ্গ ভিন্ন জনপদ। কোন সময়ে অঙ্গ দেশের রাজধানী চম্পা নগরীও গৌড়রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভবিষ্য-পুরাণের বর্ণনায় গৌড়ের সীমা উত্তরে পদ্মা ও দক্ষিণে বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রের বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, গৌড়-ভূখণ্ড বঙ্গ হইতে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল সুতরাং বিহার উড়িষ্যা ও বাঙলার বিভিন্ন অংশের সংযোগেই গৌড়রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডই গৌড়-কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

গৌড়-ভূখণ্ডের একাংশই রাঢ়। দিগ্‌বিজয়প্রকাশ নামক গ্রন্থে রাঢ় ভূভাগের সীমারেখার বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, রাঢ় অঞ্চল গৌড়ের দক্ষিণে, বীরভূমের পূর্বে এবং দামোদরের উত্তরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং রাঢ়-ভূভাগ গৌড় হইতে ভিন্ন। কিন্তু প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে (খৃষ্টীয় দশম শতক) রাঢ়াপুরী গৌড় দেশেরই প্রধান অংশ (গৌড়রাষ্ট্রমনুক্রমং নিরূপনা তত্রাপি রাঢ়াপুরী)।

(৩)

পরবর্তী সাহিত্য ও লেখমালার উপাদান হইতে প্রমাণিত হয় যে, গৌড় ও রাঢ় দুইটি স্বতন্ত্র ভূখণ্ড ছিল। বৌদ্ধ এবং জৈন গ্রন্থে উল্লিখিত 'লাট বা 'লাল' বা রাঢ়া রাঢ় নামেরই রূপান্তর। রাজশেখর কর্পূরমঞ্জরী নামক গ্রন্থে কানরূপ ও হরিকেলের সহিত রাঢ়া-জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। জৈন আচারাঙ্গ-সূত্রের বর্ণনায় রাঢ়া-ভূখণ্ড বজ্জ (বজ্র) ভূমি এবং সুব্‌ভ (সুহ্ম) ভূমি নামে দুইটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত। জৈন উপাঙ্গ-গ্রন্থে রাঢ়া একটি আর্য অধ্যুষিত জনপদ। রাজশেখর কর্তৃক উল্লিখিত সুহ্ম ও ব্রহ্ম দক্ষিণ এবং উত্তর রাঢ়ের

নামসূচক। ন্যূনপক্ষে নবম শতাব্দী হইতে রাঢ়-ভূখণ্ড উত্তর-রাঢ় ও দক্ষিণ-রাঢ় অংশদ্বয়ে বিভক্ত হয়। বিভিন্ন লেখমালায় এই অঞ্চলদ্বয়ের উল্লেখ বর্তমান। গঙ্গরাজ দেবেন্দ্রবর্মার লিপিতে দেবেন্দ্র উত্তর রাঢ়ের জনৈক অধিবাসীকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। ভোজবর্মার বেলাব তাম্রফলক-লেখতে উত্তর-রাঢ় উল্লিখিত আছে। বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রফলক-লেখ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উত্তর-রাঢ় মণ্ডল বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল। এই উত্তর-রাঢ়েই ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী ভূখণ্ড। প্রমাণ স্বরূপ তিরুমলয় শিলালিপির (খৃষ্টীয় একাদশ শতক) বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। তিরুমলয়-লেখতে 'উত্তীর-লাড়ম' (উত্তর-রাঢ়া) ও 'তক্কণ-লাড়ম' (দক্ষিণ-রাঢ়া) রাজ্যদ্বয়ের বর্ণনা বর্তমান। লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর লেখতেও উত্তর-রাঢ়ের নির্দেশ পাওয়া যায়। ভবিষ্য-পুরাণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে 'রাঢ়ী-খণ্ড-জাঙ্গল' নামক এক জনপদের উল্লেখ রহিয়াছে। এই 'রাঢ়ী-খণ্ড-জাঙ্গল' উত্তর-রাঢ় ভূখণ্ডেরই অন্তর্গত ছিল। সাধারণতঃ বলা যায় যে, বর্তমান মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং বর্ধমান জিলা-ত্রয়ের অংশই উত্তর-রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই উত্তর-রাঢ় ভূভাগেই প্রাচীন বাঙলার নগরশ্রী কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল।

(৪)

প্রসঙ্গক্রমে গৌড়-রাষ্ট্রভূখণ্ডের বিস্তার উল্লেখযোগ্য। কলহণের রাজ-তরঙ্গিণীতে পঞ্চগৌড়ের (গৌড়, সারস্বত, কান্যকুব্জ মিথিলা এবং উৎকল) নির্দেশ বর্তমান। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খৃষ্টাব্দে রচিত জৈন গ্রন্থমালায় লক্ষ্মণাবতী গৌড়ের অন্তর্গত। মুসলমান যুগের প্রারম্ভে (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) গৌড় ও লক্ষণাবতী অভিন্ন। তবকাত-ই-নাসিরি গ্রন্থে লিখিত আছে :- 'গঙ্গার ধারে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুটি পক্ষ, তন্মধ্যে পশ্চিমাংশ 'রাঢ়' এবং পূর্বাংশ 'বারিন্দ' নামে পরিচিত। পশ্চিমাংশে 'লখনৌ' এবং পূর্বাংশে 'দেওকোট' অবস্থিত। রাঢ় ও বারিন্দ লক্ষ্মণাবতীরই অংশ"। মোগল সম্রাট ঔরংজেবের সময়ে সায়েস্তা খাঁ গৌড়মণ্ডলেরই অধিপতি ছিলেন। অধিকন্তু গৌড় নাম সমগ্র বাঙলাদেশেরও পরিসূচক। বাঙলা-দেশের পরাক্রমশালী নৃপতিগণ গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীতেও বাঙলার অধিবাসিগণ গৌড়জন বলিয়াই সুপরিচিত ছিল।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীতে গৌড়-কর্ণসুবর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গৌড়-কর্ণসুবর্ণ রাষ্ট্র প্রধানতঃ উত্তর ও পশ্চিম বাংলার ভূভাগদ্বয়ের সংযোগেই সংগঠিত হইয়াছিল। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জিলায় ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী কর্ণসুবর্ণই এই গৌড়-কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল।

(খ) প্রাক্-শশাঙ্ক পর্ব

(৫)

রাঢ় ভূখণ্ডের বা কর্ণসুবর্ণের প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত অদ্যাপি অজ্ঞাত। কোন প্রাচীন সাহিত্যে বা লেখমালায় কর্ণসুবর্ণের নামোল্লেখের সন্ধান পাওয়া যায় না। চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ভগবান তথাগত কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠে সাতদিন অতিবাহিত করিয়া ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধ সমতট এবং পুণ্ড্রবর্ধনেও ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে ভগবান বুদ্ধের বাঙলার বিভিন্নাংশে ধর্ম প্রচারের কাহিনীর কোন বর্ণনার সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ চীন-পরিব্রাজক বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের জনশ্রুতিই বর্ণনা করিয়াছেন। সম্রাট অশোক ভগবান বুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থান সমূহে স্তূপ ও বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। কর্ণসুবর্ণ মহানগরীর উপকণ্ঠেও অনেক স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু অদ্যাপি বাংলাদেশে অশোক-নির্মিত কোন স্তূপের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ভগবান বুদ্ধের ধর্মপ্রচার ও অশোক কর্তৃক স্তূপ নির্মাণ-কাহিনী সম্পূর্ণ জনশ্রুতি বা উপকথা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। ভবিষ্যতে অশোক-নির্মিত স্তূপের আবিষ্কারও অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

সম্ভবতঃ রাঢ়-ভূভাগের এবং রাঢ়জনের প্রাচীনতম বিবরণ জৈন আচারাঙ্গসূত্রের বর্ণনা হইতেই পাওয়া যায়। জৈন লেখকগণ রাঢ়জনকে বর্বর ও অসাধু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জৈন মহাবীর রাঢ়-ভূভাগের 'বজ্জভূমি' অঞ্চলে ধর্মপ্রচারার্থে আগমন করিলে রাঢ়জন তাঁহাকে স্বাগত জানায় নাই। এমন কি জৈন সন্ন্যাসীদিগের প্রতি কুকুর লেলাইয়া দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই। জৈন সন্ন্যাসীগণও রাঢ়বাসীদের সম্বন্ধে

অসাধু ভাষা প্রয়োগ করিতে সংকুচিত হয় নাই। জৈন ধর্মপ্রচারকদিগের প্রতি এই প্রকার বর্বরোচিত ব্যবহারের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান ছিল। জৈন মহাবীর বিরুদ্ধ সংস্কৃতি ও ধর্মগোষ্ঠীর প্রতিপুরুষ ছিলেন। তিনি জৈনধর্ম প্রচারের নিমিত্তই রাঢ়দেশে আগমন করিয়াছিলেন। রাঢ়বাসিগণ স্বধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার্থেই জৈন সন্ন্যাসীদিগের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিল।

জৈন ভগবতী-সূত্রে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ভারতের ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে 'লাঢ়' (রাঢ়া) মহাজনপদের নামোল্লেখ ও বর্ণনা বর্তমান। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যে 'লাঢ়' (রাঢ়া) মহাজনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র একটি বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে 'লালপুর' (রাঢ়) দেশের উল্লেখ রহিয়াছে। অঙ্গুত্তর-নিকায়ে বর্ণিত ষোড়শ মহাজনপদের তালিকায় অঙ্গদেশই প্রাচীনতম মহাজনপদ। জৈনগ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাঢ় একটি স্বাধীন জনপদরূপে বিরাজমান ছিল। রাঢ়ই পূর্বভারতের পূর্বতম রাষ্ট্র। মগধাধিপতি বিম্বিসার কর্তৃক অঙ্গরাজ্য অধিকৃত হইবার পর রাঢ়-কর্ণসুবর্ণ অঞ্চল সম্ভবতঃ মগধের হর্যঙ্ক, শিশুনাগ এবং নন্দবংশীয় নৃপতিবর্গের অধিকারভুক্ত হয়।

(৬)

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর এবং পরবর্তী যুগের গ্রীক ও রোমক লেখকগণের গ্রন্থমালায় উত্তর ভারতে 'প্রাসিয়াই' ও 'গঙ্গারিডাই' এর বর্ণনা পাওয়া যায়। এই গ্রীক শব্দদ্বয়ের সাধারণ অর্থ সম্ভবতঃ প্রাচ্য ও গাঙ্গেয় উপত্যকার জনগণ। 'গঙ্গারিডাই' নামের প্রকৃত তাৎপর্য অবিদিত। মনে হয় 'গঙ্গারিডাই' বঙ্গ ও রাঢ় ভূখণ্ডেরই জ্ঞাপনসূচক। 'গঙ্গারিডাই' ও 'প্রাসিয়াই' নামক রাষ্ট্রদ্বয়ের স্থিতি ও অবস্থানও অনুমেয়। সম্ভবতঃ 'গঙ্গারিডাই' গঙ্গারাষ্ট্র এবং প্রাসিয়াই প্রাচ্য রাষ্ট্র নামে খ্যাত ছিল। এই রাষ্ট্রদ্বয় মগধের মহাপদ্মনন্দের অধীনে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। মগধের নন্দ-বংশকে পরাভূত করিয়া মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত গঙ্গারিডাই এবং প্রাচ্য রাজ্যদ্বয়ের অধিপতি হইয়াছিলেন।

চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের-ভ্রমণ-বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মহানগরী কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠে সম্রাট অশোক কতিপয় বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণ

করাইয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বিবরণে কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠে অবস্থিত প্রখ্যাত রক্তমৃত্তিকা সংঘারামের সন্নিকটেই 'অশোক রাজা' একটি স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সম্রাট অশোক একাধিক স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ হইতে মনে হয় যে, কর্ণসুবর্ণ নিশ্চয়ই মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্রাট অশোক বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উপরন্তু দিব্যাবদান ও অশোকাবদান গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, সম্রাট অশোক পুণ্ড্রবর্ধনের আজীবিক ও নির্গন্থদিগকে উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে অশোক কর্তৃক সিংহলে ধর্ম প্রচার-কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায়। অশোক কর্তৃক প্রেরিত ধর্মপ্রচারকগণ পশ্চিম বাংলার প্রাচীনতম পোতাশ্রয় তাম্রলিপ্তি হইতেই সমুদ্রপথে সিংহলে যাত্রা করিয়াছিল। যদিও বাঙলাদেশে অশোক-নির্মিত স্তূপ এবং লেখর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, তথাপি সাহিত্যিক উপাদান হইতে মনে হয় যে, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এই অনুমান মহাস্থানগড়ে (বগুড়া জিলা, উত্তর বঙ্গ) আবিষ্কৃত ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ লেখদ্বারা সমর্থিত।

মৌর্য সাম্রাজ্য পতনের পরবর্তী যুগে বাঙলার তথা কর্ণসুবর্ণের ইতিহাস অজ্ঞাত। শুঙ্গ ও কাণ্ব বংশীয় নৃপতিগণ উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে মগধের আধিপত্য সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ এই যুগে বঙ্গদেশের বিভিন্নাংশের স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী কুষাণযুগেও বাঙলা দেশের ইতিবৃত্ত অবিদিত। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কতিপয় কুষাণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই আবিষ্কৃত মুদ্রা দ্বারা বাঙলা দেশে কুষাণ আধিপত্য বিস্তার প্রমাণিত হয় না। বাঙলাদেশের বিশেষতঃ উত্তর ও পশ্চিম ভূভাগের পুরাবৃত্ত মগধের গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের উদ্ভব কাল হইতেই রূপায়িত করা সম্ভবপর।

(৭)

গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের আদি বাসস্থান বা আবির্ভাব কেন্দ্র সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় চীন-পরিব্রাজক ই-ৎসিঙ্ (৬৭৩—৬৮৫ খৃঃ) কর্তৃক বর্ণিত শ্রীগুপ্তের কাহিনী ও অন্য তথ্যের

উপর নির্ভর করিয়া যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের পূর্বপুরুষগণের আদিম বাসভূমি বা উদ্ভবকেন্দ্র সম্ভবতঃ উত্তর অথবা পশ্চিম বঙ্গে (মুর্শিদাবাদ জিলা) অবস্থিত ছিল। ই-ৎসিঙ্ লিখিয়াছেন যে, মহারাজা শ্রীগুপ্ত চৈনিক পুরোহিতগণের নিমিত্ত একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং উহার সংরক্ষণার্থে ২৪টি গ্রামও দান করিয়াছিলেন। শ্রীগুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি 'চীন-মন্দির' নামে খ্যাত ছিল। নালন্দার পূর্বদিকে ৪০ যোজন দূরবর্তী মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো নামক ধর্মসংস্থার সন্নিকটেই চীন-মন্দির অবস্থিত ছিল। ই-ৎসিঙ্ বর্ণিত দিক্-নির্দেশ ও দূরত্বের পরিমাপ হইতে মনে হয় যে মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো বাঙলা দেশেই অবস্থিত ছিল। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত ১০১৫ খৃষ্টাব্দে চিত্রিত পাণ্ডুলিপিতে একটি বৌদ্ধস্তূপের চিত্রের সহিত লিখিত আছে 'বরেন্দ্রের মৃগস্থাপন-স্তূপ'। অনেকে মনে করেন যে, মৃগস্থাপনস্তূপই চৈনিক মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নোর সংস্কৃত রূপান্তর। কিন্তু চৈনিক মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নোর প্রকৃত সংস্কৃত রূপ 'মৃগশিখাবন'। বরেন্দ্র নামোল্লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে মৃগস্থাপনস্তূপ বা মৃগশিখাবন উত্তর বঙ্গেই অবস্থিত ছিল

তৎসময়ে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী ভূভাগের অংশও সম্ভবতঃ বরেন্দ্র-ভূখণ্ডের অন্তর্গত ছিল উত্তর-রাঢ়ে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলেই মৃগশিখাবনের অবস্থান অসম্ভব নহে। সুতরাং ই-ৎসিঙ্ কর্তৃক বর্ণিত শ্রীগুপ্তের উপাখ্যান হইতে মনে হয় যে, আদি গুপ্ত-নৃপতিগণের একটি উদ্ভব কেন্দ্র সম্ভবতঃ পশ্চিম বাংলার ভূখণ্ডেই অবস্থিত ছিল।

কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে গুপ্ত-নৃপতিগণের আদি বাসস্থানের অবস্থান পৌরাণিক উপাদান দ্বারা অসমর্থিত নহে। তৎসত্ত্বেও উত্তর বা পশ্চিম বাঙলার অংশ বিশেষ মহারাজা শ্রীগুপ্তের অধীনে ছিল বলিয়াই মনে হয়। অপর রাজ্যে তিনি নিশ্চয়ই মন্দির নির্মাণ করান নাই।

ই-ৎসিঙের ভ্রমণ-বিবরণে লিখিত আছে যে শ্রীগুপ্ত তাঁহার সময় হইতে ৫০০ বৎসর পূর্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন (অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্তে); কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের (৩২০ খৃঃ) আদিপুরুষ শ্রীগুপ্তের আবির্ভাব কাল ভিন্ন। মনে হয় ই-ৎসিঙ্ একটি জনশ্রুতিরই বর্ণনা করিয়াছেন এবং শ্রীগুপ্তের কাল-নিরূপণে ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নহে। উত্তর

-রাঢ় ও কর্ণসুবর্ণ আদি গুপ্ত-নৃপতিগণের অধীনে থাকাও অসম্ভব নহে।

মৃগশিখাবন সম্ভবতঃ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী কর্ণসুবর্ণের নিকটবর্তী অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। ই-ৎসিঙ্ বর্ণিত দিক্-নির্দেশ ও দূরত্বের পরিমাপ অনুসারে কর্ণসুবর্ণের সন্নিকটে মৃগশিখাবনের (মৃগস্থাপনস্তূপ) অবস্থান যুক্তিসিদ্ধ নহে। ই-ৎসিঙের বিবরণের দূরত্ব ও দিক-নির্দেশ ভ্রমাত্মক হওয়াও অসম্ভব নহে। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্তে হিউয়েন-সাঙ্ কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠে বহু বৌদ্ধ মঠ, বিহার ও স্তূপের অবস্থান বর্ণনা করিয়াছেন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ জিলায় রাজবাড়ীডাঙ্গা নামক প্রত্নস্থলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উৎখননের ফলে গুপ্ত ও প্রাক্-গুপ্ত-যুগের বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মনে হয় গুপ্তযুগের আবিষ্কৃত সৌধশ্রেণীর মধ্যে কোন একটি মৃগস্থাপনস্তূপ নামে পরিচিত ছিল, অথবা রাজবাড়ীডাঙ্গার নিকটবর্তী অঞ্চল মৃগশিখাবন নামে খ্যাত ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রাজবাড়ীডাঙার উৎখননে বহু লেখ ও প্রতীক সম্বলিত সীল উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল সীলে মুদ্রিত প্রতিমূর্তির মধ্যে মৃগের প্রতিকৃতির আধিক্য হইতে মনে হয় যে, এতৎস্থানেই মৃগস্থাপনস্তূপের অবস্থিতি ছিল। উপরন্তু রাজবাড়ীডাঙা মৃগদাবের (সারনাথ) অনুকরণে মৃগশিখাবন নামাঙ্কিত হওয়াও অসম্ভব নহে।

(৮)

উত্তর-রাঢ় ভূখণ্ডে গুপ্তযুগের সমসাময়িক প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের অবিদ্যমানতা সত্ত্বেও অনুমান করা যায় যে, গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের আবির্ভাব কাল হইতেই কর্ণসুবর্ণ সম্ভবতঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমুদ্র-গুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপির বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয় যে, সমতট (পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ) একটি স্বতন্ত্র পূর্বপ্রান্তবর্তী রাজ্য ছিল। কিন্তু সমতট-রাজ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে রাঢ় বা কর্ণসুবর্ণ ভূভাগের নামোল্লেখের সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং কর্ণসুবর্ণ বা রাঢ় অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অধিকন্তু, এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে লিখিত আছে যে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তের বহু নৃপতিগণের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন। পরাজিত নৃপতিগণের তালিকায় চন্দ্রবর্মা নামক এক রাজার নামোল্লেখ বর্তমান। চন্দ্রবর্মা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উপাদান বিরল। শুশুনিয়ায় (পোখর্ণা; বাঁকুড়া সহর হইতে ২৫ মাইল দূরবর্তী) আবিষ্কৃত শিলালিপিতে চন্দ্রবর্মা নামক এক নৃপতির উল্লেখ রহিয়াছে। সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মা রাঢ় অঞ্চলেরই অধিপতি ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে শুশুনিয়া শিলালিপির চন্দ্রবর্মা এবং এলাহাবাদ স্তম্ভলিপির চন্দ্রবর্মা অভিন্ন। যদি এলাহাবাদ ও শুশুনিয়া লেখ-দ্বয়ের চন্দ্রবর্মা অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করিয়াই সমুদ্রগুপ্ত রাঢ় বা কর্ণসুবর্ণ অঞ্চল গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাঢ় বা কর্ণসুবর্ণ যদি মহারাজা শ্রীগুপ্তের সময় হইতেই গুপ্তাধীনে ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহা হইলে সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক কর্ণসুবর্ণ বা রাঢ় অঞ্চল বিজয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পূর্বে বা পরবর্তী কোন এক সময়ে বঙ্গ ও রাঢ় ভূভাগের স্থানীয় অধিনায়কগণ কর্তৃক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থে গুপ্তাধিপত্যের বিরুদ্ধাচরণও অসম্ভব নহে। এই কারণ বশতঃ সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করিয়া রাঢ় অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের জীবিত কালে রাঢ় ও কর্ণসুবর্ণ গুপ্ত সাম্রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল।

(৯)

দিল্লীর নিকটবর্তী মেহরৌলী গ্রামে কুতুবমিনারের সন্নিকটে দণ্ডায়মান লৌহ স্তম্ভগাত্রের লেখ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, চন্দ্র নামক এক রাজা সম্মিলিত বঙ্গজনকে পরাজিত করিয়াছিলেন। যদি দিল্লীর স্তম্ভগাত্রে লিখিত রাজা চন্দ্র ও গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অভিন্নতা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বভারতে বঙ্গজন ও অন্যান্য অধিবাসিগণ সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে সম্মিলিত হইয়া গুপ্ত আধিপত্যের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। মনে হয়, যে সকল অঞ্চল গুপ্ত অধিকারভুক্ত ছিল, উহারাও এই সম্মিলনে

যোগদান করিয়াছিল। এতৎসময়ে কর্ণসুবর্ণ মহানগরী বা কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের বিদ্যমানতার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণের সন্ধান পাওয়া যায় না। তত্রাপি কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের বা মহানগরীর অবিদ্যমানতাও স্বীকার্য নহে। সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণও এই সংযুক্ত বঙ্গরাষ্ট্রপুঞ্জের আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই সম্মিলিত বঙ্গজনকে পরাজিত করিয়া গুপ্ত আধিপত্য সুরক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পরবর্তী সময়েও উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ মগধের গুপ্ত নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। দামোদরপুর তাম্রফলক-লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে, পুণ্ড্রবর্ধন গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি প্রধান শাসন কেন্দ্র ছিল। বাঙলার একাধিক অংশ হইতে গুপ্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু রাঢ় ভূভাগে গুপ্তাধিপত্যের প্রত্যক্ষ প্রামাণিক উপাদান বিরল। নিখিল নাথ রায় ছিরুটি অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত কতিপয় মুদ্রার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। একটি মুদ্রায় বিষ্ণুগুপ্তের নাম অঙ্কিত আছে। এই বিষ্ণুগুপ্ত সম্ভবতঃ গুপ্ত বংশজাত নৃপতি বিষ্ণুগুপ্ত। কিন্তু একটি মুদ্রার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া রাঢ় অঞ্চলে গুপ্তাধিপত্যের প্রসার নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না। রাজবাড়ীডাঙায় উৎখননের ফলে অনেক গুপ্তযুগের প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল প্রত্নিদর্শনই কর্ণসুবর্ণ অঞ্চলে গুপ্তাধিকার ও গুপ্ত সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

(১০)

ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসের প্রধানতম কারণ মালবাধিপতি যশোধর্মার দিগ্বিজয় অভিযান। মন্দশোর লেখতে (৫৩৩ খৃঃ) যশোধর্মার সামরিক অভিযানের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা বর্তমান। যশোধর্মা বিদেশী হূনদিগকে পরাজিত করিয়া গুপ্তাধিপত্যের বিরুদ্ধাচরণার্থে সামরিক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দিগ্বিজয় অভিযান লৌহিত্য হইতে পশ্চিম সাগর এবং হিমালয় হইতে মহেন্দ্র পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যদি প্রকৃতই যশোধর্মা লৌহিত্য তীর পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, মালবরাজের সৈন্যবাহিনী পশ্চিম এবং উত্তর বঙ্গ অতিক্রম করিয়াই লৌহিত্য তীরে উপনীত

হইয়াছিল। যশোধর্মার দিগ্বিজয় অভিযানের ফলে সমগ্র উত্তর ভারতে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। কিন্তু যশোধর্মার অভিযানের পরবর্তী সময়েও উত্তর বঙ্গে ৫৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গুপ্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং মালবাধিপতি যশোধর্মার অভিযান-প্রসূত সামরিক সার্বভৌমত্ব দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় নাই।

(১১)

হূণ আক্রমণ এবং যশোধর্মার দিগ্বিজয় অভিযান-প্রসূত বিশৃঙ্খলার ফলে গুপ্তসাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে সামন্ত নৃপতিবর্গ এবং প্রাদেশিক অধিনায়কগণ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। এতৎসময়ে সমতটের (পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙলা) স্থানীয় অধিনায়কগণ স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। কোটালীপাড়া, মল্লসারুল এবং গুণাইঘাটি তাম্রফলক লেখমালা হইতে তৎকালীন বাঙলার রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। কোটালীপাড়া ও বর্ধমান হইতে আবিষ্কৃত লেখমালায় পর্যালোচনে তিনজন অধিনায়ক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহাদিগের মধ্যে ন্যূনপক্ষে একজন সুবর্ণমুদ্রাও প্রচলন করিয়াছিলেন। এই মহারাজাধিরাজ-ত্রয়ের নাম যথাক্রমে :- মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র, মহারাজাধিরাজ ধর্মাদিত্য এবং মহারাজাধিরাজ সমাচারদেব। মহারাজাধিরাজগণ আনুমানিক ৫২৫ খৃঃ হইতে ৫৭৫ খৃঃ পর্যন্ত আনুপূর্ব রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেহ-কেহ অনুমান করিয়াছেন যে মহারাজাধিরাজ সমাচারদেব কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কের সমকালীন ছিলেন। কিন্তু এই অনুমান ভিত্তিহীন। কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক সমাচারদেবের পরবর্তী ছিলেন। নব্যাবকাশিকা-বারকমণ্ডল এবং বর্ধমানভুক্তি এই মহারাজাধিরাজগণের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নালন্দা হইতে আবিষ্কৃত একটি সীলে লিখিত আছে 'সমাচার (দেব)।' এই সীলাঙ্কিত 'সমাচার' ও সমতটের মহারাজাধিরাজ সমাচারদেব অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সমাচারদেব নামাঙ্কিত সীলদ্বারা নালন্দা পর্যন্ত সমাচারদেবের সাম্রাজ্যের বিস্তারের কোন যুক্তি নাই। সম্ভবতঃ সমাচার-দেব তীর্থ পর্যটনে বা পরিদর্শনার্থে নালন্দা মহাবিহারে গমন করিয়াছিলেন। মনে হয়, সাধারণ উপাসক রূপে তিনি স্বীয় নামাঙ্কিত সীল বৌদ্ধমন্দিরে উৎসর্গ

করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কৃত সীল সমাচারদেবের নালন্দা পরিদর্শনের স্মৃতিবাহক।

মহারাজাধিরাজগণ সর্বপ্রথম পূর্ববঙ্গে তাঁহাদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। অনন্তর উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্নাংশ সমতট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কর্ণসুবর্ণও সমতট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়াই মনে হয়। অধিকন্তু পূর্ববঙ্গের বিভিন্নাংশ হইতে কতিপয় অমার্জিত ও দূষিত স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রার উপকরণ হইতে মনে হয় যে, মহারাজাধিরাজগণের মৃত্যুর পরেও কতিপয় নৃপতি পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু সমতট ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে মহারাজাধিরাজগণের এবং উহাদিগের উত্তরাধিকারিগণের অবস্থিতি সুদৃঢ় হইবার পূর্বেই গৌড়-কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অভ্যুত্থান হইয়াছিল।

(গ) শশাঙ্কের অভ্যুদয়

(১২)

পরবর্তী-গুপ্তবংশীয় নৃপতি প্রথম জীবিত গুপ্তের রাজত্ব কালেই গৌড়জন প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল। অফসড়-লেখতে সমুদ্রতীরবর্তী পরাক্রান্ত শত্রুর উল্লেখ বর্তমান। সম্ভবতঃ এই পরাক্রান্ত শত্রুই বঙ্গ-গৌড়জনের নির্দেশক। মনে হয় গৌড়জনের পরাক্রম ও প্রভাব বিস্তারের উদ্‌যোগ কর্ণসুবর্ণ মহানগরী হইতেই সূত্রপাত হইয়াছিল। হরাহা-লেখ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পরাক্রমশালী স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী গৌড়জন মৌখরী রাজবংশের সার্বভৌম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। সুতরাং মৌখরী ঈশানবর্মা পরাক্রান্ত গৌড়জনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হরাহা-লিপির বর্ণনানুসারে ঈশানবর্মা অন্ধ্রদিগকে পরাজিত করিয়া গৌড়জনকে সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঈশানবর্মা গৌড়জনকে সমুদ্র পর্যন্ত বিতাড়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গৌড়জনের আধিপত্য যে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গৌড়বাসীদিগের সমুদ্রে জলদুর্গও ছিল।

মনে হয় ঈশানবর্মা কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া গৌড়জন তাহাদিগের জলদুর্গেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

(১৩)

ঈশানবর্মার অভিযানের পরে পরবর্তী-গুপ্ত নৃপতিগণ বাঙলাদেশে আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। অফসড়-লেখর বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পরবর্তী-গুপ্ত সম্রাট মহাসেনগুপ্ত ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্তে লৌহিত্যতীরে কামরূপ-রাজ সুস্থিতবর্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। যদি প্রকৃতই মহাসেনগুপ্তের সামরিক অভিযান লৌহিত্য পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, পরবর্তী-গুপ্ত-সেনাবাহিনী পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ অতিক্রম করিয়াছিল। সুতরাং পশ্চিম এবং উত্তর বঙ্গে মহাসেন-গুপ্তের আধিপত্য স্বল্পকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে মৌখরী ও পরবর্তী-গুপ্ত নৃপতিগণ পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের উপর সার্বভৌম আধিপত্য বিস্তারের নিমিত্ত সামরিক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। মগধের এবং কনৌজের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে রাজ্যরক্ষার্থে গৌড়জন অস্ত্রধারণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই।

ঈশানবর্মা ও মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুর পর কোন মৌখরী বা পরবর্তী-গুপ্ত নৃপতি বাঙলা দেশে সার্বভৌম আধিপত্য রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। পরবর্তী গুপ্ত-মৌখরী এবং উদীয়মান গৌড়জন চালুক্য কীর্তিবর্মা (৬ষ্ঠ শতাব্দীর অন্তে) কর্তৃক পরিচালিত সামরিক অভিযানের দ্বারা বিপর্যস্ত হইয়াছিল। মহাকূট লেখতে বর্ণিত আছে যে চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মা অঙ্গ, বঙ্গ এবং মগধ জয় করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তৎসময়ে কর্ণসুবর্ণ বঙ্গ রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিব্বতীয় কালানুক্রমিক বিবরণ হইতে মনে হয় যে, শ্রোনব-সান্ (৫৮১—৬০০ খৃঃ) মধ্য ভারতে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। চালুক্য ও তিব্বতীয় বহিঃশত্রুর অভিযানের ফলে বঙ্গদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে কর্ণসুবর্ণের গৌড়জন শশাঙ্কের নেতৃত্বে গৌড়-কর্ণসুবর্ণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। প্রথম পর্যায়ে শশাঙ্ক পরবর্তী-গুপ্ত নৃপতিগণের অধীনে একজন মহা-সামন্ত ছিলেন। স্বাতন্ত্র্য অভিলাষী মহাবল পরাক্রমশালী শশাঙ্ক মৌখরী অভিযানে বিধ্বস্ত গৌড়জনের কলঙ্ক জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। সুতরাং

কর্ণসুবর্ণে স্বীয় আধিপত্য সুদৃঢ় করিয়াই শশাঙ্ক প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত মৌখরীগণের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন।

(১৪)

চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের (৪০০ – ৪১১ খৃঃ) ভ্রমণ-বিবরণে কর্ণসুবর্ণের নামোল্লেখের সন্ধান পাওয়া যায় না। মনে হয় ফা-হিয়েনের সময়ে কর্ণসুবর্ণ শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফা-হিয়েন কর্ণসুবর্ণ পরিদর্শনে গমণ করেন নাই। বারাণসী হইতে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া চম্পা নগরীতে উপনীত হইয়াছিলেন। চম্পা হইতে পূর্বদিকে ৫০ যোজন পথক্রম পাদচারণ করিয়া তাম্রলিপ্ত বন্দরে পৌঁছিয়াছিলেন। ফা-হিয়েন বাঙলার প্রাচীনতম পোতাশ্রয়ে ও বন্দরে বৌদ্ধ শাস্ত্র-পুঁথিমালার অনুলিপন ও চিত্রাঙ্কন কার্যে দুই বৎসর অতিবাহিত করিয়া বাণিজ্যপোতে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তৎসময়ে কর্ণসুবর্ণ একটি সমৃদ্ধশালী বৌদ্ধকেন্দ্র রূপে সুপরিচিত থাকিলে ফা-হিয়েন নিশ্চয়ই পরিদর্শনার্থে গমন করিতেন। কিন্তু চীন-পরিব্রাজক কর্ণসুবর্ণ পরিদর্শন করেন নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ফা-হিয়েন উত্তর ভারতের তথা বঙ্গদেশের বহু সমৃদ্ধ সম্পন্ন বৌদ্ধকেন্দ্র ও মহানগরী পরিদর্শন করেন নাই। এমন কি ফা-হিয়েন সারনাথ এবং প্রয়াগ পরিদর্শনেও গমন করেন নাই। ফা-হিয়েনের ভ্রমণ-বিবরণ হইতে মনে হয় যে, তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায়েই তড়িৎগতিতে তাম্রলিপ্তিতে পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, ফা-হিয়েনের ভ্রমণ-কালেও পূর্বভারতে তথা পশ্চিম বাঙলায় কর্ণসুবর্ণ একটি সমৃদ্ধশালী বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল। সম্প্রতি রাজবাড়ীডাঙায় উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত গুপ্ত ও প্রাক-গুপ্তযুগের প্রত্ননিদর্শন এই সিদ্ধান্তের প্রত্যয়জনক প্রমাণ।

(১৫)

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্তে বা সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কর্ণসুবর্ণ রাজ্য ও রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবল পরাক্রমশালী মহাসামন্ত শশাঙ্কই কর্ণসুবর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া কর্ণসুবর্ণ মহানগরীতে রাজ্যের রাজধানী সংস্থাপন

করিয়াছিলেন। শশাঙ্কই মহানগরী কর্ণসুবর্ণকে একটি শ্রীসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রূপায়িত করেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ বিবরণীতে একাধিকবার লিখিত আছে:- 'পূর্ব ভারতের কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজা সে-সাঙ-কিয়া' অর্থাৎ শশাঙ্ক।

শশাঙ্কের পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত অদ্যাপি অবিদিত। তাঁহার বংশাবলী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে শশাঙ্ক যে সর্বপ্রথম পরবর্তী-গুপ্ত নৃপতিগণের অধীনে একজন মহাসামন্ত ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিহারের সাহাবাদ জিলায় শোন নদীর তীরবর্তী রোটাস্‌গড়ে বেগলার কর্তৃক আবিষ্কৃত পর্ব্বত-গাত্রের সীল-ঠাঁচে উৎকীর্ণ আছে:- 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবস্য'।

(১৬)

পুরাতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট (Fleet) সীল-ঠাঁচে অঙ্কিত শশাঙ্কদেব ও কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক একই ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেগলার 'সাওসঙ্ক' (১০০ শঙ্ক) নামক এক পরাক্রমশালী নৃপতির সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতির বর্ণনা করিয়াছেন। 'সাওসঙ্ক' শশাঙ্ক নামেরই বিকৃত রূপ। কানিং-হাম (Cunningham) গয়া ও যশোহর জিলা হইতে আবিষ্কৃত শশাঙ্ক নামাঙ্কিত মুদ্রার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। মহানদ ও বর্ধমান হইতেও শশাঙ্কের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রায় অঙ্কিত আছে, শ্রীশশাঙ্ক। মুদ্রাঙ্কিত শ্রীশশাঙ্কই হিউয়েন-সাঙ্ বর্ণিত কর্ণসুবর্ণের অধিপতি 'রাজা শশাঙ্ক'।

(১৭)

কানিংহাম মনে করেন যে জৈন গ্রন্থোক্ত নরেন্দ্রগুপ্তই শশাঙ্ক নামে খ্যাত ছিলেন। হলের (Hall) মতে শশাঙ্ক গুপ্তরাজবংশজাত ছিলেন এবং তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল শশাঙ্কগুপ্ত। উপরিউক্ত যশোহর জিলা হইতে আবিষ্কৃত একটি মুদ্রায় অঙ্কিত আছে: 'নরেন্দ্র বিনত'। সুতরাং প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নরেন্দ্রগুপ্ত শশাঙ্কেরই দ্বিতীয় নাম ছিল। কেহ-কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, এই নরেন্দ্রগুপ্তই পরবর্তী-গুপ্ত সম্রাট মহাসেনগুপ্তের পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র। এতদ্‌ভিন্ন বাণভট্ট-রচিত

হর্ষচরিতের একটি পাণ্ডুলিপিতে থানেশ্বর-রাজ রাজ্যবর্ধনের হন্তা নরেন্দ্রগুপ্ত নামে অভিহিত। কিন্তু হর্ষচরিতের অন্য পাণ্ডুলিপিতে লিখিত আছে যে, গৌড়াধিপই (শশাঙ্ক) রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙ্ ও বাণভট্টের বিবরণে কর্ণসুবর্ণের অধিপতি বা গৌড়াধিপ শশাঙ্কই রাজ্যবর্ধনের হন্তা। সুতরাং পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, নরেন্দ্রগুপ্ত ও শশাঙ্ক অভিন্ন। সম্ভবতঃ নরেন্দ্রগুপ্ত শশাঙ্কের অপর নাম ছিল।

কিন্তু গৌড়াধিপতি ও কর্ণসুবর্ণাধিপতি ভিন্ন ব্যক্তি মনে করিবার যুক্তিও বর্তমান। বাণভট্ট রাজ্যবর্ধন-হন্তাকে গৌড়াধিপ বলিয়াছেন। হিউয়েন-সাঙের বিবরণে বৌদ্ধবিদ্বেষী কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কই রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বিবরণে কর্ণসুবর্ণ ও পুণ্ড্রবর্ধন (গৌড়) দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। চীন-পরিব্রাজক শশাঙ্ককে গৌড়ের অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। উপরন্তু হর্ষচরিতের একটি পুঁথিতে রাজ্যবর্ধনের হন্তার নাম নরেন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু অন্য পাণ্ডুলিপিতে গৌড়াধিপ। সম্ভবতঃ নরেন্দ্রগুপ্তই প্রকৃত গৌড়াধিপ এবং শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। সুতরাং শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু হিউয়েন-সাঙের বিবরণে পুণ্ড্রবর্ধনের রাজার নাম অবর্তমান। মনে হয় কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কই পুণ্ড্রবর্ধনের বা গৌড়েও অধিপতি ছিলেন। এই কারণবশতঃই সম্ভবতঃ হিউয়েন-সাঙ্ গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নাই। শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রগুপ্তের অভিন্নতা স্বীকার করিলেও কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক যে মগধের গুপ্তবংশজাত ছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই।

(১৮)

বেভারিজের মতে রোটাসগড় সীল-ছাঁচে অঙ্কিত শশাঙ্কের সহিত গৌড়াধিপ শশাঙ্কের একত্বীকরণ স্বীকার্য নহে। তিনি মনে করেন যে, আবুল-ফজল কর্তৃক বিবৃত শশধর ও উপরিউক্ত সীল-ছাঁচের শশাঙ্ক অভিন্ন। শশধর (চন্দ্র) ও শশাঙ্ক শব্দদ্বয় একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে হিউয়েন-সাঙ্ শশাঙ্ককে চৈনিক ভাষায় চন্দ্র শব্দেই অনুবাদ করিয়াছেন। আবুল ফজলের বর্ণনায় শশধর আদিশূর বংশের অষ্টম অধিকারী ছিলেন। বেভারিজ বলিয়াছেন যে, গুপ্ত নৃপতিগণের সমসাময়িক আদিশূর আদিত্য বংশের পূর্বেই

রাজত্ব করিয়াছিলেন। আদিশূর এবং তাহার রাজত্বকাল ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবে অপ্রমাণিত। কিন্তু শূর-বংশের নৃপতিগণ যে বাঙালা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিরুমলয়-লেখ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজেন্দ্রচোলের বাঙালায় অভিযান-কালীন রণশূর রাঢ় রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ আদিশূর উত্তর-রাঢ়ের অধীশ্বর রণশূরেরই আদিপুরুষ ছিলেন। যদি আদিশূর নামক রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ঐতিহাসিক উপাদানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তিনি শশাঙ্কের পরবর্তী কালেই রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং গুপ্ত নৃপতিগণের সমসাময়িক ছিলেন না। শশাঙ্ক যে আদিশূর-বংশজাত ছিলেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

(১৯)

রোটাসগড় সীল-ঠাচে মহাসামন্ত 'শশাঙ্কদেব' হর্ষচরিতের গৌড়াধিপ, হিউয়েন-সাঙের সে-সাঙ-কিয়া এবং লেখমালার শ্রীশশাঙ্ক ও মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক অভিন্ন। রোটাসগড় সীল-ঠাচের নির্দেশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, শশাঙ্ক রোটাসগড়েই একজন মহাসামন্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ পরবর্তী-গুপ্ত নৃপতি মহাসেনগুপ্তের অধীনে রোটাসগড়েই শশাঙ্ক মহাসামন্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এই সিদ্ধান্ত অধ্যাপক বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত অভিমতের বিরুদ্ধ। অধ্যাপক সিংহ মনে করেন যে, শশাঙ্ক প্রথমে মগধের স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে গৌড়দেশ জয় করিয়াছিলেন। তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, শশাঙ্ক তাহার পিতৃদেব জয়নাগ কর্তৃকই রোটাসগড়ে মহাসামন্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং জয়নাগও মগধের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই মতবাদের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। পরবর্তী আলোচনা হইতে প্রমাণিত হইবে যে, জয়নাগ শশাঙ্কের উত্তরবর্তী, পূর্ববর্তী নহে। প্রকৃতপক্ষে শশাঙ্কের সহিত জয়নাগের সম্বন্ধ অদ্যাপি অজ্ঞাত।

(২০)

অধ্যাপক সুধাকর চট্টোপাধ্যায় শশাঙ্কের আদি বাসস্থান ও উদ্ভব-কেন্দ্র সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে শশাঙ্কের আদি বাসস্থান উত্তর বঙ্গেই অবস্থিত ছিল। উত্তর বঙ্গ হইতেই শশাঙ্ক বাঙালার বিভিন্নাংশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া কর্ণসুবর্ণ মহানগরীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় অনুমান করিয়াছেন যে, রোটাসগড় সীল-ছাঁচ শশাঙ্কের রাজত্বের শেষ পর্যায়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন থানেশ্বর-কনৌজের অধিপতি হর্ষবর্ধন কর্তৃক পরাজিত হইয়া শশাঙ্ক যখন অধস্তন শাসকরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময়েই রোটাসগড় সীল-ছাঁচ উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার মতে এতৎ সময়েই মেদিনীপুর তাম্রফলক দানপত্র খোদিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এমন কোন উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায় নাই যাহার উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শশাঙ্ক প্রথমে উত্তর বঙ্গ হইতে বহির্গত হইয়া বাঙালার অন্যান্য অংশের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। পরবর্তী আলোচনা হইতে প্রমাণিত হইবে যে, হর্ষবর্ধনের সহিত শশাঙ্কের কোন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ সংঘটিত হয় নাই। হর্ষবর্ধন কর্তৃক শশাঙ্কের পরাজয়ের স্বপক্ষেও কোন যুক্তি বা প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় নির্ধারণ করিয়াছেন যে হর্ষবর্ধন ৬১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে শশাঙ্ককে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই নির্ধারণ চীন-পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বিবরণে বর্ণিত তথ্যের বিরুদ্ধে। উপরিউক্ত সময়ের মধ্যে হর্ষবর্ধন কর্তৃক শশাঙ্কের পরাজয়ের মতবাদ গ্রাহ্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, হর্ষবর্ধনের দিগবিজয় অভিযানের সমাপ্তি এবং শশাঙ্কের পরাজয় ১৪ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু চীন-পরিব্রাজকের বিবরণে লিখিত আছে যে, হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণের সময় হইতে ষষ্ঠ বৎসরের মধ্যে 'পঞ্চভারত' জয় সমাপ্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তী আলোচনা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে, শশাঙ্ক যখন সার্বভৌম নৃপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখনই মেদিনীপুর তাম্রফলক দানপত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

(২১)

প্রামাণিক উপাদানের অবর্তমানে শশাঙ্কের আদি বাসস্থান নির্ধারণ সম্ভবপর নহে। জ্ঞাত উপকরণ সমূহের আলোচনা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দী অন্তে শশাঙ্ক সম্ভবতঃ প্রথমে কোন গুপ্ত নৃপতির অধীনে রোটাসগড়ে মহাসামন্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং রোটাসগড়ই মহাসামন্ত শশাঙ্কের প্রাথমিক কর্মকেন্দ্র ছিল। পতনোন্মুখ পরবর্তী-গুপ্ত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিতে মহাসামন্ত শশাঙ্ক পশ্চাৎপদ হন নাই। পক্ষান্তরে স্বাতন্ত্র্য এবং সার্বভৌমত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার অভিপ্রায়েই মহাসামন্ত শশাঙ্ক গৌড়াভিমুখে অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্তে গয়া ও মেদিনীপুর জেলাদ্বয়ের মধ্যবর্তী পর্বত-সঙ্কুল জনপদে মান-বংশীয়গণ একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কাল-ক্রমে মানগণ উড়িষ্যার বিভিন্ন অংশের উপরও প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তৎসময়ে পশ্চিমবঙ্গ সম্ভবতঃ সমতটের মহারাজাধিরাজগণের অথবা উহাদের উত্তরাধিকারগণের অধীনস্থ ছিল। শশাঙ্ক প্রথমে গৌড়-দিগকে সুসংবদ্ধ করিয়া মান এবং মহারাজাধিরাজদিগের উত্তরাধিকারি-গণকে পরাজিত করিয়া গৌড়-কর্ণসুবর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কর্ণসুবর্ণ মহানগরীতেই এই গৌড়-কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী সংস্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে শশাঙ্ক বাঙালা দেশে সর্বপ্রথম সার্বভৌম নৃপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

(২২)

প্রবল পরাক্রমশালী কামরূপের ভগদত্ত-বংশীয়গণ উদীয়মান গৌড়-কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের কণ্টক স্বরূপ হইয়া উঠিল। পরবর্তী-গুপ্ত নৃপতি মহাসেন-গুপ্ত কামরূপের রাজা সুস্থিতবর্মাকে লৌহিত্য তীরে পরাজিত করিয়াছিলেন। অফসড়-লেখতে বর্ণিত আছে যে, 'মহাসেনগুপ্তের শৌর্য ও বীর্যের খ্যাতি লৌহিত্য তীরে সর্বদাই গীত হইত। মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত পদে

অধিষ্ঠিত থাকাকালীন শশাঙ্কই সম্ভবতঃ কামরূপ অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কামরূপে পরবর্তী-গুপ্ত আধিপত্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। গুপ্ত সামরিক-বাহিনী কামরূপ হইতে অপসারিত হইবার পরেই সুস্থিতবর্মা পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন এবং সম্ভবতঃ শশাঙ্কের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। কামরূপে ভগদত্তগণের পুনরুত্থান গৌড়-কর্ণ-সুবর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী হইয়া উঠিল। সুতরাং শশাঙ্কের পক্ষে কামরূপের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।

সুস্থিতবর্মার উত্তরাধিকারী তাঁহার দুই পুত্র, সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মা এবং ভাস্কর-বর্মা, গৌড় আক্রমণকারী কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। এই গৌড় অভিযানের বর্ণনা ভাস্করবর্মার দুবী-তাম্রফলক-লেখতে বর্তমান দুবী-তাম্র-ফলক-লেখর বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সুস্থিতবর্মার মৃত্যুর পর গৌড়বাহিনী কামরূপ আক্রমণ করে। সুস্থিতবর্মার পুত্রদ্বয় কামরূপের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থে ব্রহ্মপুত্রের তীরে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আপ্রাণ সংগ্রাম করা সত্ত্বেও ভ্রাতৃদ্বয় ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। গৌড়সেনা ভ্রাতৃদ্বয়কে বন্দী করিয়া সম্ভবতঃ গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু পরে ভ্রাতৃযুগলকে মুক্তি প্রদান করিয়া গৌড়াধীপের অধীনে পূর্বপদে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। প্রথমে ভ্রাতৃদ্বয় যুক্তভাবেই কামরূপের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। অনন্তর ভাস্করবর্মা কামরূপের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দুবী-তাম্রফলক-লেখতে কামরূপে গৌড়-অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু গৌড়-আক্রমণকারীর নামোল্লেখ অবর্তমান। অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র সরকারের মতে ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্তে বা সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভেই কামরূপে গৌড়াভিযান শশাঙ্ক কর্তৃক সংগঠিত হইয়াছিল। আনুমানিক ৬০০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী সময়েই কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা হর্ষবর্ধনের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং কামরূপে গৌড়-অভিযান ৬০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই পরিচালিত হইয়াছিল। গৌড় আক্রমণকারী শশাঙ্ক অথবা তাহার পূর্বাধিষ্ঠিত কোন গৌড় অধিপতি হইবে। কিন্তু গৌড়াধীপ শশাঙ্কের পূর্ববর্তী কোন নৃপতির সন্ধান অজ্ঞাত। কেহ কেহ জয়নাগকে শশাঙ্কের পূর্ববর্তী গৌড়াধিপতি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। পরবর্তী আলোচনা হইতে প্রমাণিত হইবে যে, জয়নাগ

প্রকৃতপক্ষে শশাঙ্কের অনুবর্তী ছিলেন। অতএব গৌড়াধিপ শশাঙ্ক কর্তৃকই কামরূপ-অভিযানের মতবাদ স্বীকার্য। ভাস্করবর্মা গৌড়-অভিযানের কলঙ্ক কোন দিন ভুলিতে পারেন নাই। প্রথম সুযোগেই গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের বিরুদ্ধাচরণার্থে থানেশ্বর-কনৌজ-অধিপতি হর্ষবর্ধনের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। হর্ষবর্ধনও শশাঙ্ককে পরাজিত করিয়া গৌড় রাজ্য অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে কামরূপ রাজার সহিত সৌহার্দ স্থাপন করিলেন।

(২৩)

কর্ণসুবর্ণাধিপতি শশাঙ্ক কামরূপে আধিপত্য বিস্তার করিবার পর মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অংশ জয় করেন। মেদিনীপুর ও সোরো হইতে আবিষ্কৃত তাম্রফলক-দানপত্রের লেখর বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, উত্তর ভারতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করিবার পূর্বেই শশাঙ্ক মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা বিজয় সমাপ্ত করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মেদিনীপুর ও সোরো দানপত্র উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর বিজয়ের পরবর্তী কোন এক সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। দিগ্‌বিজয়ী শশাঙ্ক মগধও জয় করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাহার সার্বভৌমত্ব বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাঙলার নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহ জয় করিয়া শশাঙ্ক শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। কতিপয় নূতন ভুক্তি ও শাসনকেন্দ্র সংগঠন করিয়া সামন্ত মহারাজগণের এবং অপর রাজকর্মচারিদিগের হস্তে শাসনকার্য পরিচালনার গুরু দায়িত্ব বিন্যস্ত করিয়াছিলেন।

কনৌজাধিপতি ঈশানবর্মার সামরিক অভিযান প্রসূত কলঙ্ক গৌড়জন কোন দিন ভুলিতে পারে নাই। গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক প্রতিশোধ গ্রহণের প্রত্যাশায় কর্ণসুবর্ণে স্বীয় আধিপত্য সুদৃঢ় করিয়া সুবর্ণ সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যখন উত্তর ভারতে প্রধান পরাক্রমশালী রাজন্যবর্গ স্বীয় স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও সার্বভৌম আধিপত্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও সৌহার্দ স্থাপনে ব্যাপৃত ছিল, তখনই মহারাজা শশাঙ্ক এই প্রতিযোগিতামূলক দ্বন্দ্বে নিজেকে বিনিয়োগ করিলেন।

পরাক্রমশালী কনৌজ-মৌখরীদিগের দর্প চূর্ণ করিয়া গৌড়জনের কলঙ্ক বিমোচন পূর্বক উত্তর ভারতে গৌড়-কর্ণসুবর্ণ আধিপত্য বিস্তার করাই মহারাজা শশাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কর্ণসুবর্ণরাজ উত্তর ভারতের রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

———

জিয়াউদ্দীন বারাণীর ইতিহাস দর্শন

গৌতম ভদ্র

একথা প্রায় বলা হয় যে কবিতা পড়ার পূর্বে কবিকে জান, কারণ কবিতা কবির ব্যক্তিসত্তা নিরপেক্ষ নয় বরং সাপেক্ষ। এ ছাড়া কোন কবিতাই মোটামুটি ভাবে কবির সমসাময়িক দেশ ও কালের সম্পর্ক বিরহিত নয়। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একথা আরও অধিক সত্য। ঐতিহাসিক তথ্য ঐতিহাসিকের মনের দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। নায়কের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ের বদলে সাহিত্যিকের মনোনত নির্বাচিত অংশবিশেষই তাঁর রচনার প্রধান উপজীব্য হয়। ঠিক একইভাবে বিশেষ বিষয়ের প্রতি ঐতিহাসিকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ তাঁর মানসিক ধ্যানধারণা ও পারিপার্শ্বিক স্থানকালের উপর নির্ভরশীল। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সুলতানী আমলের এক খ্যাতনামা ভারতীয় ঐতিহাসিককে নিয়ে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

জিয়াউদ্দীন বারাণীর জন্ম বারাণ প্রদেশে অর্থাৎ বুলন্দশহরে। বিস্তারিত বিবরণের অভাবে তাঁর পরিবারের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। মুহম্মদ ঘুরী কর্তৃক বারাণ অধিকৃত হলে কিছু সৈয়দ ও শেখবংশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলিমরা ঐ স্থানে বসতি স্থাপন করেন। বারাণী নিজে বিক্ষিপ্তভাবে পূর্বপুরুষদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সমসাময়িক "সিয়ার-উল-আউলিয়ার" লেখক আল কারমানী আমীর খুরদ তাঁকে অভিজাত সম্প্রদায় সম্ভূত ছাড়া আর কিছু বলেন নি। "আখবারুল আখবরের" লেখক আবদুল হক-ও এই প্রসঙ্গে নীরব। তবে বারাণীর বিবরণ থেকে একথা স্পষ্ট যে তাঁর পিতা উচ্চবংশ সম্ভূত না হলেও তাঁর মাতা ও মাতামহী ছিলেন সৈয়দ বংশীয়া।

"……কৈমালের সৈয়দরা বংশমর্যাদার জন্য সুবিদিত ছিলেন। লেখকের পিতা কৈমালের জালালুদ্দীনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।"[১]

১। "তারিখ-ই ফিরুজশাহী"। এলিয়ট ও ডসন অনূদিত। পৃ: ৩২।

অতএব আমরা অনুমান করতে পারি যে নীলরক্তের অধিকারী হলেও বারাণীর পিতা সৈয়দ বংশীয় ছিলেন না। তিনি সম্ভবতঃ শেখ ছিলেন।

তাঁর পূর্বপুরুষেরা দিল্লীর শাসকমণ্ডলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা মোইহুল মুলক সুলতান জালালুদ্দীনের দ্বিতীয় পুত্র আরকালী খানের নায়িব ছিলেন। কাকা আলা-উল-মুলক দিল্লীর কোতোয়াল ও আলাউদ্দীনের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁরই উপদেশে আলাউদ্দীন বিশ্বজয় করবার ও ধর্মপ্রচারক হবার সাধ পরিত্যাগ করেন। তাঁর মামা হাসাম-উল্-দীন্ বলবনের আদেশে লখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করেন।

বারাণী নিজে কোথাও তাঁর জন্মের সন তারিখ উল্লেখ করেন নি। তবে তিনি যখন তাঁর "তারিখ" শেষ করেন তখন তিনি ৭৪ বছরের বৃদ্ধ। তিনি পুস্তকটি রচনা করেন ৭৫৮ অল্ হিজরীতে। অতএব এটা খুব সম্ভব যে তিনি ৬৮৪ অল্ হিজরী অর্থাৎ ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

বারাণী দিল্লীতে তাঁর পিতার সঙ্গে বাল্যকালে আগমন করেন। ছয় বছর বয়সে, জালালুদ্দিনের রাজত্বকালে, তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয়। বারাণী নিজের শিক্ষা বিষয়েও কোন বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করেন নি। তার মন সব সময় বয়সের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিকশিত হয়নি। অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে তিনি "অকালপক্ক" ছিলেন। তিনি ঐ অল্প বয়সেই পবিত্র কোরাণ পাঠ শেষ করে 'মুফ্রিদাৎ" বা আরবী শব্দকোষের সঙ্কলন কাজ আরম্ভ করেন। যাঁদের কাছে তিনি শিক্ষালাভ করেন তাঁদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে কোন কিছুর উল্লেখ না করলেও বারাণী সাধারণভাবে তাঁর শিক্ষকবৃন্দ সম্বন্ধে যা লিখে গেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

".....তাঁহাদের গবেষণা ছিল চুলচেরা।.....শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যায় রাজী ও গজালীর সমকক্ষ ছিলেন।"[২]

এঁদের কাছে তিনি আরবী ও ন্যায়শাস্ত্র ভালোভাবে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর সম্পূর্ণ অনীহা ও অংশতঃ অজ্ঞানতা থেকে একথা অনুমান করা যায় যে, এই দুটি বিষয় সম্পর্কে তিনি কিছুই জ্ঞানার্জন করেন নি। হজরৎ মুহম্মদ ও চারজন প্রখ্যাত খলিফা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

২। ঐ পৃঃ ৩৫২-৩৫৪।

তাঁর জানা থাকলেও ইসলামিক ইতিহাসের অন্যান্য অধ্যায়গুলি সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন না।

তাঁর শিক্ষাকালে মোঙ্গল আক্রমণের পরোক্ষ ফলস্বরূপ দিল্লী ইসলাম সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। বারাণী সমাজের সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের দরবারে অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করেন। কবি আমীর খসরু ও সঙ্গীতজ্ঞ হাসান আলী সজ্জারী তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর প্রথম যৌবনকাল আলাউদ্দীনের রাজত্বে অতিবাহিত হয়েছে। বৈষয়িক সমৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক উন্নতি ও স্বৈরাচারী শাসনের সব লক্ষণ বারাণীর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। তিনি সাধু সন্তদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করেছিলেন। সাধু নিজামুদ্দীন আউলিয়ার প্রধান শিষ্য ছিলেন তিনি। অথচ আধ্যাত্মিকতা তাঁর হৃদয়ে কোন গভীর আলোড়ন তোলে নি। কতকগুলি অর্থহীন ক্রিয়াকাণ্ড, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে তিনি ধর্ম-জীবন যাপনের প্রধান অবলম্বন করে তুলেছিলেন। সাধুসঙ্গ করলেও সন্ন্যাস জীবনের কঠোরতা তাঁর কাছে বিভীষিকাময় ছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃত জীবনরসিক—জীবনকে নানা ভাবে ভোগ করাই ছিল তাঁর চরম কাম্য। তিনি জালালুদ্দীনের আমলে রাজদরবারের নটীদের যে সজীব বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হয় যে, অল্প বয়সেই নারী সৌন্দর্য সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। সমসাময়িক যুগে প্রচলিত আমোদ-প্রমোদে দিন যাপন করাই তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিজে স্বীকারোক্তি করেছেন :

"……সেই সব বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী নারীরা……সুকণ্ঠ বালক ও বাদকেরা তাদের সুমধুর সঙ্গীতে আমাদের মনোরঞ্জন করত।…… আমি সেই সব দিনের জীবন প্রদায়িনী নারীদের স্মৃতি চারণা করছি।……সেই চন্দ্রমুখী নারীদের সৌন্দর্য সুধা আমি পান করেছি, তাদের গান ও নাচ আমার হৃদয়কে বিচলিত করেছে।……আমি তাদের সমাধির পার্শ্বে মৃত্যু কামনা করি।"[৩] এ ধরণের খেদোক্তি থেকে একথা কি মনে হয় না যে, বারাণীর মনে ভোগলিপ্সা প্রবল ছিল ও তিনি সে যুগের যে কোন সাধারণ মানুষের মত তরল ও উচ্ছল জীবনের প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করতেন ?

৩। ঐ পৃঃ ২০০।

মুবারক খিলজীর মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ৩৩ পূর্ণ হয়েছে। তারপর ১৭ বছর ৩ মাস ধরে তিনি মহম্মদ-বিন-তুঘলকের 'নাদিম' বা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তাঁর উপরে শাসনতান্ত্রিক বা রাজস্ব বিভাগীয় ভার ন্যস্ত হয়েছিল—এ রকমের কোন প্রমাণ নেই। বারাণী পণ্ডিত হিসাবেই মহম্মদ-বিন-তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত দিল্লী দরবারের ছত্রছায়ায় বারাণীর জীবন সুখ স্বাচ্ছন্দের মধ্যে কেটে যায়। তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে দিল্লীর উপকণ্ঠে কৈলুগারিতে একটি প্রাসাদ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। তাছাড়া গিয়াসপুরেও তিনি একটি বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন।

কিন্তু মহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর পর শত্রুদের ষড়যন্ত্রে তাঁর জীবনে নানা দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। আমরা তাঁর ভাগ্যবিড়ম্বনার দুটি কারণ অনুমান করতে পারি। প্রথমতঃ, মহম্মদের মৃত্যুর পর বারাণী রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে খাজা-ই-জাহানের অভ্যুত্থান সমর্থন করেন। সেই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে ফিরুজের মন্ত্রী খান-ই-জাহান অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। দ্বিতীয়তঃ, খান-ই-জাহান ছিলেন ধর্মান্তরিত হিন্দু ও নীচ বংশসম্ভূত। বলাবাহুল্য এ ধরণের ব্যক্তির প্রতি, তিনি যত শক্তিশালীই হউন না কেন, বারাণীর কোন আন্তরিক সহানুভূতি বা শ্রদ্ধার ভাব ছিল না। এই উন্নাসিক মনোভাবই রাজ্যের প্রধান উজীরকে তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল। তিনিই বারাণীকে রাজসভা থেকে বহিষ্কৃত করেন। তাঁকে প্রায় পাঁচ মাস ভাৎনীরের দুর্গে কারারুদ্ধ অবস্থায় থাকতে হয়। অবশেষে সুলতান ফিরুজ শাহের অনুগ্রহে যদিও তাঁর প্রাণরক্ষা হল কিন্তু তাঁর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। দিল্লীর উপকণ্ঠে গিয়াসপুরে দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। তাঁর শবদেহে এক টুকরা মাদুর ছাড়া আর কিছুই দেওয়া সম্ভব হয় নি। আমীর খুসরু তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বলেছেন :

"শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় তাঁর কাছে অর্থ বা পরিধেয় বস্ত্র কিছুই ছিল না।...একখণ্ড চট তাঁর শবাধারের আচ্ছাদনরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল।"৪

৪। সিয়ার-উল্-আউলিয়া। মুহিব হিন্দ প্রকাশনী। দিল্লী। পৃঃ ৩১২-৩১৩।

তাঁর মৃত্যুর সাল সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তিনি যখন 'তারিখ' রচনা করেন তখন তাঁর বয়স ৭৪ এবং আমীর খুরদের মতে মৃত্যুর সময় ৭০ বছরের কিছু বেশী ছিল। তাই তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনার কিছুদিন পরে সম্ভবতঃ ১৩৫৯ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

"তারিখ-ই-ফিরূজশাহী" ও "ফুতুহাৎ-ই-জাহাঁদারী"র জন্য বারাণীর খ্যাতি প্রচারিত হলেও আরও কয়েকটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। উপরোক্ত গ্রন্থ দু'টি বাদে তাঁর অন্যান্য রচনার নাম সনা-ই-মহম্মদী (প্রচারক মহম্মদের স্তুতি), সলাৎ-ই-কবীর (শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা), ইনায়েৎ-ই-ইলাহী (ঈশ্বরের দান সম্পর্কিত রচনা), মাসির-ই-সাদৎ (সৈয়দদের সুকীর্তি), হসরৎ নামা (অনুশোচনার পুস্তক), তারিখ-ই-বারামেকা (বারামেকাদের ইতিহাস), ও খুলাতুৎ তারিখ (ইতিহাস সার)। তাঁর প্রথম বই 'সনা-ই-মহম্মদী'। কারারুদ্ধ থাকার সময় মুক্তির জন্য মহম্মদের নিকট প্রার্থনা করে তিনি তাঁর জীবনকথা রচনা করেন। প্রায় ৬৯ বছর বয়সে এইভাবে বারাণীর লেখক জীবন শুরু হয়। "হসরৎ নামা" হল আত্ম-জীবনী মূলক রচনা। তাঁর "তারিখ-ই-বারামেকা" গ্রন্থে তিনি হারুণ-অল-রসিদের সময়ে প্রখ্যাত বারামেকা পরিবারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন ও তাদের দানশীলতার কথাই বিশেষ ভাবে বলেছেন। দুঃস্থ বারাণী সবসময় কারুর দয়ায় দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাবার স্বপ্ন দেখতেন ও তারই ছাপ এই গ্রন্থে পড়েছে। এইসব গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী না হলেও আমরা শুধু এইটুকু অনুমান করতে পারি যে, তিনি একদিকে যেমন ইসলাম ধর্মের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন অন্যদিকে জীবনী জাতীয় রচনাতেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

অমর গ্রন্থ "তারিখ-ই-ফিরূজশাহী" রচনার সময় বারাণীর মানসিক অবস্থা শোচনীয় ছিল। তিনি "মুকদ্দমা" বা ভূমিকায় গভীর হতাশা প্রকাশ করেছেন। কারণ তার ধারণা ছিল তিনি তাঁর প্রতিভার যোগ্য সমাদর লাভ করেননি। তিনি বহুদিন রাজ দরবারের দাক্ষিণ্য লাভ করেছিলেন কিন্তু বিলাস ব্যসনে জীবন যাপন করার জন্য কিছুই সঞ্চয় করতে পারেন নি। শত্রুদের চক্রান্তে সমস্ত ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে বারাণী জীবন সায়াহ্নে দারিদ্রের কঠোর লাঞ্ছনাকে সহজ ভাবে নিতে পারেন নি। আমীর খুরদের মতে—

".....তিনি ৭০ বছর বয়সে উপনীত হলে নিজ অনুরোধক্রমে রাজ দরবার থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ...জীবন ধারণের যা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য সবই তিনি ফিরুজের কাছ থেকে লাভ করেন।"[৪] কোন কোন লেখক এই উক্তিকে অসত্য বলেছেন। এটা ঠিক যে বারাণী স্বেচ্ছায় দরবার ত্যাগ করেন নি। কিন্তু ফিরুজ শাহ কর্তৃক মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্তের কথাটা ভিত্তিহীন বলে মনে হয় না। কারণ বারাণী নিজে বলেছেন

".....যদি সুলতান.....ফিরুজ শাহ আমার উদ্ধারের চেষ্টা না করতেন এবং যদি তিনি এই দুর্বল জীবটির শক্তিমান ও প্রভাবশালী শত্রুদের কথা শুনতেন ও তাদের বিশ্বাস করতেন আমি জননী ধরিত্রীর ক্রোড়দেশে সুপ্ত থাকতাম। .....সুলতানের কাছেই আমি আমার জীবনের জন্য ঋণী।"[৬] সুতরাং স্বভাবতই মনে হয় দয়াশীল ফিরুজ তাঁকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতেন। কিন্তু বারাণী কখনই মাসোহারার ফলে তাঁর পূর্বের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে পান নি। সর্বদা তিনি নিজেকে রিক্ত ও বঞ্চিত বলে মনে করেছেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে তিনি তাঁর ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য মহম্মদ-বিন-তুঘলকের শত শত নিষ্ঠুর কার্য অনুষ্ঠানের সময় নিজের নীরবতাকে দায়ী করেছেন। তাঁর কথায়ঃ

".....এবং আমি.....ভণ্ডামির ফলে নৃপতির কাছে স্থান পাই। সুলতানকে কিছু বলার সাহস আমার ছিল না.....কারণ আমি ধন ও প্রাণ-নাশের ভয়ে ভীত ছিলাম। .....এই সব কুকার্য করা ও বলার জন্য আমি দুঃখভোগ করছি ও.....জানিনা পরবর্তী জগতে আমার জন্য কি সঞ্চিত আছে।"[৭] এইসব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, বারাণী কৃতকার্যের জন্য গভীর অনুশোচনা বোধ করেন। পাপের বোঝা কমিয়ে নিজের মনকে হাল্কা করার জন্যই প্রায়শ্চিত্তের উপায়রূপে 'তারিখ' রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অধিকন্তু বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন বারাণী মনে করেছিলেন যে, যদি তাঁর গ্রন্থ সুলতানের নজরে পড়ে তবে তিনি তাঁর হারানো

৫। ঐ। পৃঃ ৩১২।
৬। তারিখ-ই ফিরুজশাহী। সৈয়দ আহমদ খান অনূদিত। বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা। পৃঃ ৫৫৭।
৭। ঐ। পৃঃ ৫৬৬।

দিন ফিরে পাবেন। তাঁর ভাষায় "……যদি এই ইতিহাস তাঁর সম্মুখে উপস্থাপিত করা যায়, আমি সকল কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করব।"৮ তিনি তাঁর ইতিহাস রচনা করে "এক ঢিলে দুই পাখি" মারতে চেয়েছিলেন—ইহকাল ও পরকাল, দুটিরই পথ কুসুমাস্তীর্ণ করার স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন।

"তারিখ-ই-ফিরূজশাহী"তে বলবন থেকে ফিরূজশাহের রাজত্বের প্রথম ছয় বছরের ইতিহাস পর্যন্ত অর্থাৎ সুলতানী আমলের মোট ৯৭ বছরের ইতিহাস এখানে বিধৃত হয়েছে। বারাণীর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি আদম ও ইভের সময় থেকে মানব সভ্যতার ইতিহাস রচনা করবেন। কিন্তু মিনহাজের গ্রন্থ "তবকৎ-ই-নাসিরিকে" উৎকৃষ্ট মনে করাতে তিনি এই সংকল্প ত্যাগ করেন। তিনি নিজে বলেছেন, "……যদি আমি সেই শ্রদ্ধেয় ও প্রসিদ্ধ লেখকের রচনা অনুকরণ করি তবে পাঠকরা আমার বই পড়ে উপকৃত হবে না। এবং যদি আমি তাঁর উক্তির বিরোধিতা করি তবে তা মিনহাজের প্রতি অসম্মান দেখান হবে। আমি অদূরদর্শী বলে নিন্দিত হব ও পাঠকের চিত্ত বিভ্রান্ত হবে।"৯ এই উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, নির্ভীক ভাবে সমালোচনা করার সৎসাহস ও মনোবলের একান্ত অভাব ছিল বারাণীর মধ্যে। তিনি মিনহাজকে ঐতিহাসিক সত্যের চরম প্রবক্তা বলে গণ্য করেছিলেন এবং মিনহাজ যে ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করেছিলেন তার সত্যাসত্য নির্ণয়ে বারাণী অগ্রসর হন নি। যে মনন, চিন্তন ও ধীর পর্যবেক্ষণ দ্বারা ঐতিহাসিক কোন নূতন তথ্যের সন্ধান পান বা নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারেন—বারাণীর মধ্যে সেই গুণগুলি ছিল না।

বারাণী রচিত ইতিহাসের গুণাগুণ বিচারে ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা আবশ্যক। তিনি বলবনের মুখ দিয়ে নিজের ধ্যান-ধারণার অনেক কথা ব্যক্ত করেছেন। মামুদ বা বুঘরা খানের প্রতি উপদেশ প্রদানের সময় বলবন ইসলামের প্রচার, শরিয়তের নিয়ম প্রবর্তন, মূর্তি ধ্বংস করা ও যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে অবিশ্বাসীদের জীবন দুঃসহ করা এবং সনাতন ধর্মকে বিরুদ্ধ দর্শনের হাত থেকে রক্ষা করাকে সুলতানের কর্তব্য বলে বর্ণনা করেন। তিনি বিচার-বিভাগে কিছুমাত্র শিথিলতা প্রদর্শন

৮। ঐ পৃঃ ১২৫।
৯। 'তারিখ'। এলিয়ট ও ডসন অনূদিত। পৃঃ ১।

করেন নি ও নিজে সর্বদা সাধারণ মানুষ থেকে দূরে থাকতেন। এই আদর্শগুলি পালন করার জন্যই বলবন মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন ও তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ দমন করেন।

কিন্তু বারাণীর মতে, বলবনের রাজত্ব দোষমুক্ত নয়। তিনি বাংলার মুসলিমদের রক্তপাত করেছিলেন ও শের খাঁনকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি হিন্দুদের বাড়তে না দিলেও সমূলে বিনাশ করতে পারেন নি। এই দুটি ত্রুটির জন্য বলবন চরম সার্থকতা লাভ করেন নি এবং শাস্তি স্বরূপ শেষ বয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ স্বকর্ণে শ্রবণ করেন। তিনি ইসলামের প্রতি নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থেকেও সবসময় অক্ষরে অক্ষরে সেগুলিকে পালন করেন নি। তাই বলবনের রাজত্ব অসম্পূর্ণ ও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুকরণযোগ্য নয়।

সুলতান কায়কোবাদের বিয়োগান্ত পরিণতির কারণ দর্শাতে বারাণীর বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। তাঁর বর্ণিত রাজধর্মের প্রত্যেকটি নীতির বিরোধী ছিলেন কায়কোবাদ। তিনি রাজকার্যে অবহেলা করে ব্যক্তিগত সুখসম্ভোগে ব্যাপৃত থাকতেন ও তার অনিবার্য ফল ফলল। কায়কোবাদের কাহিনী স্মরণ রেখে বারাণী দিল্লীর সুলতানদের উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রত্যেক শাসককে কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে, যোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চপদে নিযুক্ত করতে হবে ও কেউ কুৎসিৎ আমোদে-প্রমোদে যোগ দিতে পারবে না।

জালালুদ্দীন খিলজীর চরিত্রকে বারাণী মূলতঃ সৎ বলেই বর্ণনা করেন। তবে তাঁর চরিত্রের দুটি মহৎ দোষই তাঁর রাজত্বকালকে কলঙ্কিত করেছে। বারাণী বারবার জালালুদ্দীনের রাজত্বে নিজের বালাকালের সুখস্মৃতির কথা স্মরণ করেছেন। তিনি বহুগুণ সম্পন্ন ছিলেন। দয়া, বিনয়, মুসলিমের রক্তপাতে অনিচ্ছা, গুণীদের সমাদর প্রভৃতি গুণরাজি তাঁর চরিত্রকে এক বলিষ্ঠ মহিমা দান করেছিল।

কিন্তু দুটি কারণের জন্য তিনি শোচনীয় ভাবে মৃত্যুবরণ করলেন। প্রথমতঃ, তিনি সিদি মৌলা নামক এক সাধুকে মিথ্যা সন্দেহে হত্যা করেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি মামুদের মত হিন্দুদের নিধন যজ্ঞে অবতীর্ণ হতে পারেন নি। "খারজ" ও 'জিজিয়া' প্রদানের পরিবর্তে তাদের অবস্থান তিনি সহ্য করেছিলেন।

জালালুদ্দীনের শোচনীয় পরিণামের করুণ কাহিনীকে বারাণী সহানুভূতির সঙ্গে বিবৃত করেছেন।

আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল বারাণী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে আলাউদ্দীনের চরিত্রে সততার লেশমাত্র ছিল না। তিনি নিজে ধর্মীয় আচার সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন অথচ নূতন ধর্মের প্রবর্তক হবার দুরাশা পোষণ করতেন। তিনি মুসলিম রক্তপাতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি ও জাফর খাঁনের মত প্রভুভক্ত সুদক্ষ সৈনিককে হত্যা করে নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অনুচরদের উচ্চপদ প্রদান করেন। শরিয়তের চেয়ে জোয়াবিতকে তিনি উচ্চে স্থাপন করেন। যখন তিনি বারাণীর নির্দ্দেশমত হিন্দুদের শাস্তি দান বা অসাধু ব্যবসায়ীদের দণ্ডদান করেছেন তখনও তিনি ইসলামের কথা না ভেবে নিজের গৌরববৃদ্ধি ও প্রভুত্ব সুদৃঢ় করার কথাই চিন্তা করেছেন।

কিন্তু আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল দিল্লীর সুলতানী আমলের গৌরবময় অধ্যায়। তিনি বারংবার বিদ্রোহ দমন করেছেন, মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেছেন এবং সারা ভারতে তাঁর সৈন্যবাহিনী বিজয়-ধ্বজা বহন করেছে। তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে রাজকোষ পূর্ণ করেন ও তাঁর সময়েই এক সুসংহত শান্তির যুগ শুরু হয়। বারাণী এসবের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু এই সাফল্যলাভের পিছনে সুলতানের ব্যক্তিগত অবদান কতখানি? বারাণী অদ্ভুত এক যুক্তির অবতারণা করে বলেছেন যে, দিল্লীর উপকণ্ঠে সাধুপুরুষ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার উপস্থিতিই আলাউদ্দিনের সৌভাগ্যের মূল কারণ। কিন্তু সুলতান কোনদিনই আউলিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। এই অপরাধের মাশুল তাঁকে কড়ায় গণ্ডায় শুধতে হয়েছে। তিনি শেষ বয়সে মালিক কাফুরের ক্রীড়নকরূপে পরিণত হন, অবিরত ষড়যন্ত্রে তাঁর পারিবারিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে এবং সন্দেহজনক অবস্থার মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। বারাণী আলাউদ্দীনের রাজত্ব থেকে যে নীতি আহরণ করেছেন, তা খুব স্পষ্ট। যদি পার্থিব সাফল্য সাধু ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ধর্মের প্রতি আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে সেই সার্থকতা পদ্মপাত্রে জলবিন্দুর মত ক্ষণস্থায়ী।

ঈশ্বরের অমোঘ বিধানে অপদার্থ সুলতানের অনাচারক্লিষ্ট ও নীতি-বিগর্হিত সংক্ষিপ্ত শাসনকালের দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটে। মুবারকশাহের রাজত্বকাল তাই কায়কোবাদের শাসনকালের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

বারাণী গিয়াসউদ্দীন তুঘলককে ইসলামের রক্ষক ও আদর্শ মুসলিম সুলতানরূপে বর্ণনা করেছে। তিনি সব সময় মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সাধু কাজ করেন। তিনি 'শরিয়তের' নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তাঁর সৎকার্যের ফলে দেশে শান্তি বিরাজ করত। বারাণী গিয়াসউদ্দীনকে প্রকৃত মুসলিম শাসকরূপে চিত্রিত করায় তাঁর মৃত্যুতে ষড়যন্ত্রের কোন আভাস খুঁজে পান নি। তাঁর মৃত্যুকে এক দৈব দুর্ঘটনাই বলেই বারাণী ক্ষান্ত হয়েছেন।

বারাণীর কাছে মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকাল প্রহেলিকা মাত্র। তিনি দীর্ঘদিন মহম্মদের অনুচর ছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী ও বাদশাহের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তথাপি তাঁর রাজত্বে ঘনঘন বিদ্রোহের ফলে রাজ্যের একটি বৃহৎ অংশ—দাক্ষিণাত্য সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মহম্মদ বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ ছিলেন—বারাণীর এই অভিমত পরবর্তী ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের অনেকাংশে প্রভাবান্বিত করেছে। কিন্তু একথা উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর মতে প্রত্যেক সুলতানই দোষগুণের বাঞ্ছনীয় সমন্বয়। কিন্তু মহম্মদ নিন্দাভাজন কারণ তাঁর মধ্যে মাত্রাজ্ঞানের অভাব ছিল। শাস্তি প্রদান বা কৃপাবৃষ্টির যথাযথ স্থানকাল পাত্র নির্ণয় করা সুলতানের একটি আবশ্যিক কর্তব্য। তাঁর ভাষায়—"সুশাসন নির্ভর করে· ···শাস্তি প্রদান বা দয়া প্রদর্শনের যথোচিত পরিস্থিতি নিরূপণের পর।"[১০] কিন্তু মহম্মদ এই বিচার শক্তির অধিকারী ছিলেন না। তিনি নিজে ধর্মীয় আচারে নিয়মনিষ্ঠ হলেও সুন্নীদের প্রতি অত্যাচার করেছেন। তাঁর দাক্ষিণ্য সর্বজনবিদিত হলেও তা সর্বদা অযোগ্যের উপর বর্ষিত হয়েছে। মহম্মদ শত দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণ করলেন যে, প্রত্যেক সুলতানের কোন অবস্থায় কি করা উচিত তা জানা দরকার নতুবা তাঁর আর বিড়ম্বনার অন্ত থাকে না।

১০। কুতুবাৎ-ই-জাহাঁদারী। মাহদি হোসেন অনূদিত। প্রসিডিং অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রী কংগ্রেস। একাদশ সংখ্যা; পৃঃ ১৫৭-১৫৮।

ফিরুজ শাহের প্রথম ছয় বছরের রাজত্বকাল বারাণী ১১টি অধ্যায়ে বিবৃত করেছেন। প্রত্যেকটি নিছক প্রশংসায় পূর্ণ। এমন কি যে সকল কাজ করার জন্য তিনি অন্যান্য সুলতানদের নিন্দা করেছেন ঠিক সেই অনুরূপ কাজের জন্যই তিনি ফিরুজের প্রশস্তি গেয়েছেন। যদিও একাধিক অভিযান দিল্লীর সৈন্যবাহিনী পরাস্ত হয়েছে, যদিও আমীর-ওমরাহদের ক্ষমতা বিস্তার ও মোল্লাদের দাপটে রাজশক্তি খর্ব হয়েছে তবু বারাণীর কাছে ফিরুজই আদর্শ সম্রাট। রাজানুগ্রহ প্রার্থী বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন সাংসারিক বারাণীর কাছে দার্শনিক ঐতিহাসিক বারাণীর সম্পূর্ণ হার হয়েছে।

"ফুতুহাৎ-ই-জাহাঁদারী" "তারিখ"-এর পরিপূরক, একই মুদ্রার অপর পিঠ। গ্রন্থটির উদ্দেশ্য হল দিল্লী সুলতানের শাসনব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট দিকনির্ণয় করা। তিনি তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব অরোপ করেছেন—রাষ্ট্রীয় আইন বা জোয়াবিৎ, শাসক শ্রেণী ও রাজতন্ত্র। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে তাঁর মত হলো 'শরিয়ৎ' বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসনের জন্য যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রীয় আইন রাজার ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। কিন্তু তার জন্য মন্ত্রণা পরিষদের সাহায্য প্রয়োজন এবং মন্ত্রণা পরিষদ রাজার সঙ্গে একমত হলেই আইন প্রণয়ন করা উচিত। তবে "শরিয়ৎ"কে যতদূর সম্ভব মানা সুলতানের কর্তব্য। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বারাণীর অভিমত হল, বংশমর্যাদা ওমরাহদের নিয়োগের প্রধান বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। তৃতীয় ক্ষেত্রে রাজতন্ত্র সম্পর্কে বারাণী দুটি মত পোষণ করতেন। প্রথমতঃ, ভারতে মুসলমান শাসক যে সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হয়েছে তার পিছনে কোরাণের অনুমোদন নেই। তবে কোরাণের আশীর্ব্বাদ পুত না হলেই যে মুসলমান শাসক জাহান্নামে যাবেন তা নয়। তিনি যদি বারাণীর কয়েকটি সদুপদেশ মেনে চলেন তাহলে তাঁর পরিত্রাণের আশা আছে। দ্বিতীয়তঃ, রাজতন্ত্র সামাজিক কর্তব্যপালনের জন্য সৃষ্ট হয়েছে ও সুবিচার প্রবর্তন করাই রাজার প্রধান কর্তব্য। "তারিখে" যে সব উপদেশ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে, সেগুলি সুবিন্যস্ত করে বারাণী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র।

ইতিহাস সম্পর্কে বারাণীর নিজস্ব একটি ধারণা ছিল। ইতিহাসের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম এবং যদিও তিনি বাল্যকাল থেকেই জ্ঞান জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন তবু ইতিহাসই তাঁকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ

করত। কারণ বেকনের মত তিনিও ইতিহাসকে জ্ঞানদায়িনী বিদ্যা বলে মনে করতেন। তাঁর ভাষায় "বিভিন্ন পুস্তক পাঠ আমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে···এবং ধর্মশাস্ত্রের পর কোন কিছুই ইতিহাসের মত উপকারী বলে মনে হয় নি।"১১

বারাণী ইতিহাস পাঠের উপযোগিতাকে সাতভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমতঃ, ইতিহাস পাঠককে ধর্মগুরুদের সৎ কাজ ও বিভিন্ন সুলতানের অত্যাচারের কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। চক্ষুষ্মান ব্যক্তির কাছে ইতিহাস বিবিধ উদাহরণের ভাণ্ডার বলে মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ "হাদিসের,'১২ যমজ ভাই হল ইতিহাস। হাদিসের রচয়িতার ইতিহাসজ্ঞান না থাকলে তিনি ধর্মগুরুদের ও তাঁদের শিষ্যদের কথোপকথন জানতে পারবেন না এবং সৎ ও অসৎ শিষ্যের ভেদাভেদ বুঝতে পারবেন না। হাদিসের বাণীর সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, ইতিহাসে অপরের অভিজ্ঞতা পাঠ করে নিজের যুক্তি ও বিচার ক্ষমতা বাড়ান যায়। চতুর্থতঃ. ইতিহাসে জ্ঞান সুলতান, অভিজাত সম্প্রদায় ও উজীরদের মনে বিপদের দিনে শক্তি যোগায় কারণ তারা দেখতে পায় যে তাদের পূর্বপুরুষেরা অনুরূপ অবস্থায় কিরকম ব্যবহার করেছে ও "মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা" এই নীতি অনুসরণ করে তাঁরা আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। পঞ্চমতঃ. ধর্মগুরুদের জীবনী ও তাঁদের ভাগ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী পাঠ করার ফলে ইতিহাসনিষ্ঠ মুসলমান সুখ-দুঃখে বিচলিত হয় না। ষষ্ঠতঃ, ইতিহাস পাঠের ফলে গুণীর কথা পাঠকের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে এবং শয়তানের চরিত্র সম্বন্ধে সে সচেতন হয়। ভালো ও মন্দ, দুটি কাজেরই ফল সে ইতিহাসের মাধ্যমে জানতে পারে। সপ্তমতঃ,

১১। "তারিখ"। সৈয়দ আহমদ্ খান অনূদিত। পৃঃ ৯।

১২। হাদিস—আভিধানিক অর্থ গল্প বা ভাববিনিময়। কিন্তু বর্তমানে হজরৎ ও তাঁর শিষ্যদের বক্তৃতা ও কার্যকলাপের কাহিনীর সমার্থকরূপে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। হাদিসের দুটি অংশ : (ক) প্রথমাংশের নাম 'ইসনাদ্' বা সমর্থন—ইহাতে কাহিনীর বর্ণনা বা বিভিন্ন বক্তার বর্ণনা আছে। (খ) দ্বিতীয়াংশের নাম 'মাৎন্'—ইহাতে প্রকৃত উপদেশ বা ঘটনার বর্ণনা আছে। মুসলিম ধর্ম সাহিত্যে কোরাণের পরেই হাদিসের স্থান।

ইতিহাস হল সত্যের ভিত্তিভূমি। ভালো ও মন্দ, বিচার ও অবিচার, দোষ ও গুণের অবিরত সংগ্রামের কাহিনী হলো ইতিহাস। এই ইতিহাস থেকেই পাঠক তার জীবনের পথ খুঁজে পায়। ইতিহাস, বারাণীর কাছে, মানুষের জীবনের আলোর দিশারী।

কিন্তু এই ভালো ও মন্দের চিরন্তন দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র সমাজের উপরের তলার মানুষের জীবনে পরিস্ফুট হয়েছে। রাজা, অভিজাত ও ধর্মগুরুদের কার্যকলাপই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতজনকথার চিন্তা তাঁর মাথায় আসেনি।　　(ক্রমশঃ)

স্মৃতিকথা

রমেশচন্দ্র মজুমদার

[স্মৃতিকথার এই পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমার আকর্ষণ, সাহিত্য-চর্চা, অভিনয়, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনার প্রথম চেষ্টা এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের ভাল লাগবে এই মনে করে একটু বিস্তৃতভাবে বাল্য-কৈশোরে দেখা বাংলার গ্রাম্য সমাজ ও মানুষের কথা বলতে চেষ্টা করেছি। এই সংখ্যা থেকে আমারা কথাগুলি অমলেন্দু দের পরিবর্তে শোভন বসু লিপিবদ্ধ করছেন এবং পূর্বের মতোই আমি তা পড়ে সংশোধন করে দিচ্ছি।]

২

সাহিত্যচর্চা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপক ছিলাম। এই সাত বৎসর আমার ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের প্রধান ভিত্তি বলা চলে। ভবিষ্যৎ জীবনে আমি যা কিছু করেছি বা হয়েছি তার মূল খুঁজলে এই সাত বৎসরের জীবনেই পাওয়া যাবে। কিন্তু সে কথা বলবার আগে এর পূর্বেকার জীবনের কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। তা না হলে ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক জিনিস বুঝতে কষ্ট হবে।

আমি যখন হিন্দু হোস্টেলে ছিলাম এবং বি. এ. পড়ি তখন থেকে এক হিসেবে আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। অবশ্য এ সাহিত্য নিতান্ত ছেলেখেলার সাহিত্যই, তবুও তা একেবারে স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। এ বয়সে যেমন হয়ে থাকে, দু'চারটি কবিতা লিখতাম। হিন্দু হোস্টেলে অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ছাত্রদের মধ্যে একটি কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয় এবং তার জন্য একটি পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। আমি একটি কবিতা লিখেছিলাম এবং অপ্রত্যাশিতভাবে পুরস্কারটি আমিই পেয়েছিলাম। কি জন্য পরীক্ষকেরা পুরস্কার দিয়েছিলেন জানি না, কিন্তু অন্যান্য প্রতিযোগী ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে

খুব আন্দোলন করেছিল। কেউ কেউ বলেছিল যে, একজন পরীক্ষক ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন এবং সেজন্যই আমার প্রতি পক্ষপাত করে আমাকে পুরস্কারটি দিয়েছিলেন। এ নিয়ে অবশ্য কোন গোলমাল হয়নি। আমার দেড় বছর বয়সের সময় আমার মা মারা যান। এই কবিতাটিতে মাতৃহারা সন্তানের মনের ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলাম। কবিতাটির নামও ছিল 'মাতৃহারা'। এটি বহুকাল লোপ পেয়েছে এবং তাতে বঙ্গ সাহিত্যের কোন ক্ষতি হয়নি।

কথায় বলে লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু। আমারও হল সেই অবস্থা। এই সময় কুন্তলীন প্রভৃতি সুগন্ধি তেলের আবিষ্কর্তা একটি ছোট গল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন এবং কুন্তলীন পুরস্কার নামে ৫৲ থেকে আরম্ভ করে ২০/২৫৲ পর্যন্ত কয়েকটি পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই প্রতিযোগিতার একমাত্র সর্ত ছিল যে, গল্পের মধ্যে সুকৌশলে কুন্তলীনের গুণের ব্যাখ্যা থাকবে অথচ গল্পের রসভঙ্গ হবে না। কবিতায় পুরস্কার পাওয়ার পর আমার লোভ হল। কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য আমি একটি গল্প লিখে পাঠালাম। পুরস্কার পেলাম না, কিন্তু এর ফল একরকম ভালই হল। জীবনে আর কখনও কবিতা বা ছোট গল্প লেখার চেষ্টা করিনি।

আর একটি শিল্পকলায় এই সময়ে আমার হাতে খড়ি হয়। হিন্দু হোস্টেলে প্রতি বছর নাটক হত; তাতে আমিও দু'একবার অভিনয় করেছি। এর পরে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে কয়েকবার অভিনয় করি। এখন বললে অনেকেই হাসবেন যে, আমি যখন ইনষ্টিটিউটে এই অভিনয় করি তখন বাংলা দেশের দুজন প্রসিদ্ধ অভিনেতার—শিশির কুমার ভাদুড়ী এবং নরেশ চন্দ্র মিত্র—অভিনয়ও ঐখানেই আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষ্যে ঐ দুই জনের সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব হয়, সারা জীবনে তা কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। পরবর্তী জীবনে শিশির ভাদুড়ী যখন অভিনয়ে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তখন আমি ছুটিতে ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে তার নাটক দেখতে যাই। শিশির অভিনয় করবার সময় আমাকে দেখতে পায় এবং একটু পরেই সাজঘরে আমাকে ডেকে পাঠায়। তাকে না জানিয়ে টিকিট কিনে নাটক দেখতে এসেছি—এ জন্য সে আমাকে খুব ভৎর্সনা করে। এর পরে যখনই

কলকাতায় এসেছি, তার প্রতি অভিনয়ে যাওয়ার জন্য শিশির আমাকে কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছে। শিশির কিছুদিন সিনেমাও করেছিল। আমি তখন এম. এ. পাশ করে বেকার বসে আছি। প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা কি ছবি ওরা তোলবার চেষ্টা করছিল। পাত্র পাত্রীর পোষাক পরিচ্ছদ যুগোপযোগী হয় কিনা তা দেখবার জন্য বেশ মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অনুরোধ করল। আমিও একরকম রাজী হলাম। কিন্তু আমার বড়দাদা খুবই আপত্তি করায় আমার আর সে কাজে যোগ দেওয়া হল না। আমি ঢাকায় থাকতে শিশির কয়েকবার ঢাকায় অভিনয় করতে গিয়েছিল। সে-কথা পরে যথাস্থানে বলব। শিশির আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু নরেশ মিত্র আছে। দুজনে একত্র হলে সেই দিনের কথা মাঝে মাঝে আমরা স্মরণ করি। ইনষ্টিটিউটের এই অভিনয়ের স্মৃতি আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু কবিতা ও ছোটগল্প লেখার ন্যায় আমার অভিনয়ও এই ছাত্র জীবনের সঙ্গেই শেষ হয়।

এই সময়ে আমার জীবনে আর এক ভাবে সাহিত্যচর্চার যে সূত্রপাত হয়, উত্তর কালে তা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। আমি যে কোনদিন লেখক হব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তিনজন লোকের প্রভাবে আমার মনে সাহিত্য-চর্চার আকাঙ্খা জাগে এবং ফলে লেখবার শক্তিও কিছু অর্জন করি। এর পূর্বে স্কুলে বা কলেজে কোন প্রবন্ধ লিখতে হলে খুব সঙ্কোচ বোধ করতাম, কিছুতেই লিখতে সাহস হত না। যখন এফ. এ. ক্লাসে পড়ি কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে কুলদা প্রসাদ মল্লিক নামে একজনের সঙ্গে আমার খুব সৌহার্দ হয়। কুলদা বয়সে আমার চেয়ে পাঁচ ছয় বা তারও বেশী বড় ছিল, কিন্তু আমরা দুজনেই এফ. এ. প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। কলকাতায় আমরা বিভিন্ন কলেজে পড়তাম। ইনষ্টিটিউটেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। সে এনট্রান্স পাশ করে অনেকদিন কলেজে ভর্তি হয় নি। সে বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে চর্চা করত, ভাল বক্তৃতা দিতে পারত। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেও তার বেশ ভাল পড়াশোনা ছিল এবং আমাদের তুলনায় অনেক বেশী জ্ঞান ছিল।

সে যখন এফ. এ. পড়তে এল এবং তার সঙ্গে আমার আলাপ হল তখন বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে সে অনেক কথা বলত।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমাদের কাছে একরকম দুর্বোধ্যই ছিল। কুলদা রবীন্দ্রনাথের কবিতা খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করে আমাদের বুঝিয়ে দিত। ক্রমে ক্রমে পাঁচ ছ'জন মিলে একটা দল তৈরী করলাম। কুলদা এই দলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ব্যাখ্যা করে শোনাত। দু' একবার নৌকা করে আমরা শিবপুরের বাগানে বেড়াতে গেছি। যাতায়াতের সময় নৌকায় এবং বাগানে বসে কুলদা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করত। তার পড়ার ভঙ্গি এবং কবিতার বিশ্লেষণ আমাদের খুব মুগ্ধ করত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মাধুর্য আস্বাদ করে জীবনে অনেক আনন্দ পেয়েছি—এর জন্য কুলদাকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারি না।

তখন সবে এম. এ. পাশ করেছি, এমন সময় একদিন কুলদা এসে বলল যে. সে 'বীরভূমি' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করছে বা করবে এবং তাতে আমাকে একটি প্রবন্ধ লিখতেই হবে। আমি বললাম যে. জীবনে কোনদিন বাংলায় প্রবন্ধ লিখিনি এবং লেখার ক্ষমতাও আমার নেই। সুতরাং নিতান্ত বন্ধু হলেও তার অনুরোধ রক্ষা করতে পারব না। কিন্তু কুলদাও নাছোড়-বান্দা। নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকে লিখতে হল। প্রাচীন ভারত-বর্ষের ইতিহাস গ্রুপ নিয়ে সদ্য এম. এ. পাশ করেছি। অনেক ভেবেচিন্তে অশোক সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে ভয়ে ভয়ে এবং সঙ্কোচের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। প্রবন্ধটি ছাপা হল। ছাপার অক্ষরে এইটিই আমার প্রথম বাংলা প্রবন্ধ। এর কিছুদিন পরে একদিন কুলদা এসে উপস্থিত, তার হাতে একটি মাসিক পত্র। দেখলাম সেটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য'। এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ছিল অন্য সব কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধের সমালোচনা। এবং সম্পাদক সমাজপতির এই বলে খুব দুর্নাম ছিল যে, তিনি সহজে কাউকে রেহাই দিতেন না। কুলদা পত্রিকার একটি জায়গা আমাকে দেখাল—সেখানে 'বীরভূমি'র সমালোচনা আছে। তার মধ্যে আমার প্রবন্ধটি সম্পর্কে মন্তব্য ছিল যে, এটি সুলিখিত এবং সুপাঠ্য। কুলদা বলল যে, তুমি তো লেখা দিতে চাওনি। অথচ সমাজপতির মতো সম্পাদকও তোমার লেখার প্রশংসা করেছেন। অতএব এখন থেকে তোমায় লিখতে হবে। এইভাবে প্রথমে বীরভূমি নামে অধুনাবিস্মৃত মাসিক পত্রে আমার লেখা সুরু হয়। কয়েকটি প্রবন্ধ এই পত্রিকায় লিখেছিলাম।

এই সময়ে আমার আর এক সহপাঠী ও বন্ধু গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী

'দেবালয়' নামে একটি মাসিক পত্র বার করে। তার অনুরোধে পূর্বের ন্যায় বহু আপত্তি সত্ত্বেও আমাকে অনেকগুলি প্রবন্ধ এই পত্রিকার জন্য লিখতে হয়। প্রবন্ধ ছাড়াও এই 'দেবালয়'কে উপলক্ষ্য করে আমাকে আর এক ধরণের লেখা অভ্যাস করতে হয়, যা সারা জীবনই আমার সঙ্গী হয়ে আছে। 'দেবালয়' নামটি একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে (বর্তমানে বিধান সরণী) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পাশ দিয়ে ঠিক উত্তর দিকে একটি ছোট গলি আছে। সেই গলির একটি ছোট বাড়ীতে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান এবং গোঁড়া ব্রাহ্ম। সপ্তাহে দু'একদিন সেখানে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা ও বক্তৃতা হত। গিরিজা সেখানে নিয়মিত যেত এবং সেই সূত্রেই সে তার পত্রিকার নামকরণ করেছিল 'দেবালয়'। গিরিজার ঘনঘন ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে বন্ধুদের মধ্যে অবশ্য একটি কথা বেশ রটেছিল যে, তার নাকি শশীবাবুর মেয়েকে বিবাহ করার খুব ইচ্ছা ছিল। এটা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি না। তবে ঐ পরিবারের সঙ্গে গিরিজার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং আমাকেও সে মাঝে মাঝে সেখানে নিয়ে যেত। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে শশীবাবু রামায়ণের খুব নিন্দা করে বলেন যে, রাম 'ঘোড়ার ডিম' এবং সীতা 'ঘোড়ার ডিম'। এই কথা শুনে আমি খুব উত্তেজিত হয়ে সভা ছেড়ে চলে আসি। হিন্দু হোস্টেলে এসে বন্ধুদের একথা বললাম। বলাবাহুল্য সে বয়সে যা হয়ে থাকে, আমরা সকলেই খুব উত্তেজিত হয়ে এ সম্বন্ধে কি করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করলাম। ফলে এর দু' একদিনের মধ্যেই খবরের কাগজে (বেঙ্গলী কি অমৃত বাজার পত্রিকা ঠিক মনে পড়ছে না) তীব্র প্রতিবাদ করে আমি ইংরেজীতে একটি চিঠি লিখি। চিঠিটি ছাপা হলে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আরও অনেক চিঠি বের হতে থাকে। অনেকের কাছ থেকে আমিও চিঠি পেতে থাকি। একটি চিঠির কথা আমার মনে আছে। তাতে একজন লিখেছিলেন, "মহাত্মন্! আপনি হিন্দু ধর্মের রক্ষক।" এই শুনে বন্ধুজনেরা আমাকে উপাধি দিল—Defender of the Faith। আমি বোধ হয় পাঁচ সাতটি চিঠি উত্তরস্বরূপ লিখেছিলাম। এর পর পূজোর ছুটিতে গ্রামে চলে যাই। গ্রামে সে ইংরেজী কাগজ যেত না। সুতরাং বেশ কিছুদিন আমার আর লেখার সুযোগ বা প্রয়োজন হয়নি। ছুটির পর কলকাতায় ফিরে এসে দেখলাম যে,

চিঠির উত্তর ও প্রত্যুত্তর আগের মতই চলেছে। আমার অনুপস্থিতিতে আমার বন্ধুরাই আমার নাম দিয়ে চিঠি লিখেছে। এইরূপ বাদ-প্রতিবাদের চিঠিপত্র বেশ কিছুদিন চলেছিল। পরবর্তী জীবনে বহুবার এই রকম বাদানুবাদে যখন নামতে হয়েছে, তখনই 'ঘোড়ার ডিম' প্রসঙ্গে এই তর্কাতর্কির কথা আমার মনে পড়েছে।

গিরিজাশঙ্কর পরবর্তীকালে সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিল। কিন্তু এই বাদানুবাদের ফলে শশীবাবুর মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব ভেঙ্গে যায়। সেখানে সে আর যেতও না। এটা আমার খুব দুঃখের কারণ হয়েছিল। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও গিরিজাকে এ বিষয়ে রাজী করাতে পারিনি। গিরিজাশঙ্কর আমার আজীবন বন্ধু ছিল। সম্প্রতি তার মৃত্যু হয়েছে। এককালে সে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিল এবং চিত্তরঞ্জনের বাংলা অভিভাষণের অনেকগুলিই গিরিজার লেখা—এরূপ শুনেছি। স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে তার একটি বই আছে। তাছাড়া চৈতন্যদেব সম্পর্কে তার একটি বই বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

কুলদা ও গিরিজা ছাড়া তৃতীয় আর একজন আমার সাহিত্যচর্চার পথ প্রদর্শক। পূর্বেই বলেছি যে, আমি এম. এ. পাশ করার পরেই ঢাকায় ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপকের চাকুরী পাই। সে সময় অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার ছিলেন ঢাকা কলেজে দর্শনের অধ্যাপক। তাঁর বাড়ী ছিল আমাদের গ্রামের কাছে। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। কিছুদিন আমরা এক বাড়ীতে এক সঙ্গে 'মেসে'র মতো করে ছিলাম। সে সময়ে ঢাকাতে বেশ সাহিত্যচর্চা হত। এ বিষয়ে দুটি বেশ বড় দল ছিল। এক দলের নায়ক ছিলেন ঢাকা কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ ভদ্র। তাঁর নিজের একটি ছাপাখানা ছিল এবং তিনি একটি কাগজ বার করতেন। অন্য দলের নেতা ছিলেন অবিনাশচন্দ্র মজুমদার। তিনি 'প্রতিভা' নামে একটি মাসিক পত্র বার করতেন। ঢাকায় একটি সাহিত্য পরিষদ ছিল; তিনি তার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। অবিনাশ মজুমদার আমাকে তাঁর দলে টেনে নিলেন এবং 'প্রতিভা'তে লেখার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন। এই পত্রিকাতেও আমি অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখি। এর মধ্যে একটিতে রাখালদাস

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলার ইতিহাসে'র (প্রথম ভাগ) বিস্তৃত সমালোচনা করেছিলাম। 'প্রতিভা'র তিনটি সংখ্যায় এই সমালোচনা প্রকাশিত হয়। রাখালবাবু তখন উদীয়মান ঐতিহাসিক এবং পুরাতত্ত্বে অভিজ্ঞ। বিশেষতঃ প্রাচীন লিপির পাঠ উদ্ধার করতে তাঁর সমকক্ষ তখন এদেশে আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীতে ইতিহাস পাঠ করেন নি। এবং তিনি ছিলেন খুব আরামপ্রিয়। ধনীর সন্তান এবং ধনীর দৌহিত্র—বহু অর্থ তাঁর হাতে এসেছিল। ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে তিনি বলে যেতেন, একজন তা লিখে নিত। এইভাবে তাঁর বই লেখা হত। এই সব কারণে তাঁর বই-এ বহু ভুল ছিল। আমার এই প্রবন্ধে তাঁর বইএর অনেকগুলি ভুলের উল্লেখ করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার যে সামান্য পরিচয় ছিল সেকথা পূর্বেই বলেছি। ভয় হয়েছিল বোধ হয় তিনি আমার সমালোচনা পড়ে আমার উপর খুবই রুষ্ট হবেন। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। এক ছুটিতে আমি ঢাকা থেকে কলকাতায় এসেছি, হঠাৎ একদিন রাখালবাবু আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। আমি সসম্মানে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসালাম। তিনি বললেন আমি যে ভুল দেখিয়েছি তা সবই তিনি মেনে নিচ্ছেন। তখন তাঁর একটি বই লেখা শেষ হয়েছে; সেটি ছাপা হওয়ার পূর্বে একবার দেখে দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন। তাঁর সে অনুরোধ আমি রেখেছিলাম। ফলে তাঁর সঙ্গে যে বন্ধুত্ব হয় তা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা পরে বলতে হবে। এই পরিচয়ের কথা জানা থাকলে পরের কথাগুলি সহজে বুঝতে পারা যাবে।

অবিনাশ মজুমদার আর এক বিষয়ে আমাকে সাহিত্যচর্চায় সাহায্য করেন। সেই সময় পাবনায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন হয়। আমি এসব সম্মিলনের কোন খোঁজ খবর রাখতাম না। অবিনাশ বাবু জোর করে আমাকে পাবনায় সাহিত্য সম্মিলনে নিয়ে গেলেন, পথে ষ্টিমারে বঙ্গ সাহিত্যের অনেক রথী মহারথীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সম্মিলনেও অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ হল। এই সম্মিলনে ইতিহাস শাখার আলোচনা সভায় আমি যোগ দিয়েছিলাম। এর পর অনেকবার বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনে যোগ দিয়েছি এবং প্রবন্ধ পাঠ করেছি। এ বিষয়ে অবিনাশ-বাবুই আমার পথপ্রদর্শক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পূর্বেই এই

ভাবে কুলদা, গিরিজা এবং অবিনাশবাবুর প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমার সামান্য যোগাযোগ সুরু হয়। পরবর্তীকালে এই সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছিল। তারই সূত্রপাতের কথা এখানে বললাম।

৩

গ্রাম্য সমাজ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পূর্বের জীবনের আরও দু' চারটি কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন মনে করি। প্রথমতঃ যে গ্রামে আমি জন্মেছিলাম এবং যেখানে আমার বাল্য ও শৈশব কাল কেটেছিল, তার সঙ্গে এ পর্যন্ত বরাবরই আমার বিশেষ যোগ ছিল। কলেজে পড়বার পরেও প্রতি বছর ছুটিতে বাড়ী যেতাম। যে সামাজিক পরিবেশে আমার গ্রাম-জীবন কেটেছে, তা তখনকার প্রচলিত হিন্দু গোঁড়ামিরই পরিচায়ক। নানা বিষয়ে সামাজিক দলাদলি ছিল এবং বিবাহাদি কোন শুভ কার্যে একটা গোলমাল লেগেই থাকত। যতদূর মনে পড়ে গ্রামের মধ্যে পরস্পর রেষারেষির ভাবটা খুব বেশী ছিল। এক পরিবারের সঙ্গে আর এক পরিবারের মামলা মোকর্দমা লেগেই থাকত। তার ফলে একে অন্যের অনিষ্ট করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করত না। কবিতায় বা কল্পনায় আমরা গ্রামের যে শান্তিময় জীবনের ছবি পেয়ে মুগ্ধ হই, আমার জীবনে অন্ততঃ সেরূপ অভিজ্ঞতা তেমন নেই। আমার অভিভাবকেরা একটু তেজীয়ান মানুষ ছিলেন, কারুর কাছে বড় নতি স্বীকার করতেন না। ঝগড়া বিবাদের আশঙ্কা থাকলেও স্পষ্ট কথা বলতেন। ফলে এই হয়েছিল যে, আমার বাল্যকালে গ্রামের লোকে শত্রুতা করে তিনবার আমাদের বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। এর মধ্যে দু'বারের কথা খুব স্পষ্ট মনে আছে। আমাদের ছিল খড়ের ঘর, সব গুলিই এই আগুনে পুড়ে যায়। আমি ও মেজদাদা অভিভাবকদের নির্দেশ মত এই সময় একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ঘন্টাখানেক ধরে 'ব্রহ্মা রক্ষা করো'—এই কটি কথা আওড়াতে থাকি। শত্রুতা করে মানুষে যে আগুন দিয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। সামাজিক ব্যাপারেও দলাদলির অন্ত ছিল না। সে সময়ে অন্ততঃ গ্রাম দেশে বিলেত যাওয়া সমাজের অনুমোদন পায় নি। আমার মেজদাদা ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে

সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিলেত যান। সেজন্য গ্রামের লোকে আমাদের একঘরে করেছিল। অর্থাৎ আমাদের বাড়ীর ক্রিয়াকর্মে কেউ আসত না এবং অন্যদের ক্রিয়াকর্মেও কেউ আমাদের যেতে বলত না। কেবল আমাদের গ্রামেই নয়, অন্যান্য গ্রামের স্বজাতীয় বৈদ্যরা আমাদের এই রকম তাজ্য করে রাখে। আমার দাদা ফিরে এলে আমাদের কুলগুরুর ইচ্ছানুসারে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জ্ঞাতি গোষ্ঠী বা আত্মীয় কুটুম্বরা আমাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক বর্জন করেছিলেন। অবশ্য ধীরে ধীরে সব কিছুরই পরিবর্তন হয়। যখন অনেক বাড়ী থেকেই ছেলেরা বিলেত যেতে আরম্ভ করল, তখন আস্তে আস্তে আমরাও সমাজে উঠে গেলাম। বাংলা দেশের হিন্দু সমাজে এ এক বেশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিক্ষালাভের জন্য মেজদাদা বিদেশে যাওয়ায় আমরা একঘরে হয়েছিলাম। এর চল্লিশ বছর পরে আমি নিজে যখন সস্ত্রীক বিলেত ঘুরে এলাম, তখন এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই কেউ তোলেন নি। হিন্দু সমাজে ধীরে ধীরে কি গুরুতর পরিবর্তন আপনা আপনি ঘটে গেছে, এটি তারই একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

গ্রাম-জীবনের আরও দু' একটি কথা—যা এখনকার পরিস্থিতিতে বিশেষ করে মনে পড়ে, তা হল হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং হিন্দুর মধ্যে অস্পৃশ্য জাতির অবস্থা সম্বন্ধে। আমাদের গ্রামে চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর বৈদ্য ব্রাহ্মণ ও নীচু শ্রেণীর কায়স্থ ছিলেন, আর আশেপাশে চারিদিকেই হয় মুসলমান, নয়তো নমঃশূদ্রের গ্রাম। প্রতি গ্রামে হয় সবই মুসলমান, নয় সবই নমঃশূদ্র। কদাচিৎ দু'একটি বৈদ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থের গ্রাম দেখা যেত—সেখানে দু'চারঘর ধোপানাপিত, নমঃশূদ্রও থাকত। আমার বেশ মনে আছে যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুর সঙ্গে নিম্নবর্ণের হিন্দুর বা মুসলমানের কোন অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু জাতিভেদের কঠোরতা বজায় ছিল। আমাদের বাড়ীতে আমাদের গ্রামেরই একজন নমঃশূদ্র চাকর ছিল। তাকে উঠানে বসে খেতে হত, ঘরের বারান্দায় সে খেতে পেত না। কিন্তু এটা সে খুব স্বাভাবিক বলেই মেনে নিত; এ নিয়ে কোন দিন কোন আপত্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেনি। ঠিক এই ভাবেই মুসলমানের ছোঁয়া কোন রান্না জিনিষ খাওয়ার কথা কেউ কল্পনা করতে পারত না। সম্ভ্রান্ত কোন মুসলমান কোন হিন্দুর বাড়ী এলে তাঁকে ঘরের বারান্দায় বসতে হত; তিনি ঘরের মধ্যে

আসতে পারতেন না। অথচ আমাদের পরস্পরের মধ্যে আসা যাওয়া চলত। মুসলমানেরা আমাদের বাড়ীতে আসতেন, আমরাও তাদের বাড়ী যেতাম। একই স্কুলে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পড়ত। আমার অনেক মুসলমান সহপাঠী ছিল। তাদের বাড়ীতে বহুবার আমি গেছি। অনেক সময় সেখানে ফল কিম্বা মুড়ি খেতে হয়েছে। কিন্তু জল খেতে হলে পুকুর ঘাটে গিয়ে খেতে হত। তারা জল খেতে কখনো অনুরোধ করেনি। আমি যে ঘাটে গিয়ে জল খেতাম—এটাই তারা স্বাভাবিক মনে করত। সুতরাং একদিক থেকে জাতিভেদের কঠোরতা খুবই ছিল। কিন্তু তার জন্য ঝগড়া বিবাদ বা মনোমালিন্য ছিল না। পূজোর সময় মুসলমানেরা হিন্দুর বাড়ীতে মূর্তি দেখতে আসতেন, পূজো দেখতেন। বিজয়ার সময় আমাদের মুসলমান প্রজারা পূজোমণ্ডপ থেকে প্রতিমা নামিয়ে জলে বিসর্জন দিতেন। পরবর্তী কালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল, এর সঙ্গে তার বড় একটা মিল নেই। বাল্যকালে যেসব মুসলমানের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল, যাদের বাড়ীতে সর্বদা যাতায়াত ছিল, পাকিস্তান হওয়ার পর যে দু'চারজন হিন্দু আমাদের গ্রামে ছিল, তাদের উপর এরাই অত্যাচার করেছে শুনেছি। সেই লোকেরাই আমাদের বাড়ীঘর সব জোর করে দখল করে নিয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের এমন আমূল পরিবর্তন একই জীবনে দেখতে পেলাম।

গ্রামে আর একটি বড় অসুবিধা ছিল—যাতায়াতের কষ্ট। পাকা রাস্তা তো ছিলই না, কাঁচা রাস্তারও অস্তিত্ব বিশেষ ছিল না। কলকাতা থেকে আমাদের গ্রামে যেতে হলে প্রথমে রেলপথে খুলনা এবং খুলনা থেকে ষ্টীমার। ষ্টীমারে যেখানে নামতে হ'ত সেখান থেকে গ্রাম দশ বার মাইল দূরে। নদী থেকে গ্রাম পর্যন্ত কোন বাঁধা সড়ক নেই, কেবল মাঠ। দুই জমির মধ্যে যে আঁকাবাঁকা আল থাকে, তার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এই পথে গরুর গাড়ী যেতে পারত না। ছেলেবেলায় আমি গরুর গাড়ী দেখিনি। মেয়েরা সাধারণতঃ ডুলিতে ষ্টেশনে যাতায়াত করত। বর্ষাকালে সমস্ত অঞ্চলটিই জলে ডুবে যেত। গ্রাম মাঠ সবই জলে মগ্ন। জলের মধ্যে কেবল মাঝে মাঝে কয়েকটি বাড়ী মাথা তুলে থাকত। খুব ছেলে বেলার কথা মনে পড়ে-বাড়ীর উঠানেও বর্ষায় জল উঠত। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে হলেও সেই জল ভেঙ্গে যেতে হত। কাঠের নৌকা, তালগাছের ডোঙ্গা এবং কলা-

গাছের ভেলা ছাড়া এবাড়ী ওবাড়ী যাওয়া আসার উপায় ছিল না। কার্তিক অগ্রাণ মাসে এই জল সরে গেলে নানা রকম অসুখ করত। গ্রামে কোন ডাক্তার ছিল না, দু একজন কবিরাজ ছিলেন। চৈত্র মাসে পুকুর শুকিয়ে গেলে গ্রামে পানীয় জলের খুব কষ্ট হত। গ্রামে একটি মাইনর স্কুল ছিল, সেইখানেই আমার প্রথম বিদ্যা অভ্যাস। সেখানে পড়াশোনার যা ব্যবস্থা এবং প্রণালী ছিল, তা আমরা এখন কল্পনাও করতে পারি না। গুরু নিন্দা করা উচিৎ নয়, তাই শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। গ্রামে একটি পোষ্ট অফিস ছিল। পোষ্ট মাষ্টার মাইনে পেতেন মাসে পাঁচ টাকা। সকালে গ্রামের লোক পোষ্ট অফিসে এসে জড়ো হত, বিশেষ করে যেদিন হিতবাদী বা বঙ্গবাসী কাগজ আসার কথা। সারা গ্রামে ঐ একটিই কাগজ আসত। একজন পড়ত, বাকী সকলে শুনত।

ছেলেবেলার আর একটি কথা বেশ মনে আছে। আমার এক সহপাঠী ছিল কুলীন ব্রাহ্মণ। তার বাবা পঞ্চাশ ষাটটি বিবাহ করেছিলেন, এর মধ্যে মাত্র পাঁচ ছ'জন স্ত্রী আমাদের গ্রামে অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ীতে থাকতেন। তাঁদের গ্রামের নামেই তাঁদের ডাকা হত (যেমন অমুক গ্রামের বউ)। এঁর আর এক ভাইও ঐ রকম চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটি বিবাহ করেছিলেন।

যাতায়াতের অসুবিধার জন্য গ্রামে বাইরে থেকে জিনিসপত্র আমদানী হত না। সুতরাং বিলাসিতার উপকরণ বড় একটা ছিল না। এ কারণেই অবশ্য মাছ ও তরকারী খুব সস্তা ছিল। আশী তোলার প্রতি সের দুধের দাম ছিল দু'পয়সা। চার পাঁচ পয়সার মাছ কিনলে একটি বড় পরিবারের কুলিয়ে যেত। কিন্তু অন্য দিকে আলু, কাঁঠাল, ভাল আম প্রভৃতি যে সব জিনিষ গ্রামে হত না, তা পাওয়াই যেত না কিম্বা গেলেও দাম ছিল খুব বেশী। এর একটি ভাল ফল হয়েছিল। আমরা বার চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত খুব সাদাসিধাভাবে দিন যাপনে অভ্যস্ত ছিলাম। পরে যখন কলকাতায় পড়তে আসি তখনও স্বভাব খুব বেশী বদলায়নি।

গ্রামের ভাল মন্দ দু'দিকই আছে। কবিরা যে দৃষ্টিতে গ্রাম দেখেন বা যে কারণে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় তার সঙ্গে খুব বেশী মিল আমি দেখিনি। অথচ এই গ্রামের উপর আমাদের কি গভীর টানই না ছিল। কলকাতায় আসার পর প্রতি ছুটির দশ বার দিন

আগে থেকে দিন গুণতাম কবে ছুটি হবে এবং বাড়ী যাব। এর প্রধান কারণ অবশ্য এই যে, আমাদের আত্মীয় স্বজন বেশীর ভাগই গ্রামে থাকতেন। কলকাতায় বাসা করার রেওয়াজ তখন ছিল না। আর একটি কারণ গ্রামের সকলের মধ্যেই একটি মেলামেশার ভাব ছিল। ছোটবেলা থেকেই সকলের মধ্যে বেশ একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠত। সকল জাতির মধ্যেও এমন প্রীতির ভাব ছিল। আমাদের গ্রামে কয়েকঘর ধোপা নাপিত ছিল। তাদের বাড়ীর বয়স্কা মেয়েরা আমাদের বাড়ীর অল্প বয়সী বউ ঝির উপর বেশ কর্তৃত্বই করতেন। তাঁরা আমাদের খুব আপনার জন মনে করতেন। কলকাতায় বসবাস সুরু করলে দেশের ধোপা নাপিতরা অনেক সময় আমাদের বাড়ীতে এসে থাকত। এটা তারা তাদের অধিকার বলেই মনে করত। তাদের বাড়ীতে রাখতে আপত্তি করার কথা আমাদেরও কখন মনে হয়নি। যে নমঃশূদ্র চাকরের কথা পূর্বে বলেছি বৃদ্ধ বয়সে সে আমার মেজদাদার বাড়ীতে এসে ওঠে। কয়েক বছর সে সেখানে ছিল। তখন সে এত বুড়ো হয়ে গিয়েছিল যে, কোন কাজ করতে পারত না। ছেলেবেলায় সে আমাদের মানুষ করেছে—এই জন্য আমরা ভায়েরা কেউ আপত্তি করিনি। যদিও বাড়ীর বউ এবং ছেলেরা এতে বেশ অস্বস্তি বোধ করত।

শহর থেকে বহু দূরে পূর্ব বঙ্গের এক গণ্ডগ্রামে আমার বাল্য ও কৈশোরের কিছুকাল কেটেছে। বাল্য ও কৈশোরের সে জীবন আর কখনও ফিরে আসবে না। আমাদের পুত্র পৌত্র বা তার পরবর্তী উত্তর-পুরুষরা সে জীবনের কোন পরিচয় জানবে না ও আস্বাদ পাবে না। আমাদের স্মৃতির মধ্যেই আজ তা বেঁচে আছে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই তা লোপ পাবে। সুখে দুঃখে, ভালয় মন্দয়, দোষে গুণে সব মিলিয়ে বাংলার গ্রাম্য জীবনের নিজস্ব একটি গূঢ় ও নিবিড় মাধুর্য্য ছিল। এর পরে ভবিষ্যৎ বংশধরদের অনেকেরই এ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান কিছুই থাকবে না। সেজন্যেই গ্রামের কথা একটু বিস্তৃত করে লিখলাম। বাংলা দেশের ইতিহাসে এই গ্রামের ছবি হয়ত এক কালে খুবই মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধিপত্র

'ইতিহাস' পত্রিকার পূর্বসংখ্যায় (২য় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৪ সন) প্রকাশিত 'স্মৃতিকথা'য় অনবধানতাবশতঃ কয়েকটি ভুল থেকে গেছে। সেগুলির শুদ্ধরূপ নীচে দেওয়া হল :—

পৃষ্ঠা	২২,	পংক্তি ৩	'ত্রিপুরা স্টেটের আগরতলা রাজার' স্থলে 'আগরতলার ত্রিপুরা স্টেটের রাজার'।
	২৭	৭	'সড় বাবা'র স্থলে 'বড়দাদা'।
		১১	'চক্রবর্তীর স্থলে 'চট্টোপাধ্যায়'।
	৩২	৩	'প্রাচীন ভারত ও ইউরোপের ইতিহাস'-এর স্থলে 'প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের ইতিহাস'।

র‍্যালফ্ ফিচের চোখে বাংলাদেশ

সাড়া দত্ত

[১৫৮৩ সালের ৫ই নভেম্বর। লণ্ডন থেকে র‍্যালফ্ ফিচ্ এসে পৌঁছলেন ভারতের পশ্চিম উপকূলের দিউ শহরে। লণ্ডনে তাঁর ব্যবসা—ভারতে এসেছেন বাণিজ্যে।

উদ্দেশ্য ব্যবসা হ'লেও র‍্যালফ্ ফিচ্ শুধু ব্যবসায়ী নন। হিসেব নিকেশের নীচে একটি সদা কৌতূহলী মন নতুনকে চেনা জানা ও দেখার জন্য ব্যগ্র ছিল। সেই বুদ্ধিদীপ্ত অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় র‍্যালফ্ ফিচ্ দিয়েছেন তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে। এই কাহিনীর প্রতিটি পাতায় ষোড়শ শতাব্দীর ভারতের নানা স্থানের বিভিন্ন মানুষের জীবন যাত্রার যে জীবন্ত চিত্রটি ভেসে উঠেছে তার জন্যই Oaten ও Ryley ফিচকে "First English Traveller in India" এই আখ্যায় সম্মানিত করেছেন। ফিচের পূর্বেও কিছু কিছু ইংরেজ এদেশে এসেছেন। নতুন দেশের অজানা খবর তাঁদের লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাঁরা ভারতবর্ষকে দেখেছেন ব্যবসায়ীর চোখে—পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানীর বাইরে অন্যত্র তাঁদের দৃষ্টি যায় নি।

ফিচের এই বিবরণী ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি অমূল্য তথ্য বলে পরিগণিত। তবে এই অমূল্য তথ্যের সামগ্রিক মূল্যায়ন করা বর্তমান ইতিহাস রসিকদের পক্ষে সম্ভব হবে তখনই যখন তাঁরা দেখতে পাবেন বৃটিশ বাণিজ্যের কোন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ফিচের অভিযান, এই বাণিজ্য গড়ে তোলার পিছনে তাঁর কতখানি অবদান এবং তদানীন্তন সমাজ-জীবনে তাঁর প্রভাব কতদূর বা তাঁর স্থান কত সম্মানের।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় প্রাচ্যে ও মধ্য প্রাচ্যে বাণিজ্য করবার জন্য উন্মুখ। কিন্তু তার প্রধান অন্তরায় হল পর্তুগাল ও স্পেনের বণিক সম্প্রদায়। জলে স্থলে সর্বত্র তখন এদের দুর্ধর্ষ প্রতাপ। প্রাচ্যের লাভজনক বাণিজ্যে ওদের তখন প্রায় একচেটিয়া অধিকার। এই অধিকারে হাত বাড়াতে এগিয়ে এলেন একদল অসম সাহসী ইংরেজ বণিক। এঁদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন Earl Osborne ও Richard Staper—তুর্কীস্থানে বাণিজ্য করবার জন্য এরা রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে একটি সনদ লাভ করলেন

১৫৮১ সালে। তারই ফলে গড়ে উঠলো Turkey বা Levant Company। ১৫৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন এই কোম্পানীর প্রথম বাণিজ্য অভিযান সুরু হয় Newberyর নেতৃত্বে, তখন রাণী এলিজাবেথ ভারতবর্ষ ও চীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিশেষ একটি অনুমতি পত্র তাঁদের দিলেন। এই দলের অভিযাত্রী রূপে ইতিহাসে র‍্যালফ্ ফিচের প্রথম আবির্ভাব। ১৫৯১ সালে ইংলণ্ডে ফিরে যে ভ্রমণ বৃত্তান্তটি ফিচ্ লিখলেন সেটি এই অভিযানেরই ফল। এই নতুন Levant Co.র দ্বিতীয় সনদে সদস্য হিসাবে পুনরায় ফিচের নাম পাওয়া যায় ১৫৯২ সালে। এই সনদে বলা হয় যে, নিউবেরী, ফিচ্ এবং অন্যান্যদের প্রদর্শিত নতুন পথ অনুসারেই বাণিজ্য পরিচালিত হবে। অবশ্য পরে এই মত পরিবর্তিত হয়। যাই হোক, ১৫৯৯ সালে Levant Co. পুনরায় ফিচকে পাঠান সিরিয়ার এ্যালেপ্পো শহরে। সেখানকার ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় তাঁকে তাদের Consul হিসেবে নির্বাচিত করে। অবশ্য Levant Co. এই নির্বাচন যে কোন কারণেই হোক সমর্থন করে নি। Levant Coর এই ক্ষুদ্র ইতিহাস থেকে ফিচ্ সম্বন্ধে যেটুকু আমরা জানতে পারি তাতে অনুমান করা শক্ত নয় যে, ফিচ্ সেই সময়ের বণিক সম্প্রদায়ের কাছে কতখানি শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসন লাভ করেছিলেন।

এরপর এল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগ। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর এই কোম্পানী নতুন সনদ লাভ করে ও সেইদিনই কোম্পানীর প্রথম অধিবেশন বসে। তখন থেকেই র‍্যালফ্ ফিচ্ এই বাণিজ্যিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত। প্রথম অধিবেশনের লিখিত বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, কী কী বাণিজ্যিক দ্রব্যসম্ভার জাহাজে পাঠানো চলে সে সম্বন্ধে কোম্পানীর সদস্যবৃন্দ র‍্যালফ্ ফিচের মতামত চেয়েছেন। দ্বিতীয় বার ফিচের উল্লেখ দেখা যায় ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বরের Court minutesএ। ইংলণ্ডের রাজা জেমসের কাছ থেকে পত্র পাঠানো হবে প্রাচ্যের বিভিন্ন রাজার কাছে। তাঁদের সম্বোধন করবার উপযুক্ত সম্মানসূচক উপাধি র‍্যালফ্ ফিচের কাছ থেকে জেনে নেবার নির্দেশ এই minutes-এ দেওয়া হয়। ১৬০৭-৮ সালে ২রা ফেব্রুয়ারী থেকে ২৬ অক্টোবর—এই সময়ের মধ্যে কোম্পানীর Court minutes-এ তিনবার ফিচের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। ১৬০০ সালের আগষ্ট থেকে ১৬০৩ সালের ডিসেম্বর—এই সময়ের কোন্ Court minutes পাওয়া যায় না। নতুবা ফিচ্ সম্বন্ধে আরও অনেকে মূল্যবান তথ্য হয়তো জানা যেত। এছাড়া লণ্ডনের Leather Sellers Co.র সঙ্গেও তিনি বহুদিন জড়িত ছিলেন। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন পর্যন্ত তিনি এই কোম্পানীর Court of assistance-এ কাজ করে গেছেন। এই বৎসরেরই অক্টোবর মাসে ফিচের মৃত্যু হয়।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই যে, লেভাণ্ট কোম্পানীর মত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোড়াপত্তনের যুগেও ফিচ্ একজন অপরিহার্য ব্যক্তি ছিলেন। ১৫৮১ সাল থেকে ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ৩০ বছরের বৃটিশ বাণিজ্যের ইতিহাসে তাঁর অবদান নিঃসন্দেহে অসামান্য। যে বণিকগোষ্ঠির শক্তি ও চাতুর্যের বলে একদা প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের জয়পতাকা উড়েছিল, সেই বণিক সংস্থার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন র‍্যালফ ফিচ্।

তবে ফিচের ঐতিহাসিক গুরুত্ব শুধু ব্যবসার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। তদানীন্তন কালের সমাজ জীবনের অন্য ক্ষেত্রে তাঁর বিবরণী যে আলোড়ন জাগিয়েছিল, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় Shakespeareএর Macbeth নাটকের এই অংশটিতে—"Her Husband to Aleppo gone, master of the Tiger" (Act I Scene III)। এই ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সে যুগের বিদগ্ধ সমাজে ফিচের বিবরণী কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

শুধুমাত্র সে যুগেই নয়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে Cunnigham তাঁর Archaeological Survey Reports এ (Vol XV) সোনার গাঁও (ঢাকা) ও শ্রীপুর (পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থল, রাজবাড়ির নিকটে) সম্বন্ধে ফিচের বিবরণীর উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যায় যে, র‍্যালফ্ ফিচের পরিবারের আরও দুইজন ব্যক্তি, উইলিয়াম ফিচ্ এবং অ্যালফ্রেড ফিচ্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ইংরাজ অধিকৃত ব্রহ্মদেশে উচ্চপদস্থ কর্মচারী রূপে কাজ করে গেছেন। উইলিয়াম ফিচ্ ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজার কুঠির 'Chief' হন ও পরে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ামের Presidentরূপে নিযুক্ত হন। অ্যালফ্রেড ফিচ্ ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মদেশে 'Chief Commissioner' ও 'Agent of the Viceroy & Governor General of India'র পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সুতরাং এমন একটি ব্যক্তির লেখনী থেকে ভারতের যে বিবরণী আমরা পাই, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অসামান্য। এই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বিবরণীতে ভারতের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব স্থানেরই বর্ণনা আছে, যেমন গোয়া, দমন, দিউ, দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রী ইত্যাদি। এই দীর্ঘ তালিকার মধ্য থেকে শুধুমাত্র বাংলাদেশই এই প্রবন্ধের লক্ষ্যবস্তু। ফিচের মনোজ্ঞ বিবরণীতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের বাংলা দেশের যে-চিত্র পাওয়া যায় বর্তমান রচনাটি সেই চিত্রেরই অনুবাদ।

এই অনুবাদ প্রসঙ্গে এখানে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমত:, ফিচ

বাংলাদেশের বিবরণী দিতে গিয়ে এমন অনেক প্রথা ও আচার ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি আদৌ বাঙালী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। সম্ভবতঃ বাংলায় বসবাসকারী ভারতের অন্য অঞ্চলের লোকদের মধ্যে এইসব প্রথা প্রচলিত ছিল এবং ফিচ্ ভ্রান্তিবশতঃ তাদের বাঙালী ভেবে এইসব আচার ব্যবহার লিপিবদ্ধ করে গেছেন। দ্বিতীয়তঃ, এই বিবরণীতে তিনি প্রায়ই পর্তুগীজদের নাম উল্লেখ করেছেন। তার কারণ যে সময় ফিচ্ বাংলায় আসেন তখন বাংলা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পর্তুগীজদের বেশ আধিপত্য এবং প্রতিষ্ঠা ছিল।]

বাংলাদেশের যে জায়গায় সর্বপ্রথম এসে পৌঁছলাম তার নাম হল সপ্তগ্রাম।১ সপ্তগ্রাম বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। সমগ্র শহরটি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও নানারকম দ্রব্যাদিতে সমৃদ্ধ। ছোটবড় সবরকম বাণিজ্যিক নৌবহরই এখানে এসে নোঙর ফেলে। আমার সঙ্গেও এসেছিল ১৮০ খানা নৌকো—আফিং, লবণ, কার্পেট ও সীসা ইত্যাদিতে বোঝাই করা। এখানকার বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমানেরাই প্রধান।

স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকটি অদ্ভুত প্রথা চোখে পড়লো। একটি বিশেষ শ্রেণীর লোকদের হিন্দুরা বলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত। তাদের কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত একটা গোল সুতো ঝুলতে দেখা যায়। সেইটি হাতে নিয়ে স্নানের সময় নদীর জলে দাঁড়িয়ে এরা উপাসনা করে। একবার দু'হাতে জল নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে সুতোটাকে ঘুরিয়ে পুজো করে ও পরে একটা হাত সামনে ও আরেকটা হাত পেছনে রেখে মন্ত্রপাঠ করে। এই সমস্ত ব্রাহ্মণদের জীবহত্যা কিম্বা মাংসভক্ষণ—দুইই নিষিদ্ধ ছিল। দুধ, ভাত, মাখন ও ফল-মূলই এদের প্রধান আহার্য্য বস্তু।

শীতের প্রকোপ তেমন না থাকলেও মাঝে মাঝে গরমজলে লোকদের স্নান করতে দেখেছি। নদীতে উপাসনা করার সময় এরা কোন পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার করে না। এমন কি রন্ধন ও আহারের সময়ও দেহ অনাবৃতই থাকে।

প্রায়শ্চিত্ত* করার প্রথাটিও তাদের ভারী অদ্ভুত। যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করবে সে মাটির উপর উপুড় হয়ে কিছু সময় শুয়ে থাকে; আঙুল দিয়ে

* এখানে নাগত প্রথার উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনও এই প্রথা দেখা যায়।

মাটিতে দাগ দিয়ে সেই সময়টার হিসেব রাখে। পরে উঠে ৩০।৪০ বার চক্রাকারে ঘোরে ও সূর্যের দিকে দুহাত উঁচু করে দাঁড়ায়। তারপর মাটিতে শুয়ে পড়ে প্রণাম করে। সবসময় ডান পাটাই তারা আগে ফেলে।

ব্রাহ্মণরা কপালে, গলায় এবং কানে হলুদ রঙের এক রকম গুঁড়ো জিনিষ দিয়ে ফোঁটা দেয়। প্রতিদিন সকালে এই দ্রব্য চূর্ণ করাই তাদের একটা বিশেষ কাজ। এদের মধ্যে কিছু বৃদ্ধ লোক এই চূর্ণ নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় ও পথচারী মাত্রেরই কপালে ও গলায় এই দিয়ে ফোঁটা এঁকে দেয়। এদের স্ত্রীরাও স্নানের পর পূজা-অর্চনা করে মুখে কপালে হলুদ গুঁড়োর ফোঁটা দেয় ও শেষে কিছু চূর্ণ হাতে নিয়ে গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরে যায়।

এদেশে দশ বৎসর বয়সের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়। একজন পুরুষ একসঙ্গে সাতটি বিয়ে করতে পারে। একে অন্যকে অভিবাদন করার সময় এখানকার অধিবাসীরা দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে 'রাম রাম' উচ্চারণ করে। মনে হয় স্বভাবে এরা বোধহয় ইহুদিদের চেয়েও ধূর্ত

সপ্তগ্রামের পর এলাম গৌড়ের তন্দাতে (Tanda)। অতীতে গৌড় একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে সম্রাট আকবরের শাসনাধীনে। গঙ্গার তীর থেকে তন্দা শহর অনেক দূরে—প্রায় ১ লিগ* হবে। শোনা যায় অনেক কাল আগে গঙ্গা নদী এই শহরের পাশ দিয়েই বয়ে যেত। মাঝে কোন এক বর্ষায় গঙ্গার জল দু'কূল ছাপিয়ে কাছাকাছি বহু গ্রামাঞ্চল ডুবিয়ে দিয়ে নতুন এক গতিপথে প্রবাহিত হয়। ফলে গঙ্গার তীর থেকে তন্দা অনেক দূরে সরে যায়। সম্ভবতঃ এই কারণেই গঙ্গা থেকে এই শহর এতো দূরে অবস্থিত। এখানে তুলা ও সুতীবস্ত্রের বিরাট ব্যবসা আছে। তবে স্থানীয় ব্যক্তিদের পরিধেয় বলতে কোমরে এক টুকরো কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। এদের মধ্যে মূর্তি পূজার খুব রেওয়াজ আছে। বহু বাঘ, বুনো মোষ ও পাখী এই অঞ্চলে দেখা যায়।

তন্দার উত্তরে কুচবিহার। যেতে প্রায় ২৫ দিন লাগল। "Suckel Counse" [৩] নামে একজন হিন্দু রাজা এখানে রাজত্ব করেন। দেশটি আয়তনে বিশাল। সম্ভবতঃ কোচিন-চায়না থেকে এর দূরত্ব খুব বেশী নয়,

* ১ লিগ প্রায় সাড়েতিন মাইল।

কেননা কোচিন-চায়নার গোলমরিচ এখানকার অধিবাসীরা ব্যবহার করে। এই অঞ্চলে একটি বন্দর আছে —নাম Coachegate ॥। সমস্ত অঞ্চলটিতে প্রায় সর্বত্র বাঁশ অথবা বেতের সরু লাঠি পোঁতা আছে। এই লাঠিগুলোর ছুঁচলো দিক মাটির অনেক নীচ পর্যন্ত ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় এই অঞ্চলটি প্রায় হাঁটু পর্যন্ত জলে ডুবে যায়। ফলে মানুষ, ঘোড়া কী অন্য কোনরকম যানবাহনই চলাচল করতে পারে না। দেশে কোন যুদ্ধ আরম্ভ হলে জলে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়।

রেশম, সুতীবস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তৈরী হয়। এখানকার লোকদের চেহারায় একটা অদ্ভুত জিনিষ চোখে পড়ল। এদের কান সাধারণের তুলনায় বেশ বড়—সচরাচর এ রকম চোখে পড়েনা। শুনলাম ছেলেবেলায় কোন এক বিশেষ উপায়ে কান টেনে টেনে এরা নাকি এমনি লম্বা করে। এরা সবাই হিন্দু এবং কোন প্রাণী হত্যা করে না। উপরন্তু কুকুর, বেড়াল, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি সবরকম জীবজন্তুর জন্য এরা একটি হাসপাতাল তৈরী করেছে। যে সব জীবজন্তু বুড়ো হয়ে অথর্ব হয়ে পড়ে, না-মরা পর্যন্ত তাদের এই হাসপাতালে রাখা হয়। যদি কেউ অন্য জায়গা থেকে কোন জীবজন্তু ধরে কিংবা কিনে আনে, তাহলে সেগুলিকেও তারা এই হাসপাতালে রাখে, নয়তো ছেড়ে দেয়। আর যে ব্যক্তি নিয়ে আসে তাকে পুরস্কৃত করে। সামান্য পিপড়েকেও এরা খেতে দেয়। একজাতীয় বাদাম ফলকে এদেশে লোকে পয়সা হিসাবে ব্যবহার করে। অবশ্য মাঝে মাঝে এই ফল তাদের খেতেও দেখেছি।

কুচবিহার থেকে ফিরে এলাম হুগলীতে। হুগলী সপ্তগ্রাম থেকে এক লিগ দূরে। পর্তুগীজরা বিরাট এক ঘাঁটি করেছে এখানে। হুগলীকে তারা বলে 'পোর্টো পিকুয়েনো (Porto Piqueno)। লোক চলাচলের বড় রাস্তায় তখন চোর ডাকাতের ভীষণ উপদ্রব। সেইজন্যে কুচবিহার থেকে রওনা হবার সময় আমি সঙ্গীদের নিয়ে জঙ্গলের ভিতরের রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করলাম। পথে গৌড় পড়লো। ইতঃস্তত কয়েকটি ছোট গ্রাম ছাড়া সমস্ত জায়গাটি তখন প্রায় গভীর অরণ্যে পরিণত হয়েছে, মানুষ সমান উঁচু ঘাসে ঢাকা। হিংস্র বন্য জন্তুদের পক্ষে সেটি একটি নিরাপদ আবাসস্থল। দেখলাম বাঘ, শূকর, বুনো মোষ ও হরিণ সেখানে অবাধে বিচরণ করছে।

প্রতিদিন বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও বাজার বসে। তার নাম 'Chandean'। "Pericose" নামে বিরাট বিরাট কতকগুলি নৌকো আছে। এই নৌকোর সাহায্যেই লোকে বিভিন্ন স্থানের বাজার থেকে চাল ইত্যাদি বহু জিনিষপত্র কেনাকাটা করে এবং একস্থান থেকে অন্যত্র যাতায়াত করে। এ ধরণের বড় নৌকো চালাতে ২৪ থেকে ২৬টা দাঁড়ের প্রয়োজন হয়।

বাংলার সর্বত্রই হিন্দুরা গঙ্গাজলকে পবিত্র বলে গণ্য করে, পূজোও করে। কাছাকাছি গঙ্গা না থাকলে বহুদূর থেকেও গঙ্গাজল বয়ে নিয়ে আসে। উপযুক্ত পরিমাণে গঙ্গাজল সংগ্রহ করতে পারলে পান করে, নয়তো অল্প ছ'লে হাতে করে গায়ে ছিটিয়ে নেয়। এতে তারা নিজেদের শুদ্ধ ও পবিত্র বলে মনে করে।

হুগলী থেকে সপ্তগ্রাম ও গৌড় পেরিয়ে চট্টগ্রামে এলাম। এখানেও পর্তুগীজদের ঘাঁটি। ওদের কাছে চট্টগ্রাম 'পোর্টো গ্রাণ্ড' (Porto Grand) নামে বিখ্যাত একটি বন্দর। সেখান থেকে এসে পৌঁছলাম বাকলাতে।৫ বাকলার রাজা হিন্দু। ইনি বেশ বন্ধুভাবাপন্ন ব্যক্তি, শিকারেও তাঁর খুব আগ্রহ। রাজ্যটি আয়তনে বিশাল ও উর্বর, চাল, সূতী ও রেশম বস্ত্রের একটি বিরাট উৎপাদন কেন্দ্র গৃহগুলি বেশ বড় এবং উঁচু, রাস্তাগুলিও বেশ চওড়া। দেহের মধ্যভাগ ছাড়া অধিবাসীদের আর কোথাও কোন আবরণ নেই। অলঙ্কারের মধ্যে মেয়েরা গলায় ও হাতে রূপোর গহনা পরে। পায়ে তামা, এবং রূপোর গহনাও দেখেছিলাম।

এরপরের শহর গঙ্গার উপরে—নাম শিরিপুর। এ অঞ্চলের রাজাকে সবাই চৌধুরী বা চাঁন্দেরী বলে।৬ এরা সবাই সম্রাট আকবরের বিদ্রোহী প্রজা। স্থানটির বৈশিষ্ট্যও এই বিদ্রোহীদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কারণ, সমগ্র অঞ্চলটিতে এত বেশী নদী নালা ও দ্বীপ যে, বিদ্রোহীদের লুকোবার জায়গার অভাব হয় না। আর সম্রাটের অশ্বারোহী সৈন্যও এই সব নদীনালার মধ্যে চলতেও পারে না। সুতরাং বিদ্রোহ দমন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এখানে প্রচুর সূতীবস্ত্রও তৈরী হয়।

সেখান থেকে এলাম সোনারগাঁতে। শিরিপুর থেকে ৫ লীগ দূরে। সমস্ত দেশের মধ্যে এখানেই সবচেয়ে মিহি ও উৎকৃষ্ট সূতীর কাপড় তৈরী হয়।

এ অঞ্চলের প্রধান রাজার নাম ঈশা খাঁ।৭ ইনি বাংলার রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সকলের বিশেষ বন্ধুও বটে। এখানকার বাড়িগুলি অন্যান্য অঞ্চলের মতই আকারে ছোট, খড়ের ছাউনি দেওয়া ও চারপাশে বাঁশের বেড়া। ঘরে একটি করে দরজা। বাড়ীতে বাঘ কিংবা শেয়ালের উৎপাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা অধিকাংশই মনে হলো বেশ অবস্থাপন্ন। তারা মাংস খায় না কিংবা গোহত্যা করে না। ভাত, দুধ, ফলই এদের প্রধান খাদ্য। এ ছাড়া শুধুমাত্র দেহের সম্মুখভাগে অধিবাসীর এক টুকরো কাপড় জড়িয়ে রাখে। পরিধেয় বস্ত্র বলতে তাদের আর কিছু নেই। এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে চাল এবং সুতীবস্ত্র ভারতের সর্বত্র এবং চীন, সিংহল, পেগু, মালাক্কা ও সুমাত্রা প্রভৃতি নানাস্থানে রপ্তানী করা হয়।

পাদটীকা

১। সপ্তগ্রাম—অতীতে সপ্তগ্রাম বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। হুগলী শহরের নিকটে হুগলী নদীতে একটি ক্ষুদ্র নদীপথ বা খাঁড়ি ছিল। এই খাঁড়ির পাশেই সপ্তগ্রাম শহর অবস্থিত ছিল। কালক্রমে পলিমাটি পড়ে নদীপথটি বেঁকে যাওয়ার ফলে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যিক গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায় ও স্থানটি বিলুপ্ত হয়।

২। তন্দা (Tanda)—মালদহ জেলার অন্তর্গত কোন একটি ছোট গ্রাম। গৌড়ের পতনের পর তন্দা বাংলার রাজধানী ছিল।

৩। Suokel Counse—Suckla (সংস্কৃত শুক্ল) Kuch, সম্ভবতঃ রাজাদের উপাধি। Sir Ed. Gait তাঁর History of Assam-এ Sukla Kuch ও Sukladhvajকে একার্থক শব্দ বলে বর্ণনা করেছেন।

৪। Coochegate—কুচবিহারের উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলা রপুর্ধাঞ্চল।

৫। বাকলা—বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলা।

৬। চৌধুরী বা চাঁদেরী—চাঁদ রায় বারো ভুঁইয়াদের একজন। শ্রীপুরে তাঁর প্রধান ঘাঁটি ছিল।

৭। ঈশা খাঁ—বারো ভুঁইয়াদের একজন।

বিদ্রোহী বীর প্রতাপাদিত্য

(প্রতিবাদ)

নবপর্যায় 'ইতিহাস' পত্রিকার ১ম খণ্ডের ৪র্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিদ্রোহী বীর প্রতাপাদিত্য" সম্পর্কে কিছু বলার আছে।

লেখক স্যার যদুনাথ, মীর্জা নাথান ও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রমাণকে (প্রতাপাদিত্য সম্পর্কীয়) প্রথমেই অস্বীকার করতে পারেন নি। তারপরে লেখক ইতিহাসে উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে অকাট্য প্রমাণ নাকি 'শিলালিপি' ও 'মুদ্রা'— একথা বলতে ভোলেন নি। কিন্তু, প্রতাপ যে কালের মানুষ, সেই কালের সঠিক খবর আমরা সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে যতখানি পেতে পারি "মুদ্রা এবং শিলালিপি" থেকে কিছুতেই তা পেতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে, পাই-ও না। "বিদ্রোহী বীর (!)" প্রতাপের সঠিক পরিচয় তথা চরিত্র কিছুতেই স্থাপত্য নিদর্শন থেকে প্রকাশিত হতে পারে না (দ্রঃ—পৃঃ ৩০০)। লেখকের সুদৃঢ় ধারণা, কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির নায়ক প্রতাপাদিত্যের কল্পচিত্র নাকি "বহারি, স্তান-ই-গাইবি"-পাঠে পাওয়া যায়। অতএব আমাদের দেখতে হবে, প্রতাপাদিত্য কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির নায়ক হলেন কিরূপে।

সুদীর্ঘকাল বঙ্গদেশ বিদেশীর অধীনে ছিল। মুসলমান যুগের পূর্বে যে সেন-বংশ বঙ্গে রাজত্ব করেন তাঁরা যতই বাঙ্গালী-ভাবাপন্ন হোন না কেন প্রাথমিক পর্যায়ে অবাঙ্গালী আক্রমণকারীই ছিলেন। তারপর ত্রয়োদশ শতক থেকে অবারিত স্রোতে এদেশে মুসলমান অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ আরম্ভ হয়। পরবর্তী ইতিহাস আমাদের পারিবারিক কলহের, অসংঘবদ্ধতার এবং বিশ্বাসঘাতকতার ; তার ফলে বঙ্গ প্রথমে পাঠান ও পরে মোগলের করতলগত হল। এই সুদীর্ঘকাল বিদেশীর অধীন ও পদানত থাকায় বাঙ্গালীর অন্তরে যেন একটা অপমান ও গ্লানি বোধ জন্মায়। আর আমাদের আত্মসম্মান ফিরে পাওয়ার জন্য অপরিহার্য হল বিদেশী-রচিত আমাদের অতীত-ইতিহাসের চরিত্র মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং তা প্রমাণিত করা। তখন গৌড়াধিপ শশাঙ্কর হাতে রাজ্যবর্ধনের পরাজয় ও মৃত্যু, পাল রাজগণের দিগ্বিজয় প্রভৃতি কাহিনী বাঙ্গালীর শৌর্যের প্রমাণ-রূপে নেওয়া হল। কিন্তু মুসলমান-আমলে তেমন দৃষ্টান্ত বিরল। মোগল-পূর্ব কালে যে বিদেশী আফগান বা পাঠানরা বাঙ্গলাদেশে প্রাধান্য স্থাপন করেছিল, মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে সেইসব জাতির প্রতিরোধ-চেষ্টাকে বঙ্গের ও বাঙ্গালীর প্রতিনিধিরূপে

গণ্য করে স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলে প্রচার করা হল, এবং তথাকথিত বারো-ভুঁইয়াদের তৎপরতাকে বহুভাবে পল্লবিত করা হল, যেন মনে হয়—সেই তৎপরতা ঐ সংগ্রামেরই অঙ্গ। এই দৃষ্টিভঙ্গি তথা চেতনার কথা মনে রাখলে ঘটককারিকা বংশাবলী প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য অনুধাবন করা যাবে। এবং প্রতাপাদিত্য-সম্পর্কীয় কিংবদন্তীর উৎসও কোথায়—তা'ও হৃদয়ঙ্গম হবে।

প্রতাপের দক্ষতা এবং সামরিক ক্ষমতা যে ছিল তা অস্বীকার করি না। কিন্তু 'বিষয়-সম্পদ' সম্পর্কে (পৃঃ ৩০৩) কিছু 'পাথুরে প্রমাণ' আমাদের হাতে নেই। এর পরেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃতি দিয়ে যে মনোভাবকে প্রকাশ করতে চান—তা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি-সঞ্জাত নয়। এই ভারতচন্দ্র বা রামরাম বসু প্রতাপের বহুকাল পরের লোক। অতএব তাঁদের মন্তব্যে আস্থাশীল হওয়া কোনও রকমে উচিত নয়। যাই হোক, তথাকথিত বারো ভুঁইয়াদের বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে আগমন ও মোগলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও শৌর্যকাহিনী নানা আকারে পল্লীগীতিতে, লোকমুখে, ঘটককারিকায়, জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীতে পল্লবিত। প্রকৃত ইতিহাস কিন্তু এই কথাই বলে যে, তৎকালে বঙ্গের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা কেউই তৎপর ছিলেন না। 'স্বাধীনতা'র বোধ—ভাবিখণ্ডভাবে, কারও মধ্যে তখন আমরা প্রত্যক্ষ করি না। এঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন ভূতপূর্ব আমলা, কেউ ছিলেন ছোট বা ভূম্যধিকারী। এক কথায়, অধিকাংশই ভুঁইকোঁড় জমিদার মাত্র। মোগল-পাঠান দ্বন্দ্ব যখন চলছে, তখনই এইসব ভুঁইয়াদের তৎপরতা প্রকাশ পেয়েছে। কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হলেই এইসব ভুঁইয়াদের সাহস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেত। অধিকাংশ জমিদারই দুরধিগম্য দক্ষিণ-সমুদ্রের উপকূলে বা ব্রহ্মপুত্র—তিস্তা এবং শ্রীহট্ট-ত্রিপুরার প্রত্যন্ত প্রদেশেই যে তৎপরতা প্রকাশ করেছেন—তার মধ্যে স্বার্থসিদ্ধিই সবচেয়ে কাজ করেছে। স্বাধীনতা অর্জনের মত দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে লক্ষ্য করি না। অবশ্য এঁদের মধ্যে প্রকৃতই ক্ষমতাশালী ও বীরের দেখা মিলেছে। তদানীন্তন ভূম্যধিকারীদের মধ্যে প্রতাপের নেতৃত্ব অপরাপর ভূম্যধিকারীরা মেনে নিয়েছিলেন, এমন প্রমাণ আমাদের নেই। আবুল ফজলের গ্রন্থে অন্যান্য ভুঁইয়ার নামোল্লেখ থাকলেও প্রতাপের নেই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুল্লেখের সঙ্গত কারণ স্বরূপ মনে করেন যে "যশোর-রাজ যথেষ্ট প্রতাপশালী হয়ে উঠবার পূর্বেই আবুল ফজলের মৃত্যু হয় এবং তাঁর 'আকবরনামা' অসম্পূর্ণ অবস্থায় থেকে যায়" (পৃঃ ৩০১)। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আনুমানিক ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপের রাজ্য লাভ থেকে ১৬১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত যে সময়—তৎকালেই বঙ্গের বিভিন্নাংশে একাধিক জমিদারের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শঙ্কিত গৌড়ের সুলতান বা বাদশাহের সুবাদার বিভিন্ন সময়ে সৈন্য

পাঠান ও উভয়ের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষও হয়েছিল। এই সব ভূস্বামিকারীদের প্রাপ্ত নামের মধ্যে রয়েছে ঈশা খাঁ ও তাঁর পুত্র মুসা খাঁ, কেদার রায়, ওসমান, মাসুম খাঁ প্রভৃতির নাম। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং যুদ্ধকুশলী ছিলেন ঈশা খাঁ এবং তাঁর নেতৃত্ব প্রায় সকলেই মেনে চলতেন। আর মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হলে তাঁর রাজ্যে আশ্রয় নিতেন। শ্রীযুক্ত শৈবালকুমার গুপ্ত ঠিকই বলেছেন যে "এই নক্ষত্রগুলীর মধ্যে যে প্রতাপাদিত্য 'একচক্রস্তমো হন্তির' মত বিরাজ করতেন ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয় না—জনশ্রুতি যাই বলুক না কেন।" (দ্রঃ শারদীয়া সম্পাদ, ১৩৭৩, পৃঃ ১১৩৭)।

এই কালের ভুঁইয়ারা সম্পদ ও রাজ্যবৃদ্ধির জন্য সৈন্য রেখেছেন, কখনও দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করেছেন, প্রতিশ্রুতিও ভঙ্গ করেছেন, আবার নিজেদের মধ্যে বিবাদ করেছেন। কিন্তু কেউই একত্র হয়ে স্বাধীনতার জন্য মোগলের বিপক্ষে সমরাভিযান চালান নি। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, প্রতাপের পিতা শ্রীহরি এবং পিতৃব্য জানকীবল্লভ মোগলের বিপক্ষে দায়ুদের সঙ্কটময় কালে নিজেদের ও দায়ুদের রাজকোষের সমুদয় অর্থ ও ধনরত্ন আত্মসাৎ করেই নৌকা-যোগে সুদূর দক্ষিণের সমুদ্রোপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি পরিষ্কার করে ভূস্বামি-কারী হয়ে বসেন।

চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন যে, "বাংলাদেশে মোগল আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং তার জন্য অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ ও পরিশেষে মৃত্যুবরণ এই হল প্রতাপাদিত্যের প্রধান ঐতিহাসিক ভূমিকা" (পৃঃ ৩০৬)। ইহা সতীশচন্দ্র মিত্রের কথা ও দৃষ্টিভঙ্গিরই যে অনুরূপ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পাঠানের অধীনে বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থাই ছিল দায়ুদ বা অন্যান্য ভুঁইয়াদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। কিন্তু প্রতাপ সেদিকে সামরিক পাল্লা ভারী সেই মোগলদের পক্ষই নিয়েছিলেন। উড়িষ্যার যুদ্ধে মোগলের সঙ্গে সহযোগিতা করায় আমরা আশ্চর্য বোধ করি না। মূলতঃ, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপরিউক্ত মন্তব্যকে ঐতিহাসিক বিচারের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অভ্রান্তরূপে আমরা অভিহিত করতে পারি। প্রকৃত প্রস্তাবে, মোগলের বিরুদ্ধে প্রতাপের যে সংগ্রাম, তা আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধই। নিজে তিনি প্রথমে যুদ্ধ করেন নি বা স্বাধীনতা ঘোষণা করে আক্রান্তও হন নি। বসন্ত রায়ের (জানকীবল্লভ) হত্যার পরই কচু রায়ের অভিযোগ ক্রমে মানসিংহ প্রতাপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ওসমান, মগ, কেদার রায়, মুসা খাঁ প্রভৃতিদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে, মানসিংহ প্রথমে অবস্থাটা আয়ত্তের মধ্যে আনেন এবং পরে প্রতাপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তাতে প্রতাপের পরাজয় ঘটে এবং কচু রায়কে রাজ্যাংশ প্রত্যার্পণ করে সন্ধি করতে হয়। এখানেও লক্ষণীয়

যে, তিনি পুত্রকেই সৈন্যাধ্যক্ষ করে পাঠিয়েছিলেন। আকবরের মৃত্যুর পর কেন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগে তিনি সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করে নিজের কিছু সুবিধা করে নেবার ফিকিরে ছিলেন। কিন্তু ইসলাম খাঁর আগমনের পরই সম্ভবতঃ ভীত হন, আর সেকারণে পুত্রকে ঢাকায় পাঠান। কিন্তু বিশেষ সফলকাম না হওয়ায় নিজেই অর্থ, উপঢৌকন প্রভৃতি নিয়ে ইস্‌লাম খাঁর সঙ্গে দেখা করেন (২৬ শে এপ্রিল, ১৬০৯ খ্রীঃ) এবং ৪০০ রণতরী ও অন্যান্য সৈন্য পাঠিয়ে ভাটি-অঞ্চলের বিদ্রোহ দমনে বাদশাহী 'নাওয়ারা' ও মোগল-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করবেন বলে অঙ্গীকার করলেন। কিন্তু দেশে প্রত্যাবর্তন করে প্রতিশ্রুতি পালন করলেন না। অপরপক্ষে, যখন মুসা খাঁ ও অন্যান্য ভুঁইয়া ইসলাম খাঁর অভিযানে বশ্যতা স্বীকার করল তখনই প্রতাপ প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের জন্য অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা চেয়ে পুত্রকে (সংগ্রামাদিত্য) ৮০টি রণতরী সহ পাঠালেন। কিন্তু ইসলাম খাঁর আর মন তাতে ভিজল না। তিনি রণতরীগুলি ধ্বংস করলেন এবং তখনই আরম্ভ হয় প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযান। ইহাই হচ্ছে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য। সালিখার প্রথম যুদ্ধে নেতৃত্ব করেন প্রতাপ নয়, পুত্র—উদয়াদিত্য। ফলে শোচনীয় পরাজয়। শেষ যুদ্ধ—ধুমঘাটের অদূরে 'খাগডাঘাট'-এ। প্রণবেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে, প্রতাপ এমন একটিও যুদ্ধ মোগলের বিরুদ্ধে করেননি যাতে প্রকৃতই বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শেষ যুদ্ধে অনিবার্য পরাজয়ের মুহূর্তে ভামাল খাঁ মোগল পক্ষে যোগ দিয়েছেন। একবারও প্রতাপ অগ্রবর্তী হয়ে মোগলকে আক্রমণ করেন নি। দু'বার মাত্র আত্মরক্ষার্থে ক্ষীণ প্রতিরোধ করেছেন মাত্র, কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। পুত্র, সৈন্য এবং সেনাপতিগণ যখন যুদ্ধে রত, তিনি তখন দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান করছেন। তাঁর বিস্তৃত রাজ্য ও বিপুল রণসম্ভার (!) কিন্তু দেশরক্ষা তথা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ পথে কোন কাজেই লাগেনি। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে মৌলবী বাজারের সন্নিকটে মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে কতুল খাঁর ভাগিনেয় ওসমান খাঁ যে বীরত্ব দেখিয়েছেন, সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতাপকে 'বীর' এই আখ্যা দিতে কুণ্ঠাবোধ জাগে।

বীর্জা নাথান সঙ্গত কারণেই প্রতাপের "চরম পরিণাম" (পৃঃ ৩০৪) সম্বন্ধে নীরব। কারণ আর কিছুই নয়—বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে প্রতাপকে V. I. P. হিসাবে না দেখা। এবং V. I. P. হতে গেলে যে যোগ্যতার প্রয়োজন, সমসাময়িক সামরিক ও ব্যক্তিক ইতিহাসে প্রতাপের তার অভাব ছিল। আর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্বাচীন লেখক ভারতচন্দ্রের উক্তি একান্তই ভাবাবেগজনিত ও পূর্বে-কথিত "অক্ষতা"র পরিপোষক মাত্র। শুধু তাই-ই নয়, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৩০৫-৬

পৃষ্ঠায় প্রতাপের চিন্তার বিষয়ে বহারিস্তান-এর যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—তা ঐতিহাসিকের (মীর্জা নাথান) নিজস্ব চিন্তা মাত্র, তাকে প্রতাপের চিন্তা-ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি বলে মনে করে তিনি রাজ্য পুনরুদ্ধারের চিন্তার উপর সমধিক গুরুত্ব যে দিয়েছেন, তা অনৈতিহাসিক।

বাদল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(উত্তর)

একটী সুলিখিত, নৈর্ব্যক্তিক, তথ্য সমৃদ্ধ ও যুক্তি সম্বলিত সমালোচনা পাঠ ক'রে লাভবান হবো এই আশা ক'রে আমি বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত প্রতিবাদ পত্রটি পড়তে শুরু করেছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বাদলবাবুর সমালোচনা আমাকে সকল দিক দিয়ে এবং গভীরভাবে হতাশ করেছে।

নিছক ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং যেন তেন প্রকারেণ প্রতাপাদিত্যকে ছোট করে দেখানোর দুর্নিবার প্রবৃত্তি এই প্রতিবাদ প্রবন্ধটির মূল বিষয়বস্তু। রচনাটির এক জায়গায় ১৫৮৪ থেকে ১৬১০-১১ খৃষ্টাব্দের অন্তবর্তীকালে গৌড়ের সুলতানের উল্লেখ খুবই বিস্ময়কর। দায়ুদ করনাণী (১৫৭২-৭৫) যে বাংলার শেষ সুলতান লেখক কি সে সম্বন্ধে একেবারেই অনবহিত?

প্রতিবাদ প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য এই যে, প্রতাপাদিত্য ছিলেন একজন নগণ্য স্বার্থান্বেষী, হীনচেতা ও যুদ্ধানভিজ্ঞ ভুস্বামী মাত্র। এই বক্তব্যটি উপস্থাপিত করতে গিয়ে লেখক যে সকল মন্তব্য প্রয়োগ করেছেন আমি তার কয়েকটি উল্লেখ করছি।

লেখকের মতে—শিলালিপি ও মুদ্রা সবচেয়ে অকাট্য প্রমাণ এ কথা বলা আমার অন্যায় হয়েছে। কারণ তার মতে "সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের" কাছ থেকে সবচেয়ে সঠিক খবর পাওয়া যায়। জানিনা এই "সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ" বলতে বহারিস্তানের লেখক মীর্জা নাথান ছাড়া তিনি আর কার কথা বলতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক একজনের মধ্যে আবদুল লতিফের অভিমত আমি আমার প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করেছি (পৃষ্ঠা ৩০২)। লেখক অন্যত্র লিখেছেন প্রতাপাদিত্যের চরম পরিণাম সম্বন্ধে মীর্জা নাথানের নীরবতার একমাত্র কারণ যে তিনি প্রতাপকে "V.I.P." হিসাবে দেখতেন না। অথচ এই মীর্জা নাথান প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছেন যে, বাংলার তদানীন্তন ভুস্বামীদের মধ্যে প্রতাপ ছিলেন অগ্রগণ্য (In consideration of the high position held by the aforesaid Raja—Baharistan Vol I P.27)। History of

Bengal (Vol II) একটি প্রামাণিক গ্রন্থ বলে স্বীকৃত, এতেও (পৃঃ-২৩৭) প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে এই কথাই বলা হয়েছে।

প্রতাপের পিতা ও পিতৃব্যের বিরুদ্ধে লেখকের একটি অভিযোগ হচ্ছে যে, তাঁরা দাদুদের সঙ্কট মুহূর্তে তাঁর সমস্ত অর্থ ও ধনরত্ন আত্মসাৎ করেছিলেন। কিন্তু এই অভিযোগের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। বস্তুতঃ-পক্ষে আবুল ফজলের আকবরনামায় সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, দাদুদের পতনের পর তাঁর অধিকাংশ ধনসম্পদ মাসুদ খাঁ ওরফে "মতি" নামে তাঁর এক অনুগামীর কাছে গচ্ছিত ছিল। (Mati who had brought together some of Doud's choice treasures—Akbar Nama Vol. III, P.329-Beveridge.)। এই তথ্যটি History of Bengal এর (Vol-II). ১৯৫ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

পত্রলেখক প্রতাপাদিত্যের শৌর্যহীনতার আর একটি প্রমাণ পেয়েছেন যুদ্ধাভিযান ব্যাপারে জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্যের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার মধ্যে। এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে উপযুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার সহায়তা করবে এর মধ্যে কি কোন বৈচিত্র আছে, না তাতে পিতার নেতৃত্বগৌরব কি কোন রকমে ক্ষুণ্ণ হতে পারে? অনেকেই জানেন যে, শের শাহ যখন হুমায়ুনের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন সেই সময় তাঁর পুত্র জালাল খাঁ নানাভাবে পিতার সহায়তা করেছিলেন। এর দ্বারা শের শাহের ঐতিহাসিক ভূমিকার গৌরবহানি হয়েছে—এ ধরণের অভিমত কুত্রাপি শোনা যায় নি।

প্রতিবাদ লেখক আমাকে তিরস্কার করেছেন ভারতচন্দ্র ও রামরাম বসুর "মন্তব্যে আস্থাশীল" হওয়ার জন্য। আমি তাঁকে অনুরোধ করব তিনি যেন আমার প্রবন্ধটি পুনর্বার পাঠ করেন। কারণ আমি সেখানে সুস্পষ্টভাবে এই অভিমতই ব্যক্ত করেছি যে, প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বাঙালীর রচিত সমসাময়িক বা প্রায় সমসাময়িক কোন গ্রন্থই নেই এবং বাংলাদেশে রচিত গ্রন্থগুলি সবই অর্বাচীন (পৃঃ-৩০০)।

আকবর নামায় প্রতাপাদিত্যের নামের অনুল্লেখ সম্বন্ধে পত্রলেখক আমার অভিমতের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সঙ্গত যুক্তি উপস্থাপিত করতে পারেন নি। আমি এ প্রসঙ্গে আমার পূর্ব অভিমতেরই পুনরাবৃত্তি করছি।

প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য মূলতঃ এই—"প্রতাপের রাজ্য সীমা, শৌর্যবীর্য, তাঁর পতন ও জীবনাবসান সম্বন্ধে যে সব কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তার সবটাই সত্য নয়—ইতিহাসের মূল কাঠামোর ওপর বেশ খানিকটা রোমান্স ও কল্পনার প্রলেপ পড়ে গেছে। তথাপি বাংলা দেশে মোগল আধিপত্যের প্রতিরোধ

এবং তার জন্য জীবনোৎসর্গের কথা স্মরণ করে আমরা যদি প্রতাপকে "বিদ্রোহী বীর" বলে অভিহিত করি তা'হলে সত্যের অপলাপ হবে না।" আমার আরেকটি সুদৃঢ় ধারণা যে "যশোহর-খুলনা" গ্রন্থটি যত্নসহকারে অধ্যয়ন করলে প্রায় অনিবার্য ভাবেই উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। বর্তমান লেখকের প্রতিবাদ পত্রের মধ্যে এমন কোন যুক্তি বা তথ্যের অবতারণা করা হয় নি যার দ্বারা আমার উল্লিখিত অভিমতগুলির খণ্ডন হতে পারে।

সর্বশেষে আমার আরেকটি বক্তব্য এই যে, ইতিহাসের কোন কথাই শেষ কথা নয় এবং কোন ঐতিহাসিকই অভ্রান্ত নন। নতুন গবেষণা ও নতুন তথ্যের প্রক্ষেপে ইতিহাসের যে কোন ঘটনা, চরিত্র বা তত্ত্বের পরিবর্তন ও পরিবর্জন সম্ভব।

চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যযুগের যুদ্ধ ও ভারতীয় সমাজ

ভক্তপ্রসাদ মজুমদার

সাধারণতঃ প্রতিহিংসা ও সাম্রাজ্যলিপ্সার জন্য যুদ্ধ ঘটে থাকে। উত্তর ভারতে যে অসংখ্য যুদ্ধ মধ্যযুগে ঘটেছিল সেগুলির মূলেও এই দু'টি বিশেষ কারণ দেখা যায়। অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে পাল, গুর্জর-প্রতীহার এবং রাষ্ট্রকূট রাজাদের মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম চলতে থাকে। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ চলেছিল। বিশেষ কোন রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শবাদ বা আর্থিক কারণ বশতঃ এ সব যুদ্ধ ঘটেনি। বহু নৃপতি প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চক্রবর্তীক্ষেত্র স্থাপনের জন্যই পররাষ্ট্রে সৈন্য নিয়ে অভিযান চালিয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ রাজেন্দ্র বহু রাজ্য অতিক্রম করে বাঙ্গালা আক্রমণ করেছিলেন। গুর্জর—প্রতীহার রাজারা কনৌজ থেকে বিহারের মগধ ও হাজারীবাগ জেলায় সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। কলচুরি রাজারা—গাঙ্গেয়দেব, কর্ণ, যশঃকর্ণ বিহার ও বীরভূম জেলা পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। এরূপ আক্রমণের ফলে সাময়িকভাবে বিজয়ীর রাজকোষ স্ফীত হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু আধুনিক কালের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বিজয়ী রাজারা নিশ্চয়ই চিন্তা করেননি। দক্ষিণ ভারতের রাজেন্দ্রচোল বা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ধান, কাপড়, পাট ইত্যাদির জন্য বাঙ্গলা আক্রমণ করেননি। গহড়বাল রাজারা ইক্ষুর জন্য—যেটা সম্ভবতঃ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে উত্তর প্রদেশে উৎপন্ন হত না—বিহার আক্রমণ করেন নি। পাল রাজারা গমের জন্য উত্তর প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করেন নি।

ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘকালীন যুদ্ধের প্রভাব সুদূর প্রসারী। কোন কোন যুদ্ধের ফলে প্রসিদ্ধ নগরী বিলুপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় তৈল মান্যখেট বিধ্বস্ত করেন। সুলতান মামুদ কাশ্মীরে বৈরাট, উত্তর প্রদেশে থানেশ্বর এবং জয়পুরের নিকটবর্তী নারায়ণ ধূলিসাৎ করেন। কালক্রমে এই শহরগুলি গ্রামে পরিণত হয়েছে। কয়েকটি শিলালিপিতে উল্লিখিত হয়েছে নগরীর বিলুপ্তির ইতিহাস। কলচুরি রাজা যশঃকর্ণ উত্তর বিহারের চম্পারণ্য কি

প্রকারে ধ্বংস করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাই তাঁর পুত্রবধূ অল্হণ দেবীর ভেরাঘাট শিলালিপিতে। উক্ত রাণীর প্রশস্তিকার (১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) লিখেছেন : "চম্পারণ্যবিদারণোদ্গতযশঃ শুভ্রাংশুনা ভাসয়ন্নাশাচক্র মবক্রভাবহৃদয় : স্থাপাল চূড়ামনিঃ" ১ অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গ হুগলী জেলার অন্তর্গত আরম্বা নগরী ভস্মীভূত করেন। এ ধরনের কুখ্যাত কীর্তি ছাড়াও দু'একটি অধিক বীভৎস উল্লাসের দৃষ্টান্তও দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় যুবরাজদেবের সময়ের বিল্হরি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে যে, কলচুরিরাজ প্রথম যুবরাজদেব সামরিক কীর্তি অর্জন করেই নিশ্চেষ্ট থাকেন নি ; বিজিত রাজ্যের কামিনীকুলের প্রতিও তিনি অনাসক্ত ছিলেন না। গাহড়বাল রাজা বিজয়চন্দ্র (আনুমানিক ১১৫৫-১১৬৯ খ্রীঃ) সম্বন্ধে একটি লিপিতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি সেই হাম্বীর, যিনি ভুবনকে দলিত করেছিলেন, তাঁরই রমণীদের অশ্রুধারায় পৃথিবীর সন্তাপ দূর করেছিলেন।২

পূর্বোক্ত ধরনের শিলা বা তাম্রলিপিগুলি পড়লে আমাদের হয়তো ধারণা হ'তে পারে যে, কামিনী-কাঞ্চনের জন্যই যুদ্ধ হ'ত। দানের তালিকা এবং মন্দির নির্মাণের সংখ্যা গণনা করলে মনে হয় যেন সমাজের উপর যুদ্ধের বিশেষ কোন প্রভাব পড়েনি। এই মধ্যযুগেই নির্মিত হয়েছিল ভুবনেশ্বর, খাজুরাহো, পুরী, তাঞ্জোর, মাদুরা প্রভৃতি স্থানের বহু মন্দির। মধ্যযুগকে মন্দিরময়-যুগ বললেও অত্যুক্তি হ'বে না। ভাস্কর্য্য ও শিল্পকলা দেখলে মনে হয় আমরা ভারতবাসীরা সত্যই স্থিতপ্রজ্ঞ। যুদ্ধ, অশান্তি, বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমরা ছিলাম যোগনিষ্ঠ সাধক। মুসলমানদের আক্রমণ, সামন্তবাদের কুফল, ক্রমবর্ধমান তন্ত্রোক্ত পূজার বিকৃত রূপায়ণ ইত্যাদির মধ্যেও ধ্বনিত হয়েছে, পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের বাণী, প্রচারিত হয়েছে লোককল্যাণের ভাবনা। আপাত-বিরোধী এই ভাবধারাগুলি বিচার করলেই দেখা যাবে যে, মধ্যযুগের চিন্তাজগতে চলেছিল মানসিক দ্বন্দ্ব। বাস্তব জগৎ ও ধর্মজগতের মধ্যে সামঞ্জস্য গড়ে উঠেনি। বাস্তব জগতের প্রেরণার ফলেই যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ করে

১। E.I. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১, থেকে ১৪।

২। I.A. ১৫ খণ্ড, পৃঃ ৭ থেকে—'ভুবন-দলন-হেলা-ধর্ম্মা হাম্বীর-নারী-নয়ন জলধারা-ধৌত-ভূলোক-তাপ—"

বিজয়ী সম্রাটেরা ধনরত্ন লুণ্ঠন করে দক্ষিণ ভারতে স্থাপনা করিয়েছেন গগনচুম্বী গোপুরম্, মধ্যভারত ও উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের মন্দির গাত্রে ক্ষোদিত হয়েছে মানবজীবনের ছন্দ।

মধ্যযুগের জনগণের মধ্যে কিছু অংশ পৈতৃকভূমি ত্যাগ করে। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় একটি প্রবন্ধে কর্ণাটের বাহিরে কর্ণাটদের রাজ্যস্থাপনের বৃত্তান্ত দিয়েছেন।৩

কর্ণাটীরা অঙ্গ, বঙ্গ, পথরী (৭৬০-৮৬৫ খ্রীঃ), কনৌজ (১০৫০-১২১০ খ্রীঃ), যোধপুর এবং ধনোগ (৭০০-১২০০ খ্রীঃ), বিঠু (১২০০-১৮১৫ খ্রীঃ), বেরার (৭ম -৮ম শতাব্দী), উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। মাধাই নগরে প্রাপ্ত দানপত্রে সামন্তসেনকে কর্ণাট-ক্ষত্রিয়-কুলচূড়ামণি ৪ বলা হয়েছে। ১০৯৭ থেকে ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে কর্ণাটীরা ত্রিহুত শাসন করেছিলেন তাঁরাও ক্ষত্রিয়। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে যুদ্ধে লিপ্ত হ'বার জন্যই কর্ণাটীরা স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন। মধ্যযুগের রাজপুতদের ইতিহাস অনুসরণ করলেও যুদ্ধের অনুরূপ ফল দেখতে পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে জ্যোতিরীশ্বর বর্ণরত্নাকরের অষ্টম কল্লোলে রাজপুতদের উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় গুর্জ্জর, মেদ, চৌহান, চন্দেল্ল, গুহিলোট, পরমার প্রভৃতি রাজপুতদের নাম থাকায় অনুমান করা যেতে পারে যে রাজপুতগণ চতুর্দ্দশ শতাব্দী বা তার পূর্বেই উত্তর বিহারে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার, কুতুবুদ্দিন আইবক ও ইল্‌বারি তুর্কীদের আক্রমণাত্মক নীতির ফলে অনেক রাজপুতই তাঁদের আবাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দক্ষিণ বিহারে উজ্জয়িনীর রাজপুতদের রাজ্য স্থাপনার ইতিহাস মৌলি কবি এবং যোধরাজ বর্ণনা করেছেন। উদ্বস্তপ্রকাশে বর্ণিত হয়েছে যে, ভোজরাজ পৈতৃকরাজ্য যারা উদ্ধার না করতে পেরে ভাগ্যান্বেষণে বাহির হন। মগধের চেরু রাজা মুকুন্দের কৃপায় ১৩০৮ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাতীরে কোনস্থানে জায়গীর প্রাপ্ত হওয়ায় ভোজরাজের ভ্রাম্যমান দিনগুলির অবসান হয়। ঐ শতাব্দীতেই

৩। J N. Banerjea volume পৃঃ ২১১-২১৯।

৪। দ্রষ্টব্য অধ্যাপক এস. এইচ. হাঙ্কীর প্রবন্ধ—J. B. R. S. Vol. XLI. p. 108 f.

ভোজরাজের পুত্র দেবরাজ চেদিদের পরাজিত করে শাহাবাদে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ৫ এরপর দুইশত বৎসর এই রাজপুতেরা চেদি এবং আফগানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব ব্রিটিশ আমলেও রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। রাজপুতদের মত বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ নিজ নিজ এলাকা থেকে বাহির হন। দানপত্রগুলি পাঠ করলে জানা যায় যে বিভিন্ন দেশ থেকে এঁরা ভাগ্যের অন্বেষণে নির্গত হয়েছিলেন। যে সব দেশ থেকে এঁরা যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন সবগুলি ক্রমাগত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য অর্থনৈতিক কারণেও তাঁরা স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হন। উত্তরপ্রদেশ ও গৌড় থেকে যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা মধ্যভারতের কলচুরি, চন্দেল্ল প্রভৃতি রাষ্ট্রে বা উড়িষ্যায় গমন করেছিলেন তা'র মূলে হয়ত এই আশা তাঁদের ছিল যে, ঐ দেশগুলির আর্থিক অবস্থা উন্নততর। কলচুরি, চন্দেল্ল রাষ্ট্রে বা উড়িষ্যায় স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল। বাঙ্গলা দেশে পাল ও সেন আমলে স্বর্ণমুদ্রার নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

মধ্যযুগের ইতিহাসে ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপর যুদ্ধের প্রভাব স্পষ্ট না হ'লেও তাম্র বা শিলালিপিগুলিতে যথেষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। যুদ্ধের সময় কালো বাজার ছাড়া সদুপায়ে প্রচুর অর্থাগম হতে পারে না। সফল বাণিজ্যের জন্য চাই দেশে শান্তি, রাজনৈতিক শক্তির স্থায়িত্ব, নিষ্কণ্টক বাণিজ্যপথ। কিন্তু মধ্যযুগে এ অবস্থাগুলি প্রায় দুর্লভ বললেই চলে। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিবাদ, সামন্তশ্রেণীর রাজশক্তি অর্জ্জন করবার ইচ্ছা, বিদ্রোহ, বিজয় অভিযান ইত্যাদির জন্য প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রে অধিকাংশ সময়েই কেন্দ্রীয় শক্তি দৃঢ় থাকেনি। তা ছাড়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সময় থেকেই রোম ও কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের সঙ্গে বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। গুপ্তোত্তর যুগে সামুদ্রিক বাণিজ্য আরব বণিকদের হাতে চলে যায়। মালাবার ও কুইলনের সঙ্গে ব্যবসা কোন কোন ক্ষেত্রে বন্ধ করবার জন্য চৈনিক বাদশাহ দ্বাদশ শতাব্দীতে আদেশ দেন। সুতরাং চৌলুক্য ও বাঘেল বংশ-শাসিত গুজরাট অঞ্চল ব্যতীত উত্তর ভারতের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যে সফল হতে পারেন নি। ঐ একটি মাত্র দেশ ছাড়া উত্তরাঞ্চলের বণিকের এত বেশী অর্থাগম হয়নি যা তা'রা ধর্মকার্যে অকাতরে ব্যয় করতে পারতেন। কোন বণিকই একক

৫। রামশরণ শর্মা—Indian Feudalism, পৃঃ 248 ff. (২৪৮ ff.)

ভাবে গ্রামদান বা মন্দির নির্মাণ করতে পারেননি। বুদ্ধের আমলের মতন শ্রেষ্ঠী মধ্যযুগে পাওয়া যায়না, যাঁরা বহু অর্থ, বিরাট উদ্যান বা ভূমি দান করেছেন। গুপ্তযুগের মত বণিকও মধ্যযুগে দুর্লভ যাঁদের নিজস্ব মুদ্রা ছিল বা যাঁর প্রদেশের শাসককে শাসন কার্য্যে সাহায্য করেছেন। মধ্যযুগে সাধারণতঃ দেখা যায় যে অনেক বণিক একত্রে দান-ধর্ম আচরণ করেছেন। গোয়ালিয়রের বৈল্লভট্টস্বামিনের মন্দিরের জন্য ৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের দানের তালিকায় দেখতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক তৈলিক শ্রেণী প্রতি শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে মাত্র এক পলিকা তৈলদান করছেন, প্রত্যেক মালী শ্রেণী ঐ তিথিতে ৫০ টি মালা উৎসর্গ করছেন।[৬] অন্য একটি লিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে, পেহোয়াতে সম্মিলিত ৩৪ জন অশ্ব-ব্যবসায়ী স্থির করেন যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে ছয়টি মন্দিরের জন্য প্রত্যেকে দুই দ্রম্ম করে অর্থদান করবেন।[৭] আমরা দানপত্র ছাড়াও অন্য একটি ঘটনা থেকে বণিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করতে পারি। মধ্যযুগের অনেক বণিকই ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ না করে ভূমি ক্রয় বা ভূস্বামীরূপে পরিগণিত হবার প্রচেষ্টা করেছিলেন। দুধপনি শিলালিপি (হাজারীবাগ জেলা) থেকে জানা যায় যে তিনটি বণিক যাঁরা অযোধ্যা ও তাম্রলিপ্তি অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা করতেন, তাঁরা মগধের অধিপতি আদিসিংহের কৃপায় তিনটি গ্রামের অধিকারী হয়েছিলেন। ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বারলা লেখ থেকে জানা যায় যে তৃতীয় পৃথ্বীরাজের সময় পালহুক নাম একজন বণিক ঠক্কুর পদ-ভূষিত ছিলেন। উড়িষ্যার রাজা মধুকামার্ণবের রাজত্বকালে এরপ নায়ক নামে জনৈক বৈশ্য তিনটি গ্রাম বৈশ্য-অগ্রহাররূপে প্রাপ্ত হ'ন। এই অগ্রহারটি নিষ্কর ছিলনা। দান-গ্রহীতাকে ১৫০ মুদ্রা সম্বৎসরে ভূম্যধিকারীকে দিতে হ'ত। সুতরাং বণিকশ্রেণীর ভূস্বামীরূপে পরিগণিত হ'বার যে চারিটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অশান্তির জন্যই বণিকবৃত্তির প্রতি অশ্রদ্ধা দেখা দিয়েছিল।

যুদ্ধের জন্য সম্ভবতঃ মধ্যযুগে অস্পৃশ্যদের জীবনে পরিবর্তন কিছু এসেছিল। স্মৃতি, নিবন্ধ এবং অন্যান্য দেশী ও বিদেশী লেখকদের বর্ণনায় অস্পৃশ্যদের দুরবস্থার ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায় না। নগরের বাহিরে ছিল

৬। E. I. vol. I. P. 854 f.

৭। E. I. vol. I. No, 23 lines 1—17

তাদের নিবাস। কাহ্নুপাদের চর্য্যায় ডোম্বির বাসগৃহের অবস্থানও নগরের বাহিরে। তারা বস্ত্র বয়ন এবং আবরণকারী চাঙাড়ি বিক্রয় ৮ করত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর তিব্বতী যাত্রী ধর্মস্বামিন লিখেছেন যে ৯ যখন বর্ণগত ব্যক্তিরা অন্ন বা খাদ্য গ্রহণ করতেন তখন অন্য জাতির লোকেরা উপস্থিত হ'লে পূর্বোক্তেরা 'দূরম্ গচ্ছ' বলে নিষেধবাণী উচ্চারণ করতেন। অস্পৃশ্যদের এমনই করুণ অবস্থা ছিল যে তারা বর্ণাশ্রমধর্মীদের নিঃস্বার্থভাবেও সাহায্য করতে পারতেন না। একবার যখন ঐ তিব্বতী বৌদ্ধযাত্রী নালন্দার নিকটস্থ নদীতে প্রায় সলিল সমাধিলাভ করছিলেন তখন তিনি অস্পৃশ্যদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কোন অস্পৃশ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিল যে সে বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত হওয়ার জন্য সাহায্যদানে অপারগ।

অস্পৃশ্যদের এরূপ মর্মন্তুদ অবস্থা সত্ত্বেও যুদ্ধের সময় তাদের স্পর্ধা এবং শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম যখন কীর্ত্তিসিংহের পক্ষ অবলম্বন করে মিথিলা আক্রমণ করেন তখন ধাঙ্গড়েরা সঙ্কুচিতভাবে দূরতম প্রান্তে বসবাস করেনি। যুদ্ধের সময় ধাঙ্গড়দের ব্যবহার সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন, "আরও কত ধাঙ্গড় ঐখানে যাইতে দেখি তাহারা গোরু মারিয়া মিলিয়া মিশিয়া খাইতেছে। ধাঙ্গড়ের কটক বড়ই ব্যস্ত। তারা যে দিকে যাইতেছে সেই দিকের রাজার ঘরের তরুণীরা হাটে বিক্রয় হইতেছে। একটা শাবল কত হাতই ফিরিতেছে। ছেঁড়া কাপড় জড়াইতে জড়াইতে মাথা বাড়িয়া যাইতেছে দূর-দুর্গম স্থানে গিয়া তাহারা আগুন জ্বালে এবং স্ত্রীলোক বিবাহ করিয়া তাহারা বালককে মারিয়া ফেলে। লুঠ তাহাদের অর্জ্জন···তাহারা দরিদ্রকে দয়া করে না। প্রবলকে ভয় করেনা···শত্রুকে তাহারা ভয় করেনা, মিত্রের কাজও করেনা।"১০ ভারতবর্ষে যতদিন পর্য্যন্ত গণতন্ত্রের স্থাপনা হয়নি বা সমাজ নেতাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীতে উদারতা দেখা দেয়নি, ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধের সাহায্যেই অর্থনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

৮। "নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া এবং তাহ্নি বিকণতা ডোম্বি অবরণা চাঙেড়া" (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধ গান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ ১০ নং পৃঃ ১৯)।

৯। Biography of Dharmasvamin পৃঃ ৮৩-৮৯।

১০। বিদ্যাপতি—কীর্ত্তিলতা (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত) পৃঃ ৩৪।

...ন
১ম খণ্ড

তৃতীয় সংখ্যা
কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৭৮

ইতিহাস

সম্পাদক
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

নবপর্যায় দ্বিতীয় খণ্ড ৩য় সংখ্যা কার্ত্তিক-পৌষ

ইতিহাস

[ত্রৈমাসিক পত্রিকা]

সম্পাদক
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
শ্রীঅনলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক
অরুণকুমার দাশগুপ্ত
অমলেন্দু দে
শোভন বসু

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি
৩৩/১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা আড়াই টাকা
বার্ষিক আট টাকা

ইতিহাস কার্যালয়
কাশিমবাজার হাউস
৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
অটো প্রিন্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯, বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা-৬

ইতিহাস বর্ষ ২ সংখ্যা ৩ কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্মৃতিকথা রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৭
জিয়াউদ্দীন বারাণীর ইতিহাস দর্শন গৌতম ভদ্র	১৬৭
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় পর্তুগীজ কালিদাস দত্ত	১৭৬
উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার কুণাল সিংহ	১৮৪
শিশুমেধ বেলা দত্তগুপ্ত	১৯০
খাকসার আন্দোলনের ইতিহাস অমলেন্দু দে	২০০

নিবেদন

ইতিহাস পত্রিকার যে সব গ্রাহকের দ্বিতীয় বর্ষের চাঁদা এখনও বাকী আছে, তাঁহাদের বাকী চাঁদা সত্বর পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষের কাছে (কাশিমবাজার হাউস, ৩০২, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯) পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড | কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭৪ | ৩য় সংখ্যা

স্মৃতিকথা

রমেশচন্দ্র মজুমদার

(৪)

১৯১৪ সালের জুলাই মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসাবে আমি যোগ দিই। এখন যারা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের অবস্থা জানেন তাদের পক্ষে সেই সময়কার অবস্থা কল্পনা করাও কষ্টকর। তখন বেশীর ভাগ অধ্যাপকই বাইরে অন্য কলেজে চাকরী করতেন; সপ্তাহে দু'তিন ঘণ্টা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের ক্লাশ নিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ইতিহাস বিভাগে ছিলাম আমরা মাত্র দু'জন—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী এবং আমি। এ ছাড়া হুগলী কলেজের অধ্যাপক বিপিন বিহারী গুপ্ত, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক জে. এন. দাসগুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্তর পুত্র অজয় দত্ত (ব্যারিস্টার), এম. এন. বসু (ব্যারিস্টার) এবং আরও দু'একজন সপ্তাহে ঘণ্টা দুই করে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়াতেন। ছাত্র সংখ্যাও ছিল তখন খুব কম। দ্বারভাঙ্গা ভবনের ফটক পার হয়েই ছোট সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথম বাঁ দিকের যে ঘর সেইটিই ছিল একাধারে অফিস ও শিক্ষকদের বসবার জায়গা। মাত্র একজন বুড়ো কেরাণী ছিলেন। তিনি আমাদের মতো অল্পবয়সী শিক্ষকদের বড় একটা আমলই দিতেন না। ক্লাশে যাওয়ার আগে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম রেজিষ্টার কোথায়। তিনি টেবিলে পা তুলে চেয়ারে বসে ঘুমে ঢুলছিলেন; বললেন,

"ওহে ছোকরা, ঐ আলমারীতে দেখো আছে, খুঁজে নাও।" এই তো অফিসের অবস্থা। যে-সব প্রবীণ অধ্যাপকেরা এতদিন পড়াচ্ছিলেন তাঁরা আমার মতো ছেলেমানুষকে সহযোগীরূপে গ্রহণ করতে খুবই নারাজ। তাঁরা আমার সম্বন্ধে নানা রকম মিথ্যা প্রচার করতেন। আমি তখন ভবানীপুরে চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীটে থাকি প্রতিদিন সকালবেলায় ময়দানে বেড়াতে যেতাম। স্যার আশুতোষেরও প্রতিদিন ময়দানে বেড়ানর অভ্যাস ছিল। দু'চারজন সঙ্গীসহ তিনি ঘোড়ার গাড়ীতে এসে বিডনস্কোয়ার মোড়ে সেণ্ট পলস গীর্জার কাছে নামতেন। তারপর পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে যে পুকুর আছে সেই পর্যন্ত হেঁটে যেতেন। পথে আরও কয়েকজন সঙ্গী এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতেন। বেড়ানর দলটি এভাবে বেশ ভারী হত। একদিন আমি যখন সকালে বেড়াতে গেছি, স্যার আশুতোষের দলটিও তখন হেঁটে যাচ্ছেন। আমি তাঁদের দেখে নমস্কার করে রাস্তার একপাশে একটু সরে দাঁড়ালাম। ওঁরা কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। একটু পরেই স্যার আশুতোষ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন। সঙ্গীদের এগিয়ে যেতে বলে তিনি নিরালায় আমাকে বললেন, "তোমার চাকরী হওয়াতে বুড়োরা খুব চটেছে। আমার কাছে নালিশ করেছে যে তুমি নাকি সময়মতো ক্লাশে যাওনা, পড়াতে পারোনা ইত্যাদি। কিন্তু এ সবই মিথ্যা কথা। কারণ আমাকে তোমাদের সব খবর দেবার জন্য লোকও আছে। তবু মিথ্যা হলেও তোমাকে বললাম এই জন্য যে খুব সাবধানে এদের সঙ্গে চলবে।" এইটুকু বলেই আমার কিছু বলবার পূর্বেই হন হন করে তিনি এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর এই সামান্য কটি কথায় আমার প্রতি তাঁর মনোভাবের যে পরিচয় পেলাম, তাতে সত্য সত্যই খুব অভিভূত হয়েছিলাম এবং সে জন্যই আজও তা আমার মনে আছে। এরপর অবশ্য এরকম পরিচয় আরও অনেক পেয়েছি ; কিন্তু চাকরীতে যোগ দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই এই ব্যাপারটি ঘটে। তাতে সত্যিই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে যায়।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাশে প্রথমে আমি ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক যুগের ইতিহাস পড়াতাম। দু'এক বছর পরেই আশুতোষ আমাকে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করতে বললেন—যাতে আস্তে আস্তে ঐ

বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে ঐ বিষয়েরই ক্লাশ নিতে পারি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপনা যাতে ভালভাবে হয়, সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তখনকার দিনে এ বিষয়ে পণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এর কয়েক বছর পরে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চাকরি নিয়ে পাটনায় চলে গেলেন। তিনি ভারতের প্রাচীন ভূগোল পড়াতেন। স্যার আশুতোষ আমাকে ডেকে বললেন, "তুমি এই সামনের গ্রীষ্মের ছুটিতে এই বিষয়টি পড়ে রাখবে, যাতে পরের সেসনেই তা পড়াতে পারো। তিন চার বছরের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটি বইও তোমাকে লিখতে হবে।" যাতে এই নূতন বিষয়ে পড়াশোনায় বেশী সময় দিতে পারি সেজন্য তিনি আমার আধুনিক ভারতের ইতিহাসের ক্লাশ কমিয়ে দিলেন। এই বই লেখার জন্য দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে অনেক নোট লিখেছিলাম। সেগুলি বহুকাল আমার কাছে ছিল; কিন্তু একটি বিশেষ কারণে তা ছাপা হয়ে বই আকারে বেরয়নি।

বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী এই সময়ে এদেশে আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা করেছিলেন একদিন স্যার আশুতোষ আমাকে ডেকে বলেন যে অধ্যাপক লেভী বলেছেন যে একজন ভাল ছাত্র বা অধ্যাপককে চীনা ভাষা শেখাতে হবে, কারণ ঐ ভাষায় লিখিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেক উপকরণ আছে। তিব্বতী ভাষাও ঠিক ঐ কারণেই শেখা দরকার। সেজন্য তিনি দুজন তিব্বতী ভাষা নিযুক্ত করবেন। তাঁরা দার্জিলিংএ থাকবেন এবং তাঁর মনোনীত ব্যক্তি দার্জিলিংএ গিয়ে তাঁদের কাছে পড়াশোনা করবে। আমাকে বললেন, "তোমাকে চীন দেশে পাঠাব। যে মাইনে এখন পাও, তা পাবে। দু'বছর সেখানে থাকবে, চীনা ভাষা শিখে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপকরণ যা পাও তা সংগ্রহ করবে।" আমার কাছে এ এক অভাবনীয় সুযোগ। আনন্দের সঙ্গে আমি রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু পরে আমার বাবা এবং দাদারা ভয়ানক আপত্তি করায় আমার আর চীনে যাওয়া হয়ে উঠল না। কিন্তু স্যার আশুতোষ নিজের সঙ্কল্প ত্যাগ করেননি। আমার বদলে তিনি প্রবোধ বাগচীকে সেখানে পাঠালেন। তিব্বতী শেখার ব্যবস্থা করতেও অনেক দেরী হয়। সব ঠিক

করে তিনি আমাকে তা শিখতে বললেন। এর কিছু দিন পরেই আমি চাকরি নিয়ে ঢাকায় চলে যাই। সুতরাং তিব্বতীও আমার আর শেখা হল না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময়েই আমি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে রীতিমত ভাবে গবেষণা সুরু করি। তখন বিভিন্ন পত্রিকায় আমার লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। তাতে স্যার আশুতোষ খুব খুশী হন। মনে আছে 'Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain'-এ আমার প্রবন্ধ প্রথম ছাপা হবে তিনিই আমাকে ডেকে সে খবরটি প্রথমে দিয়েছিলেন। আশুতোষের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিষয়ে গবেষণার যে এত উন্নতি হয়েছিল, তার প্রধান কারণ আশুতোষ নিজে এ বিষয়ে সকলকে নানা রকমে খুবই উৎসাহ দিতেন। যাঁরা গবেষণা করতেন তিনি তাঁদের ক্লাশের সংখ্যা কমিয়ে দিতেন; প্রত্যেক বছর কন্‌ভোকেশনের বক্তৃতায় তিনি তাঁদের গবেষণার কথা উল্লেখ করতেন। এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দু'চারটি কথা বলছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ শেষ হলে আমি প্রায়ই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী যেতাম। তখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ছিল গঙ্গার ধারে স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর মেটকাফ হলে। একদিন স্যার আশুতোষ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে হাইকোর্ট থেকে ফেরবার পথে প্রায়ই তোমাকে ওদিকে যেতে দেখি। তুমি কোথায় যাও? আমি বললাম যে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে তো অনেক বই নেই। আমি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়তে যাই। তিনি শুনে বললেন যে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে দরকারী সব বই থাকবে না-এটা ভাল কথা নয়। যে ভাবেই হোক বই সংগ্রহ করতে হবে। একদিন খবরের কাগজে কিম্বা কোন ক্যাটালগে কোথায় যেন দেখলাম যে বিলেতে পীশেল (Pischel) এবং আরও দু'একজন প্রাচ্যবিদ্ পণ্ডিতের লাইব্রেরী বিক্রি হবে। খবরটি পড়ে তখনই আমি আশুতোষের বাড়ীতে হাজির। ওঁর নিয়ম ছিল সকালে আধ ঘণ্টার জন্য দোতলায় বৈঠকখানায় বসতেন, সেইখানেই বাইরের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতেন। তারপর তেতলায় উঠে যেতেন, বাড়ীতে সকালে আর তাঁর দেখা পাওয়া যেত না। খুব তাড়াতাড়িই গিয়েছিলাম; কিন্তু দেখলাম যে তিনি তেতলায় চলে

গেছেন। তখন একটি কাগজে লিখে পাঠালাম যে বই সংগ্রহের একটি খুব ভালো সুযোগ হঠাৎ এসেছে এবং এটি খুবই জরুরী। তিনি আমাকে তেতলায় ডেকে পাঠালেন। সব শুনে বললেন এখনই এর ব্যবস্থা করতে হয়, নইলে বিক্রি হয়ে যাবে। একটি কাগজে দু'চার লাইন কি লিখে আমাকে দিয়ে বললেন, "তুমি এ নিয়ে বেলা ন' দশটার মধ্যে ক্যাম্ব্রে কোম্পানীর (M/S. R. Cambray & Co.) দোকানে যাবে। তাদের এই কাগজটা দেখিয়ে বলবে এখনই যেন বিলেতে 'কেব্‌ল' করে দেয় পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দাম হলেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যেন এ বই অবশ্যই কেনা হয়। তারপর দুপুরে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে, শৈলেনকে সব বলে এই কাগজটি তাকে দেবে আমি যথারীতি প্রথমে ক্যাম্ব্রে কোম্পানীতে গেলাম। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে এ্যাকাউন্টটেন্ট শৈলেনবাবুকে (শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বা বসু) সব বললাম। শৈলেনবাবু বললেন, "আপনারা এভাবে এসব করেন আর জবাবদিহি করতে আমাদের প্রাণ যায়। এই যে পঁচিশ হাজার টাকার বই কেনা হল এর কোন স্যাংশন নেই কমিটি হল না, সিণ্ডিকেটে গেল না। যখন অডিটে ধরবে তখন আমাকে বলতে হবে এর কোন ভাউচারও নেই। কর্তার মুখই এর ভাউচার। এ সবই খুব বে-নিয়ম।" আমি বললাম, "আমাকে এ সব কথা বলে লাভ কি? যা বলবার স্যার আশুতোষকে বলবেন।" অবশ্য বিলক্ষণ জানতাম যে আশুতোষকে এ কথা বলবার সাহস তাঁর হবে না।

এর বহুকাল পরের কথা—আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। সেখানকার লাইব্রেরীর জন্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে বই কেনার কথা বললে উপাচার্য হার্টগ (Hartog) সাহেব এ বিষয়ে খুবই সহানুভূতি দেখান। কিন্তু যখনই এ রকম কোন বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তিনি নিয়ম মাফিক প্রথমে লাইব্রেরী কমিটি, তারপর ফিনান্স কমিটি এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে তা আলোচনা করেন। এদের সম্মতি হলে তবে বই কেনার অর্ডার দেওয়া হয়। প্রায়ই দেখা যেত যে অর্ডার পৌঁছনর আগেই সে বই বিক্রি হয়ে গেছে। কয়েকবার এ রকম হওয়ার পর আমি তাঁকে উপরের ঘটনাটি বললাম। আশুতোষ যেভাবে বইয়ের সন্ধান পাওয়ামাত্রই তৎক্ষণাৎ তা কেনার ব্যবস্থা করতেন, তাঁকেও তাই করতে অনুরোধ করলাম।

তিনি বললেন, "ভারতবর্ষে এক আশুতোষ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ভাইস্ চ্যান্সেলার নেই যিনি নিজের ইচ্ছামতো এ ভাবে পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করতে পারেন। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।"

স্যার আশুতোষ সম্পর্কে আরও কয়েকটি ব্যক্তিগত কথা বলি। একদিন তিনি আমাকে বললেন যে তুমি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হয়ে যাও। কারণ সেখানে পড়াশোনা এবং গবেষণা করার অনেক সুযোগ পাবে। উনি তখন এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি অথবা কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। সদস্য হওয়ার কিছুদিন পরেই আবার আমাকে বললেন, "তোমাকে কাউন্সিলের মেম্বার করব ঠিক করেছি।" আমি বললাম, "কাউন্সিলের মিটিং ছয় রাত নটার পর। মিটিং সেরে ফিরতে অনেক রাত্রি হবে, সে সময় ট্রাম বাস পাওয়া যাবে না। কাজেই আমার পক্ষে কাউন্সিলের সদস্য হওয়া সম্ভব হবে না।" তিনি বললেন, "তুমি মিটিংএর দিন আমার সঙ্গে আমার গাড়ীতে যাবে। ফেরার পথে তোমাদের বাড়ীর সামনে রাস্তার মোড়ে তোমাকে নামিয়ে দেব।" প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে স্যার আশুতোষ তখন বাংলা দেশের শীর্ষস্থানে। অনেকেই এবং খবরের কাগজওয়ালারাও তাঁকে বলত 'বাংলার বাঘ'—এমনই রাশভারী পুরুষ ছিলেন তিনি। আমার ন্যায় ছেলেমানুষ শিক্ষকের প্রতি তাঁর এই অযাচিত অনুগ্রহের কথা জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। এরকম আরও দৃষ্টান্ত আছে। তার একটি বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করি।

একদিন দ্বারভাঙ্গা ভবনের বড় সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি, স্যার আশুতোষ তখন নীচে নেমে আসছেন। আমাকে দেখেই বললেন, "তোমার চেহারা এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন?" আমি বললাম যে কদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে শরীরটা খুবই দুর্বল। উনি জিজ্ঞাসা করলেন কতদিন অসুখ করেছিল, কবে জ্বর ছেড়েছে। সব শুনে বললেন, "আরও দশ দিন এ মুখো হবে না। বাড়ীতে বসে বিশ্রাম করো। যারা কাজকর্ম করে তাদের খুব সাবধানে আমি রাখি।" আমি বললাম, "কদিন ছুটি নিয়েছি; আর বোধহয় বেশী ছুটি পাওনা নেই।" তিনি বললেন, "তোমার ছুটির দরকার হবে না। আমার নাম করে জ্ঞানকে বলবে যে আমি দশদিন তোমাকে আসতে বারণ করেছি।" জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান ঘোষ—তখনকার রেজিষ্ট্রার। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললাম। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, বাড়ী চলে যাও।" জিজ্ঞাসা করলাম—

ছুটি নিয়ে পরে তো কোন গোলমাল হবে না ? তিনি বললেন, "কর্তার কথার ওপরে আর কোন কথা নেই। কিছু ভাবনা নেই। তুমি বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করো।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যারা সামান্য কিছুও গবেষণা করতেন, তাঁরা এ ভাবে স্যার আশুতোষের কাছ থেকে কত সাহায্য, স্নেহ ও সহানুভূতি পেয়েছেন তা বলে শেষ করা যায় না। আমার মনে হয় তখন যে গবেষণার প্রতি আমাদের এমন গভীর অনুরাগ ছিল তার একটি প্রধান কারণ আশুতোষের এমন অযাচিত এবং অকৃপণ স্নেহ, সহানুভূতি এবং উৎসাহ—যে জিনিসটি আজকাল একেবারে লোপ পেয়ে গেছে।

(৫)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময়ে আমি অনেকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখি। বিভিন্ন পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল একটি এধরনের প্রবন্ধ লিখে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রিফিথ পুরস্কার পেয়েছিলাম। সেই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু কতকটা পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে পি. এইচ. ডি ডিগ্রির থিসিস হিসেবে দাখিল করি এবং ঐ ডিগ্রি লাভ করি আমার পরীক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন অধ্যাপক কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল। তাঁর সঙ্গে ক্রমে খুব বেশী আলাপ হয় এবং এই আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার যোগ দেবার কিছুদিন পরে দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগে কারমাইকেল অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট) ছিলেন। সে চাকুরী ছেড়ে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। আসার পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে আরও সুষ্ঠু এবং বিস্তৃতভাবে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার ব্যবস্থা হয় সে সম্পর্কে তিনি যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। নিজের বিষয়ে তিনি ছিলেন খ্যাতিমান পণ্ডিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দুই বছর যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলি বইয়ের আকারে দুইখণ্ডে ছাপা হয়েছে এবং এগুলি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে তাঁর মতামত এবং কার্যক্রম অনেকের পছন্দ

হত না। স্যার আশুতোষকে খুসী করার জন্য এমন অনেক কাজ তিনি করতেন যা একজন অধ্যাপকের পক্ষে বেশ বে-মানান। তিনি স্থির করলেন যে আশুতোষের জন্মদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি নিয়ে তাঁর বাড়ী যাবে। মারাঠা দেশে নাকি এ-রকম নিয়ম আছে। অবশ্য এ রকম একটা প্রস্তাব হলে সহজে কেউ তার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। সুতরাং কয়েক বছর এ ভাবে জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানটি হ'তে থাকে।

এই সময়ে ব্যক্তিগতভাবে ভাণ্ডারকরকে আক্রমণ করে Modern Review এবং প্রবাসীতে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা হয়। তার মধ্যে দু'একটির কথা মনে আছে। একটিতে ছিল : পূর্বে বর্গীরা বাংলাদেশ থেকে চৌথ আদায় করত। এই নূতন বর্গী চৌথের বদলে ঘাসদানা আদায় করছেন। 'কাশিমের মার্কা' নামে একটি প্রবন্ধ তখন খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধটি লেখা হয় তার কথা বলছি। কলকাতা যাদুঘরে নিওলিথ বা নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের অনেক জিনিস আছে। একদিন পঞ্চাননবাবু নামে একজন নৃতত্ত্ববিদ্যার শিক্ষক হঠাৎ ভাণ্ডারকরকে বলেন যে এ রকম একটি জিনিসের পিছনে কি সব লেখা আছে। ভাণ্ডারকর এই কথা শুনে লেখাটি নিজে পড়লেন এবং পড়ে বললেন যে এটি ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা একটি লিপি। নব্যপ্রস্তর যুগে ব্রাহ্মী লিপির অস্তিত্বের সন্ধান সত্যই একটি বড় আবিষ্কার। সুতরাং ভাণ্ডারকর সাড়ম্বরে এই আবিষ্কারের কথা প্রচার করলেন। মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীর পরের সংখ্যাতেই এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। তাতে লেখা হল যে যাদুঘরে একজন মুসলমান বেয়ারা ছিল, তার নাম কাশিম। তার অভ্যাস ছিল এই সব পাথরের জিনিসের গায়ে ইংরেজীতে তারিখ লেখা। ভাণ্ডারকর এইরকম একটি ইংরেজী তারিখকে উল্টো করে ধরে ব্রাহ্মীলিপি মনে করেছেন। এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে ছবি বেরয় তাতে দেখা যায় যে সোজা দিকে ধরলে সেটা অধোরেখ যুক্ত পরিষ্কার একটি ইংরেজী তারিখ। এ প্রবন্ধ যে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কিম্বা তাঁর ইঙ্গিতেই লেখা হয়েছে সে বিষয়ে কারুর কোন সন্দেহ ছিল না। কেননা রাখালবাবু অনেকদিন যাদুঘরে কাজ করেছেন এবং কাশিমের এই খবর তিনি ছাড়া আর কারুর জানা সম্ভব নয়। রাখালবাবুর একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন সুরেন কুমার।

তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর রিডিং রুমের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ-এর প্রবন্ধ সুরেন কুমারের নামেই বের হত। রাখালবাবু নিজে সরকারী প্রত্নতত্ব বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) ছিলেন। তিনি ভাণ্ডারকর এবং ডি বি স্পুণার প্রভৃতি ঐ বিভাগের অন্য কর্মচারীদের প্রতি খুব বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করতেন। প্রত্নতত্ব বিভাগ সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ মডার্ন রিভিউ-এ তিনি সুরেন কুমারের নামে লিখেছেন। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ-এর সম্পাদক রামানন্দবাবুর সঙ্গে রাখালবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। রাখালবাবুর পক্ষে সেজন্য যে-কোন প্রবন্ধ এই পত্রিকায় ছাপান সহজ ছিল।

আমি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগ দিই প্রায় সেই সময়ে পূর্বোক্ত স্পুণার নামে সরকারী প্রত্নতত্ব বিভাগের এক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে আলোচনা করে প্রতিপন্ন করেন যে সেটি সম্পূর্ণ পারস্য দেশীয় প্রভাবের পরিচয় দেয় এবং মৌর্য সভ্যতাও পারস্য দেশ থেকে ভারতে এসেছে। এ নিয়ে পণ্ডিত মহলে তখন একটা তুমুল আলোড়ন হয়। এর প্রতিবাদ করে মডার্ন রিভিউ-এ একটি বড় প্রবন্ধ বেরয়। প্রবন্ধের নীচে লেখকের নাম ছিল Nimrod—এটি সুরেন কুমারের ছদ্মনাম। কিন্তু এই প্রবন্ধের প্রকৃত লেখক ছিলেন রাখালবাবু। তিনি প্রত্নতত্ব বিভাগে কাজ করতেন। সুতরাং নিজের নামে ঐ বিভাগের বিপক্ষে কিছু লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেজন্য তিনি বেনামীতে প্রবন্ধটি ছাপিয়েছিলেন। প্রবন্ধটি পড়েই আমরা অনেকে তা অনুমান করেছিলাম। পরে রাখালবাবু নিজেও তা স্বীকার করেন। তিনি বলেছিলেন যে এই সব খবর জেনেই প্রত্নতত্ব বিভাগের বড় কর্তারা তাঁর ওপর বিরূপ হন এবং তাঁকে যে পরে অপদস্থ হয়ে সরকারী চাকরী ছেড়ে চলে আসতে হয় এটাই নাকি তার প্রধান কারণ। কিন্তু একথা কতদূর সত্য তা বলতে পারি না। কারণ এই প্রবন্ধ লেখার পরেও অনেক বছর রাখালবাবু প্রত্নতত্ব বিভাগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে কাজ করেছেন এবং যে অভিযোগে তাঁর পদচ্যুতি ঘটে তা খুবই গুরুতর এবং সেটি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে মডার্ন রিভিউ এবং প্রবাসীতে পরে নানারকম লেখা বেরতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এর উত্তর দেওয়ার

ব্যবস্থা হয়। আমাদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষকই এই কাজের ভার নেন। যতদূর জানি স্যার আশুতোষের ইচ্ছা ছিল আমিও যেন এসব লেখার প্রতিবাদ করি। কিন্তু নানা কারণে এই সকল বাদ প্রতিবাদে আমি কখনও যোগ দিইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধ দলের অন্যতম লেখক ছিলেন আচার্য যদুনাথ সরকার। ইতিহাস গবেষকদের যদুনাথ খুবই ভালবাসতেন এবং নানাভাবে তাদের সাহায্য করতেন। কিন্তু কি কারণে জানিনা আচার্য যদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্যার আশুতোষের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। স্যার আশুতোষও তাঁদের মোটেই প্রীতির চক্ষে দেখতেন না। একবার কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাদের কাছে বলেছিলেন যে ঐ তিনজন লাটসাহেব হন, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই, যদি তাঁরা বাংলাদেশের বাইরে থাকেন বহু চেষ্টা করেও এই মনোমালিন্যের কারণ কিছু আমি নির্ণয় করতে পারিনি

পুণা সহরে—সম্ভবতঃ ১৯১৯ সালে—অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স-এর প্রথম অধিবেশন হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্যার আশুতোষ সেই সম্মেলনে কয়েকজন শিক্ষক প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন—তার মধ্যে আমিও ছিলাম। আশুতোষ বললেন যে পুণায় যখন যাচ্ছ তখন ওর কাছাকাছি কিম্বা আসা-যাওয়ার পথে কয়েকটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ জায়গা তোমরা দেখে আসবে। এর মধ্যে একটি হল সাঁচী। যাতায়াতের খরচ বিশ্ববিদ্যালয়ই বহন করবে এরূপ স্থির ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংস্কৃত কলেজ থেকে আমরা প্রায় আট দশ জন বাঙ্গালী অধ্যাপক পুণায় গিয়েছিলাম। অশীতিপর বৃদ্ধ স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। যতদূর মনে পড়ে তাঁর ঠিক জন্ম তারিখের দিনই এই অধিবেশন হয় এবং এই উপলক্ষে পুণা থেকে মহাভারতের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত করা হয়। এই সময় রাখালবাবু পুণায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। পুণায় পৌঁছে শুনলাম যে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি এতে যোগ না দিয়ে টুরে বেরিয়ে গেছেন। সম্মেলনে খাওয়ার ব্যবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি আহারে তৃপ্তি লাভ তো দূরের কথা তাতে আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তিও

হত না। সংস্কৃত কলেজের শ্রদ্ধাভাজন দুই বৃদ্ধ পণ্ডিত—সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং সম্ভবতঃ প্রমথনাথ তর্কভূষণ আমাকে বললেন, "বাপুহে! আর তো এভাবে চালাতে পারিনা। অন্য কোথাও ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারো কিনা চেষ্টা করে দেখো।" রাখালবাবুর কথাই তখন আমার মনে পড়ল। তিনি ছাড়া পুণায় আর কাউকে আমি চিনতাম না। তাঁর বাড়ী কোথায় ঠিক আমার জানা ছিল না। খোঁজ করে অনেক কষ্টে পরের দিন সকালে সেখানে হাজির হলাম। ডাকাডাকি করতে তাঁর ছেলে বেরিয়ে এসে বলল যে রাখালবাবু বাড়ী নেই, বাইরে গেছেন। এ খবর অবশ্য পূর্বেই জানতাম। তাকে বললাম, "তোমার মাকে একবার ডাকো, তাঁর সঙ্গে আমার একটি কথা আছে কলকাতায় বহুবার রাখালবাবুর বাড়ীতে রাত্রে ভূরি ভোজন করেছি। খাওয়া দাওয়ায় বিষয়ে তাঁর ব্যবস্থা ছিল রাজসিক ভাবের। সুতরাং তাঁর স্ত্রী আমাকে এবং আমাদের কয়েকজন বন্ধুকে বেশ ভাল ভাবেই জানতেন। তিনি অবশ্য আমাদের সামনে কখনও বের হতেন না আমার খবর পেয়ে তিনি দরজার ওধারে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে আমি বিদ্যাভূষণ মশায়ের কথা বললাম। শুনেই তিনি বললেন যে আমরা যেন সেই দুপুর থেকেই তাঁর বাড়ীতে খাই। সকালে তাড়াতাড়ি এত লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে তাঁর কষ্ট হবে এই মনে করে বললাম যে দুপুরের বদলে রাত্রে আসব। তিনি তা শুনলেন না; বললেন দুপুরে না গেলে তিনি দুঃখ পাবেন এবং রাখালবাবুও শুনলে রাগ করবেন। সম্মেলনের সকালের অধিবেশনের পরে আমরা চার পাঁচজন রাখালবাবুর বাড়ী গেলাম; সেখানে বেশ ভাল ভাবেই সেদিন আমাদের খাওয়া হল। বৃদ্ধ বিদ্যাভূষণ ও তর্কভূষণ মশায় রাখালবাবুর ছেলেকে বললেন, "তোমার মাকে বলো যে আমরা খুব তৃপ্তি লাভ করেছি এবং তাঁকে আশীর্ব্বাদ করছি।" রাখালবাবুর স্ত্রী বললেন যে যে-কদিন আমরা পুণায় আছি, দু'বেলাই তাঁর বাড়ীতে খেতে হবে।

পরের দিন ভোর বেলায় ডেলিগেট ক্যাম্পে শুয়ে আছি, ভালো করে ঘুম ভাঙেনি। এমন সময় শুনি বাইরের দরজায় দুমদাম করে কে ধাক্কা দিচ্ছে। দরজা খুলে দেখি স্বয়ং রাখালবাবু দাঁড়িয়ে। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় প্রথমেই আমাকে কিছুক্ষণ গালমন্দ করে পরে বললেন, "আমার বাড়ী থাকতে তোমরা

এখানে শুকিয়ে মরছ কেন ?" সম্মেলনের আয়োজনকারীদের সম্বন্ধেও কটূক্তি করলেন। তিনি গাড়ী নিয়ে এসেছিলেন। আমার মালপত্র সব গাড়ীতে তুলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। যাবার সময় বিদ্যাভূষণ মশায়দেরও নিমন্ত্রণ করে গেলেন। তাঁর বাড়ীতে যে-রকম খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা তা দেখে বললাম, "পুণায় দেখছি সমুদ্রের মাছও পাওয়া যায়।" মারাঠীদের সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে তিনি বলে উঠলেন, 'এদের দেশে কি এসব পাওয়া যায় নাকি! বোম্বাই থেকে আমি নিজেই এ সব আনাই। বাঙ্গালী সন্দেশ এবং মিষ্টিও বোম্বাই-এ পাওয়া যায়। তাও সেখান থেকে আনাই।" রাখালবাবুর স্বভাবই এমন ছিল। টাকা খরচ করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না; কিন্তু ভালরকম খাওয়া চাই। সম্মেলনের অধিবেশনের শেষেও তিনি আমাকে ছাড়লেন না। গাড়ী করে অনেক জায়গা তিনি আমাকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন— এর মধ্যে শিবাজীর কয়েকটি দুর্গ ছিল। রাখালবাবু খ্যাতিমান পণ্ডিত; এবং তাঁর চরিত্রে দেবগুণ দুইই ছিল। কিন্তু তাঁর বন্ধুপ্রীতি এবং অতিথি-বৎসলতার কথা কখনও ভুলব না; সেজন্যই এই ঘটনাটি সবিস্তারে বললাম।

পুণা থেকে ফেরার সময় আমাদের সাঁচী যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সময়কালে দেখা গেল আমি ছাড়া আর কারুর সেখানে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। সাঁচী দেখার আমার ভয়ানক আগ্রহ ছিল। সুতরাং একাই গেলাম। সেখানে থাকার ব্যবস্থা বলতে একটিমাত্র পাকা ঘর—যে ছোট পাহাড়ের উপর সাঁচীস্তূপ ঠিক তার পাদদেশে ছিল এই ঘর। স্যর জন মার্শাল যখন এই স্তূপের সংস্কার সাধন করেন, তখন তাঁর থাকার জন্য ঐ ঘরটি তৈরী হয়। এখন সেটি অতিথিদের জন্য ব্যবহার করা হয়। ঘরটি বেশ ভাল। সেখানে একজন চৌকিদার ছিল; সে রান্নার ব্যবস্থাও করত। সাঁচীর পাহাড় তেমন উঁচু নয়; উঠতে কষ্ট হত না। সকাল বিকাল দু'বেলাই পাহাড়ে উঠতাম। দ্বিতীয় দিন বিকালে স্তূপের চারিদিক ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এবং দূরের দৃশ্য দেখে এমনই মুগ্ধ হয়ে পড়ি যে কখন সন্ধ্যা হয়েছে খেয়াল ছিল না। পাহাড় থেকে নামার সময় দেখি একটি বুনো শূয়োর রাস্তা পার হচ্ছে। চৌকীদার বলল যে সন্ধ্যার পর বাইরে থাকা ঠিক নয়; কাছেই জঙ্গল আছে, বুনো জন্তু বেরয়।

সাঁচী সম্বন্ধে একটি বই আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই বইএর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে স্তূপের রেলিংএর গায়ে যে অসংখ্য চিত্র আছে, সেগুলি মন দিয়ে দেখতাম। স্তূপের অপরূপ ভাস্কর্য এবং স্থানটির চতুর্দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে খুব মুগ্ধ করেছিল। আমি সাঁচীতে তিনদিন ছিলাম।

(৬)

বাংলাদেশে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের মধ্যে যে দু'টি বড় দল আছে সেকথা প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময়েই আমি জানতে পারি। এ দু'দলে খুব রেষারেষি ছিল। এদের একটি হল রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এবং অন্যটি কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন সাহিত্য পরিষদ দলের নায়ক। অপর দিকে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পক্ষে ছিলেন অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ এবং দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়। দীঘাপাতিয়ার কুমার পুরাদ্রব্য সংগ্রহের বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন মূলতঃ তাঁরই অর্থ সাহায্যে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অক্ষয়বাবু এবং রমাপ্রসাদবাবুর সহায়তায় বরেন্দ্র অঞ্চলের নানা স্থান থেকে অনেক পুরাদ্রব্য সংগৃহীত হয় এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রগৃহ (Museum) গঠিত হয়। গৌড়রাজমালা এবং গৌড়লেখমালা নামে দুটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের পুরাতত্ত্বের একটি বিষয় নিয়ে এই সময়ে এই দুই দলের মধ্যে আন্দোলন সুরু হয়। আমাদের দেশের কুলজী গ্রন্থে আছে যে মহারাজা আদিশূরই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থদের নিয়ে আসেন। অক্ষয়বাবু, রমাপ্রসাদবাবু এবং রাখালবাবু কিম্বদন্তী বিশ্বাস করতেন না। এমনকি রাজা আদিশূরের অস্তিত্ব পর্যন্ত তাঁরা অস্বীকার করতেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসু এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে আদিশূর ছিলেন ঐতিহাসিক পুরুষ। এই আদিশূরকে নিয়ে দুই দলের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হয়। নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে তিনি সম্প্রতি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখা ছরি মিশ্রের কারিকা এবং এতু মিশ্রের কারিকা নামে দুখানি প্রাচীন পুঁথিতে

আদিশূরের উল্লেখ দেখেছেন এবং এসম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোকও উদ্ধৃত করেন। সুতরাং আদিশূরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। মূল পুঁথি-গুলি দেখতে চাইলে তিনি বলেন যে সেগুলি কোটালিপাড়ায় এক ব্রাহ্মণ বিধবার কাছে আছে; তিনি তা হস্তান্তর করতে রাজী নন। এ কারণে পুঁথির কয়েকটি শ্লোক মাত্র তিনি লিখে এনেছেন। এ শুনে অক্ষয়বাবুরা একজন সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অনেক টাকাকড়ি দিয়ে গোপনে কোটালি-পাড়ায় পাঠালেন। তিনি ঐ পুঁথি নকল করে আনেন। দেখা গেল ঐ পুঁথিতে নগেনবাবু কথিত অনেক শ্লোকই আছে; কিন্তু আসল আদিশূর সম্পর্কে শ্লোক কয়টি একেবারেই নেই। এই পুঁথির নকল বরেন্দ্র দলের হাতে আসার পর কথা উঠল যে একটি সভা ডেকে এ বিষয়ে আলোচনা করা হোক। রাখালবাবু বরেন্দ্র দলের প্রতি খুব বিরূপ ছিলেন। তবুও এই বিষয়ে তিনি তাদের সঙ্গেই যোগ দিলেন। কারণ তিনি বলতেন এবং অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে নগেনবাবু পুঁথি জাল করতেন। এক ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন যে নতুন পুঁথির উপর এ্যাসিড ছড়িয়ে বালির নীচে রাখলে সেটি পুরনো কীটদষ্ট পুঁথির মতো দেখায়। তিনি বলেন যে নগেন-বাবুর অনেক পুঁথি নাকি এ-ভাবেই পুরনো করা হয়েছে

রাখালবাবুর অনেক দোষ থাকলেও ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। সেজন্যই তিনি এ ব্যাপারে অক্ষয়বাবুর দলে যোগ দিলেন এবং আমাকেও ঐ দলে টেনে নিলেন যখন সাহিত্য পরিষদকে বলা হয় যে আদিশূর সম্পর্কে একটি আলোচনা সভা হোক—কেননা বাংলার সমাজের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তখন অনেকেই এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সভার একটি তারিখও স্থির হয়। এর মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং নগেনবাবু কিভাবে খবর পেলেন যে কোটালিপাড়া থেকে সেই পুরনো পুঁথির নকল আনা হয়েছে। কেউ কেউ তাঁদের একথাও বলেছিল যে পুঁথির দরকারী অংশের ফোটোগ্রাফও তোলা হয়েছে। যতদূর জানি এটা সত্যি নয়। এই খবর শুনে সাহিত্য পরিষদের নেতারা অত্যন্ত ভয় পেয়ে নির্দিষ্ট দিনে আলোচনা সভা বন্ধ করে দিলেন। যে কুলজী শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে তাঁরা আদিশূরের কথা বলছেন—তা সবই জাল বা মিথ্যা, এ কথা আমরা জোর গলায় প্রচার করলাম।

যে সময়ের কথা বলছি তখন বৃদ্ধ শাস্ত্রী মশায় ও নগেনবাবুকে লোকে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে বিশেষ অভিজ্ঞ বলে জানত। অনেকটা এই ব্যাপারের পরে এবং আমাদের অন্যান্য আলোচনার ফলে নগেনবাবুর সে খ্যাতি লোপ পায়। মনে হয় আমাদের এই চেষ্টার ফলে লোকের মনে বাংলা দেশের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার ধারণারও অনেক পরিবর্তন ঘটে

নগেনবাবুর ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি সম্বন্ধে আরও দু'একটি কথা বলছি। আমার সতীর্থ ও সুহৃদ নির্মল চন্দ্র চন্দ্রর কাছে শুনেছি যে একদিন নগেনবাবু নির্মলের পিতা বিখ্যাত এ্যাটর্নী গণেশ চন্দ্রর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে বলেন যে আপনাদের কুল পরিচয় পাওয়া গেছে। আপনারা হলেন চন্দ্রবংশীয় রাজা। তাম্রশাসনে এর উল্লেখ আছে। এই বলে তিনি কিছু টাকাও নিয়ে যান।

একবার বাংলার লাটসাহেব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ দেখতে আসেন এক একটি বিভাগ দেখাবার ভার এক একজনের উপর ছিল। আমি ছিলাম তাম্র শাসন সংগ্রহশালায়। লাটসাহেবকে কয়েকটি তাম্রশাসনের বিবরণ শোনালাম। তিনি চলে গেলেন। হঠাৎ দেখি নগেনবাবু কৃষ্ণদাস পালের পুত্র রাধাচরণ পালকে ডেকে বলছেন, আপনাদের পূর্বপুরুষেরা (অর্থাৎ পাল সম্রাটগণ) বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই তাম্রশাসনগুলিই তার প্রমাণ। বাংলাদেশে ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে অনুসৃত প্রণালীর যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে তার জন্য আমাদের দলের কিছু কৃতিত্ব দাবী করলে বোধ করি অন্যায় হবে না।

নগেনবাবুর এমন খ্যাতি ছিল যে পণ্ডিতরা তাঁকে 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব' উপাধি দিয়েছিলেন। শেষ জীবনে তাঁর পাণ্ডিত্যে কেউ বিশ্বাস করতেন না। শাস্ত্রী মশায়ও আমাদের উপর খুবই ক্রুদ্ধ হন। একদিন তিনি নাকি বলেছিলেন রাখাল, রমেশ—এরা কেবল প্রমাণ প্রমাণ বলে চেঁচামেচি করে। পাথুরে প্রমাণ ছাড়া তারা কিছু বিশ্বাসই করে না। কুলজী পুঁথির মর্যাদাই তারা দেয় না। এজন্য রাগ করে আমি এখন ইতিহাস ছেড়ে উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছি। 'বেনের মেয়ে' তার প্রমাণ।

এর অনেক বছর পরে শাস্ত্রী মশায় ও আমি এক সঙ্গে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চাকরী করতাম। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করি এমন কথা তিনি

বলেছিলেন কিনা। বললেন, "বলেছিলাম এবং এখনও বলি। তোমাদের জন্যে আর ইতিহাস লেখার উপায় নেই। কাজেই ইতিহাস না লিখে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখছি।" এখানে বলে রাখা দরকার যে বাংলা দেশের বৌদ্ধ যুগের ঘটনা অবলম্বন করে লেখা 'বেনের মেয়ে' একটি সুখপাঠ্য উপন্যাস।

সে সময় গবেষণার ক্ষেত্রেও পণ্ডিতে পণ্ডিতে বিরোধ ব্যক্তিগত জীবনেও প্রভাব বিস্তার করত। তেমনই একটি ঘটনার কথা বলছি। আদিশূরের অস্তিত্ব নিয়ে দু'দলে যখন বিরোধ চলছে, তখন এশিয়াটিক সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে 'রামচরিত' পুঁথিখানি দেখান হয় প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পরে কিন্তু পুঁথিখানির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বাংলার ইতিহাস চর্চায় 'রামচরিত' পুঁথি একটি অমূল্য উপকরণ। এতে রামপালের রাজ্যে কৈবর্ত বিদ্রোহের যেমন বিস্তৃত বিবরণ আছে তা আর কোথাও নেই এই গ্রন্থের এই একমাত্র পুঁথিটি শাস্ত্রী মশায় নেপাল থেকে এনেছিলেন পুঁথি হারানোয় আমরা সকলেই খুব বিচলিত হই। শাস্ত্রী মশায় বললেন, "বরেন্দ্র সমিতির লোকেরাই এ পুঁথি চুরি করেছে।" তিনি এমনকি পুলিশেও খবর দেওয়ার চেষ্টা করেন যাতে বরেন্দ্র সমিতি থেকে ঐ পুঁথি উদ্ধার করা যায়।

পূর্বেই বলেছি আমি তখন এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। শাস্ত্রী মশায়ের এ অভিযোগ আমরা সকলেই অবিশ্বাস করি। সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিন পরে এশিয়াটিক সোসাইটিতেই অন্যান্য কতকগুলি পুরোন পুঁথির মধ্যে রামচরিত পুঁথিখানি পাওয়া গেল। তখন শাস্ত্রী মশায় বলতেন যে পুলিশ ডাকার ভয়েই ওরা পুঁথি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

সে সময়কার প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিকদের মধ্যে আরও অনেক দলাদলি ছিল। বিশেষ করে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাণ্ডারকর এবং ভাণ্ডারকর ও জয়সোয়াল —এঁদের মধ্যে বনিবনা মোটেই ছিল না। এঁরা প্রত্যেকেই অপরের নামে নানা রকম কুৎসা রটাতেন। আমরা একদল ছিলাম এঁদের তিনজনেরই বন্ধু। আমাদেরই অসুবিধা হত বেশী। পণ্ডিতদের মধ্যে কি রকম ছেলেমানুষী ছিল একটি ঘটনা বললে তা বোঝা যাবে। আমাদের ঐতিহাসিক বন্ধুদের দলে ক্রমে একটি প্রথা দাঁড়িয়ে ছিল যে প্রত্যেক মাসে এক-

জনের বাড়ীতে খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। পালা করে ক্রমে ক্রমে সকলের বাড়ীতে হলেও নিমন্ত্রণটা রাখালবাবুর বাড়ীতেই অবশ্য বেশী হত।

আমার বাড়ীতে সেদিন খাওয়ার আয়োজন। রাখালবাবু, জয়সোয়াল, সুরেন কুমার, কালিদাস নাগ, যতীন্দ্রমোহন রায় ("ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা), হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি দলের সকলেরই নিমন্ত্রণ। হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে ভূতত্ত্বের অধ্যাপক; কিন্তু তিনি ছিলেন রাখালবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রত্নতত্ত্বেও তাঁর খুবই উৎসাহ ছিল। সেজন্য তিনিও এই দলে ছিলেন। এঁরা সবাই উপস্থিত হয়েছেন, আমি বললাম "এখনও ভাণ্ডারকর আসছেন না কেন?" শুনেই রাখালবাবু লাফিয়ে উঠলেন— "তুমি ভাণ্ডারকরকে নিমন্ত্রণ করেছ?" আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, "ভাণ্ডারকর এলে আমি এখানে খাব না।" আমি তো মহাসমস্যায় পড়লাম। হেমবাবুকে ধরলাম; তিনি অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে রাখালবাবুকে শান্ত করলেন। ভাণ্ডারকর আসার পরে রাখালবাবু রইলেন বটে তবে তাঁর সঙ্গে কোন কথা বললেন না।

ছোট হলেও আমাদের দলটি ছিল বেশ জমাট। সকলের মধ্যেই বেশ একটি সৌহার্দ্যের ভাব ছিল। এই সময় পাটনায় একটা কি ঐতিহাসিক অধিবেশন হয়। উপরে যাঁদের নাম করেছি তাঁরা সকলেই সেখানে যাবেন স্থির করলেন। জয়সোয়াল তখন পাটনায় ব্যারিস্টার। ভাণ্ডারকর ছাড়া আমরা আর সকলে তাঁর বাড়ীতে থাকব এমন ব্যবস্থা হল। একই ট্রেনে আমরা রওনা হলাম। সন্ধ্যার পর ট্রেন ছাড়ল, পরদিন সকালেই পাটনায় পৌঁছনর কথা। মাত্র কয়েকঘণ্টার পথ, এ সত্ত্বেও রাখালবাবু একটি বড় ডেকচিতে তিন চার সের রান্না মাংস ও লুচি নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। বললেন, "পথে বেরলেই আমার খিদে পায়। পৌঁছতে তো সকাল বেলা আটটা। ভোরে এই লুচি মাংসর আমাদের সকলেই ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যাবে।" একটি কামরায় আমরা পাঁচজন একসঙ্গে ছিলাম; দুতিনজন পাশের কামরায়। ঘুমিয়ে পড়েছি, এমন সময় হঠাৎ রাখালবাবু ধাক্কা দিয়ে তুলে বললেন, "ঘুমিয়ে রয়েছ আর এদিকে ওরা সব শেষ করে ফেলল।" তখন রাত্রি দেড়টা কিম্বা দুটো। রাখালবাবু ও আমি—এ

দু'জন ছাড়া দেখি বাকী সকলেই ডেকচি খুলে খাওয়া সুরু করেছে। আমরাও সে দলে যোগ দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ডেকচি একেবারে শূন্য। আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাল খেতে পারতেন। কে কি খেতে ভালবাসেন তা আমরা জানতাম। যতীন রায় একসঙ্গে পনের কুড়িটি ডিম খেত; হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এক হাঁড়ি দৈ খেতে পারতেন। তখন আমাদের শরীরও ভাল ছিল এবং খাওয়ার জিনিসও সব মিলত।

পাটনায় পৌঁছে জয়সোয়ালের বাড়ী যাওয়ার পথেই রাখালবাবু স্থির করলেন যে জয়সোয়ালকে জব্দ করতে হবে। জয়সোয়াল আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা ভালই করেছিলেন। কিন্তু খেতে বসে এঁরা সবাই এত বেশী খেতে সুরু করলেন যে অল্প সময়েই ভাত ফুরিয়ে গেল। তারপর এল রুটি। রুটিও সব শেষ হল—তবুও যেন এঁদের ক্ষুধা মেটে না। জয়সোয়াল তো খুবই অপ্রস্তুত, বিকেলে তিনি প্রায় ডবল আয়োজন করলেন। আড়ালে তাঁকে আমি বলেছিলাম সে তাঁর লজ্জার কোন কারণ নেই। এ সবই তাঁকে বিপদে ফেলার জন্য পূর্ব থেকে স্থির করা হয়েছে। এখনকার সঙ্গে সেদিনের যে কত তফাৎ, সেকথাটি বলার জন্যই এ ঘটনার উল্লেখ করলাম।

পাটনায় সভা শেষ হলে কালিদাস নাগ, ননীগোপাল মজুমদার ও আমি রাজগীর, নালন্দা প্রভৃতি বিহারের কয়েকটি জায়গা ঘুরে দেখি। সকালে টাঙ্গা নিয়ে বেরতাম, পথে সুবিধামত ছাতু বা চিঁড়ে খাওয়া এবং রাত্রে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেলে আহার সেরে ধর্মশালায় শুধু খাটের উপর শোওয়া —এভাবে প্রায় সাত আট দিন ঘুরেছি। তখন বয়স ছিল কম। কোন কষ্টই হত না।

রাজগীরে দেখলাম একটি মূর্তির গায়ে কি-সব লেখা আছে। তেল সিঁদুরে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, সন্দেহ হল প্রাচীন লেখা নিশ্চয়ই। পাণ্ডারা কিছুতেই মূর্তি ছুঁতে দেবে না। আমাদেরও জিদ চাপল যেভাবেই হোক এই লেখার একটি ছাপ তুলতেই হবে। রাখালবাবুর সঙ্গে কাজ করে ছাপ তোলার পদ্ধতি আমার জানা ছিল। কিন্তু সমস্যা হল জল বা সাবান দিয়ে তেল সিঁদুর না তুললে ছাপ নেব কি করে। ভেবে চিন্তে এক উপায় বার করা হল। কপালে চন্দন, গলায় উপবীত এবং খালি-গায়ে আমি সামনে চলেছি। পিছনে

কালিদাস ও মনীগোপাল। ওরা পাণ্ডাদের বলল যে উনি একজন বড় সাধু, স্বপ্ন দর্শন হয়েছে ঐ মন্দিরে দেবতাকে পূজো দিতে হবে। এই বলে ওরা পাণ্ডাদের হাতে দু'একটি টাকাও গুঁজে দিল। মন্দিরে ঢুকতে আর কোন বাধা নেই। আমরা ভিতরে ঢুকে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। জল দিয়ে তাড়াতাড়ি মূর্তিটি পরিষ্কার করে দেখি পুরনো লিপি উৎকীর্ণ করা আছে। তার ছাপ তুলে নিলাম। আবার যথারীতি মূর্তির গায়ে সিঁদুর লেপে বেরিয়ে এলাম। দুঃখের বিষয় ছাপটি পথেই হারিয়ে গেল।

রাখালবাবুর সঙ্গে ভাণ্ডারকরের বিরোধ ক্রমেই খুব তীব্র হয়ে ওঠে। কি জন্য এমন হয়েছিল তার সঠিক কারণ জানি না। শুনেছি রাখালবাবু যখন মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কার করেন তখন ভাণ্ডারকর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তাদের বলেছিলেন যে সেটি এমন কিছু নয়। তার ফলে রাখালবাবু পুণায় গিয়ে সেখানে অনেক লোক লাগিয়ে ভাণ্ডারকরের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কুৎসার কথা বার করেন এবং তা বলে বেড়াতেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানি না এবং আর বলবার ইচ্ছেও নেই। সামান্য কারণে বিশিষ্ট পণ্ডিত মানুষেরা যে নিজেদের মধ্যে অশোভন আচরণ করতে পারেন—এ তারই একটি দৃষ্টান্ত। যতদূর জানি রাখালবাবুর সঙ্গে ভাণ্ডারকর এবং ভাণ্ডারকরের সঙ্গে জয়সোয়ালের বিরোধ কখনও মেটেনি। জয়সোয়াল যখন কলকাতার যাদুঘরের দুটি মূর্তিকে শিশুনাগবংশীয় রাজার মূর্তি বলে প্রচার করেন তখন ভাণ্ডারকর ঐ মূর্তির পিছনে যে উৎকীর্ণ-লিপি আছে তা আমাকে দেখান। তার মধ্যে শিশুনাগ বা অজাতশত্রুর কোন কথাই নেই। সে কথা আমি একটি প্রবন্ধেও লিখলাম। জয়সোয়ালের প্রতি আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ কিছু ছিল না। ঐতিহাসিক সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যই আমি এ প্রবন্ধ লিখেছিলাম।

আরও অনেকবার জয়সোয়ালের মতামতের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখার উপকরণ ভাণ্ডারকর আমাকে দিয়েছেন। জয়সোয়াল যখন হাতিগুম্ফা ও খারবেল লিপি পাঠ করে নূতন আবিষ্কারের দাবী করেন তার অধিকাংশই যে কাল্পনিক এবং সে কথা যে সত্যসত্যই সেই লিপিতে লেখা নেই—একথা আমি ভাণ্ডারকরের দেওয়া ছাপ থেকেই প্রমাণ করি। পরে এ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়। জয়সোয়ালদের এরকম অনেক মতই ক্রমে বাতিল হয়ে যায়। এজন্য

অবশ্য জয়সোয়ালের সঙ্গে আমার বিশেষ কোন অসদ্ভাব সৃষ্টি হয়নি। ভাণ্ডারকরের কাছ থেকেই আমি এ সব প্রবন্ধ লেখার প্রেরণা ও সাহায্য পেয়েছি—এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ব্যক্তিগত মতামতের চেয়ে ঐতিহাসিক সত্যসন্ধানেই প্রতিই আমার লক্ষ্য ছিল।

(ক্রমশঃ)

জিয়াউদ্দীন বারাণীর ইতিহাস দর্শন

গৌতম ভদ্র

(পূর্বানুবৃত্তি)

শুধু ইতিহাসের বিষয় নির্বাচনে বারাণীর দৃষ্টিভঙ্গি সীমাবদ্ধ ছিল না, ইতিহাস পাঠকের চরিত্র সম্পর্কে তিনি একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বিচরণ করতেন। শুধুমাত্র সমাজের মুষ্টিমেয় জ্ঞানী গুণীরাই ইতিহাস পাঠের যোগ্য। অজ্ঞ ও সাধারণ লোকের ইতিহাস চর্চার কোন প্রয়োজন নেই ; কারণ ইতিহাসের শিক্ষা তাদের জন্মগত বোধশক্তির অতীত। তাঁর ভাষায়"··· শুধুমাত্র নির্বাচিত, বুদ্ধিমান লোকেরাই ইতিহাস পাঠের অধিকারী··· অশিক্ষিত ব্যক্তি, স্বল্পবুদ্ধি ও সাধারণ মানুষের কাছে ইতিহাসের কোন সার্থকতা নেই।"[১৩]

এই পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে বারাণীর শ্রেণীচরিত্র সহজেই অনুমেয়। অভিজাত সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপে বারাণী রঙ্গমঞ্চে অবিভূর্ত হয়েছেন। শুধুমাত্র সরকারী কর্মক্ষেত্রেই নয়, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তিনি অভিজাতদের একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, শিল্পানুরাগ বংশানুক্রমিক। পাছে নিম্নশ্রেণীর মুসলিমরা বা অন্য ধর্মাবলম্বীরা ইতিহাস পাঠ করে উচ্চশ্রেণীর মুসলিমদের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করার যোগ্যতা অর্জন করে সেইজন্যই তারা ইতিহাস পাঠে অনুপযুক্ত। মধ্যযুগের ইতিহাসে যে শুধুমাত্র ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতেরা অন্যান্য শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে . নি, ভাবজগতেও তাদের দাবিকে উপরে রেখেছিল—শ্রেণীস্বার্থের এই সত্য ক্ষমতাবান সামন্ত ও গোঁড়া মোল্লাদের প্রতিভূ বারাণীর গ্রন্থে স্পষ্টই প্রতিভাত হয়েছে। ইতিহাস পাঠ তাঁর হৃদয়কে কিছুমাত্র প্রসারিত করে নি।

কিন্তু ঐতিহাসিকের কর্তব্য ও নিজের ইতিহাস গ্রন্থ সম্পর্কে বারাণীর ধারণা অত্যন্ত উচ্চ ছিল। এই সমাজে ঐতিহাসিকের ভূমিকা হবে বহু

গুণসম্পন্ন। তিনি উদাহরণ সহযোগে এই লোকজীবনকে ধর্ম ও নীতি সম্পর্কে শিক্ষা দেবেন। এইজন্য ঐতিহাসিককে সত্যবাদী হতে হবে কারণ মিথ্যাকথা বললে মানুষ ভুল পথে যাবে ও ঐতিহাসিককে অবশ্যই শেষ বিচারের দিনে ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাঁর কথায় "...ঐতিহাসিককে অবশ্যই সত্যের লিপিকার হতে হবে।"[১৪] তবে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন বারাণী সত্যকথা বলার বিপদ জেনে কৌতূহলোদ্দীপক কথা বলেছেন। পূর্বতন শাসকদের সম্পর্কে নির্ভীকভাবে যা বলার বললেও সমসাময়িক শাসকমণ্ডলীর নিন্দা করে বিরাগভাজন না হওয়ার জন্য স্বচ্ছন্দে সত্য গোপন করতে বারাণী ভাবীকালের ইতিহাসসেবীকে নির্দেশ দিয়েছেন। ফিরুজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার সময় তিনি বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি আদর্শভ্রষ্ট। সেইজন্য নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তিনি ঘোষণা করলেন "...যদি ঐতিহাসিকগণ তাঁর শক্তিশালী সমসাময়িকদের ভয়ে স্পষ্টভাবে লিখতে অসমর্থ হন তবে তিনি ক্ষমার্হ।"[১৫] রাজানুগ্রহপ্রার্থী দুঃস্থ ঐতিহাসিক সত্যগোপনের জন্য পরবর্তী পাঠকবর্গের কাছে প্রকারান্তরে ক্ষমা চেয়ে গেলেন।

বারাণী দাবি করেছেন যে তাঁর গ্রন্থ প্রকৃত ইতিহাসের সকল শর্ত পূরণ করেছে। এর মধ্যে ইতিবৃত্ত, শাসনতন্ত্র, রাজার প্রতি উপদেশ ও নীতিশাস্ত্র যাই অনুসন্ধান করা হোক না কেন, সবই পাওয়া যাবে। এবং যেহেতু তিনি ঐতিহাসিক তথ্য যথাযথ পরিবেশন করেছেন ও পারতপক্ষে অসত্য বলেন নি সেহেতু "তারিখ" অত্যন্ত নির্ভরশীল গ্রন্থ হয়েছে। আত্মগরিমার ভরপুর ঐতিহাসিকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে: "...আমি জানি হাজার বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত কোন ঐতিহাসিক 'তারিখে'র মত গ্রন্থ লেখেনি।... আমি সত্যই বিস্ময়কর কাজ করেছি।"[১৬]

ইতিহাসের উপাদান সম্বন্ধে বারাণীর ধারণা একজন গোঁড়া মুসলমানের মত ছিল। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান সাপেক্ষ নয়। এই তথ্যগুলি কারুর না কারুর জ্ঞাত থাকে এবং সেই ব্যক্তি যদি মুসলিম হয়, তবে তার কথা অকপটে বিশ্বাস করা যায়। এখানে প্রশ্নোত্তরের বালাই নেই, সন্দেহের অবকাশ নেই, আছে শুধু এক অন্ধ বিশ্বাস। ঐতিহাসিক নূতন

তথ্য অন্বেষণ করবেন না বা কোন নূতন মত প্রতিষ্ঠিত করবেন না, তিনি গবেষক হবেন না। তিনি কেবল জ্ঞাত তথ্যকে নূতন ভাবে পরিবেশন করবেন।

কিন্তু একথা উল্লেখযোগ্য যে বারাণী অন্যের পুস্তকের উপর নির্ভর করেন নি। তিনি গভীর দারিদ্রের মধ্যে হঠাৎ ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা করেন ও নিশ্চয় তার জন্য পূর্ব থেকে রোজনামচা বা দলিল পত্র সংগ্রহ করেন নি। পরে ভাগ্যাহত বারাণীর পক্ষে বৃদ্ধ বয়সে সব নূতন করে সংগ্রহ করাও সম্ভব ছিল না। জনশ্রুতি ও স্মৃতিই তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল।

তিনি "তারিখে"র ভূমিকায় ও "ফুতুহাৎ"-এর বিভিন্ন স্থানে তবারি, বৈহাকি, উৎবী প্রমুখ ঐতিহাসিকদের নাম করেছেন। কিন্তু তাঁর গ্রন্থদ্বয় পরীক্ষা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি এই পুস্তকগুলির যথার্থ অনুলিপি পাঠ করেন নি বা পড়লেও কিছুই তিনি স্মরণ করে রাখেন নি। তিনি প্রধানতঃ যে সব পুস্তকের উপর ভরসা করেছিলেন তা হলো বাজারে প্রচলিত জনরুচির খোরাক মেটানোর জন্য সস্তাধরণের চটকদার বই। এইগুলি প্রায়ই বড় বড় লেখকের নামে সাধারণ মেধার লোকেরা লিখতেন। "ফুতুহাৎ" বা "তারিখে" বারাণী যে সব উদাহরণ দিয়েছেন—সেগুলো বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে মূল গ্রন্থ তিনি পড়েন নি।

বারাণী "ফুতুহাৎ"-এর প্রথম অধ্যায়ে ইনাম্ আসামী লিখিত "তারিখ-ই-খুলাফা-ই-আব্বাসাইদ"দের কথা উল্লেখ করেছেন। তাতে মদিনায় হারুণ-অল্-রসিদ ও শেখ ফৈজলের সাক্ষাৎকারের কথা বিধৃত আছে। কিন্তু আসামী প্রধানতঃ চিকিৎসক ছিলেন ও তিনি আব্বাসাইদদের সম্পর্কে কোন গ্রন্থ লেখেন নি। দ্বিতীয়তঃ ফৈজল মদিনায় নয়, মক্কায় থাকতেন। আবার ফুতুহাৎ-এর দ্বাবিংশতম অধ্যায়ে বারাণী বলেছেন, "...গজনী ও খোরাসানের সাম্রাজ্য সিমজুরীদের কাছ থেকে মামুদ লাভ করলেন...বহু বছর ধরে সিমজুরীরা খোরাসন ও গজনীর শাসনভার বহন করেছিল।[১৭]

কিন্তু বারাণী যদি 'তবকৎ-ই-নাসিরি" পড়তেন তবে তিনি এই ভ্রমাত্মক উক্তি নিশ্চয় করতেন না। প্রথমতঃ সিমজুরী কোনকালে গজনীর ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না। সবুক্তগীন মামুদের

আগেই রাজা হয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ খোরাসান সিলজুরীদের কার্যক্ষেত্র হলেও তারা কখনো রাজশক্তিতে পরিণত হয় নি। তারা শুধু সামানিদ্ সামন্তদের একটি শাখা ছিল। আবার "তারিখে" আহম্মদ চাপের মুখ দিয়ে বারাণী জালালুদ্দীনকে সুলতান মামুদের ও সুলতান সন্-জরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলেছেন। তাঁর ভাষায় "বিশ্ববিজয়ী, সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষাকারী, ইসলামের স্তম্ভস্বরূপ সুলতান মামুদ ও সন্জরের দৃষ্টান্ত কেন প্রভু অনুসরণ করেন নাই।" ১৮ কিন্তু সন্জর মোটেই তাঁর সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। ঘাজতুর্ক ১৯ ও কারা-খিতাই বা খিতানদের২০ হাতে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হন এবং তার মৃত্যুর সময়ে সেলজুক সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়ে যায়। "তবকৎ-ই-নাসিরি"তে এই তথ্য উল্লিখিত আছে। এই রকম প্রমাদ বারাণীর রচনায় ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ও দুঃখের বিষয়, গ্রন্থ লেখার সময় তিনি আমীর খসরুর "খাজাইন-উল-ফুতু", আমীর হাসানের "দেওয়ান" বা খিলজীদের সভাকবি কবিরুদ্দীন ইরাকির অধুনালুপ্ত "ফতেনামা" পর্যন্ত উল্টে দেখেন নি। স্মৃতি-শক্তি, কাগজ ও লেখনী ছিল গ্রন্থ রচনাকালে বারাণীর একমাত্র সহায়।

বারাণীর লেখার আঙ্গিক সত্যই প্রশংসনীয়। তিনি কথোপকথন ও স্বগতোক্তির মাধ্যমে "তারিখ" রচনা করেন। "তাজ-উল্-মাসির" উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় রচিত। নিজামী অতি পল্লবিত ও বর্ণাঢ্য ভাষা ব্যবহার করায় ভাষার মারাপ্যাঁচে ভাব হারিয়ে গেছে। অপরদিকে "তবকৎ-ই-নাসিরি" শুষ্ক তথ্যের ঘটনাপঞ্জী মাত্র। কিন্তু বারাণী এই দুটি চরম নেরুর মধ্যপন্থা অনুসরণ করেছেন। ঝরঝরে ও সুখপাঠ্য ভাষায় তিনি তাঁর "তারিখ" বা "ফুতুহাৎকে" উপন্যাসোপম করে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছেন। তাঁর লেখার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ফার্সী ভাষায় হিন্দী শব্দের ব্যবহার। যেমন— বাদলা, ভাটি, চাকর, চড়াই, চবুতরা, মণ্ডি ইত্যাদি। এই সংমিশ্রণ দোষের নয়। কারণ ফার্সী বিদেশী ভাষা ও ভারতীয় লেখকদের রচনায় কিছু স্থানীয় শব্দ থাকবেই। এছাড়া ব্যবহৃত হিন্দী শব্দগুলি মূল লেখার সঙ্গে সুন্দর-ভাবে মিশে গেছে। তবে আমীর খসরু বা উৎবীর মত বারাণী তির্যক ভাষা প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন না।

বারাণীর "তারিখ-ই-ফিরুজশাহী" হল একটি উপদেশসমন্বিত গল্প—নৈতিক শিক্ষামূলক একাঙ্ক নাটিকার সমষ্টি। ইহা একটি ব্যাখ্যামূলক ইতিহাস। ইতিহাসচর্চা শুধু অতীতের নৈর্ব্যক্তিক অনুশীলন নয়। বারাণীর কাছে ইতিহাসের ভিন্ন এক উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য হল সুলতানদের শিক্ষা-প্রদান করা। ইতিহাসের দেয়ালে সকলের অদৃষ্টলিপি অদৃশ্য অক্ষরে লেখা আছে। শুধু মাত্র চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরাই সেই লেখা পড়তে পারেন। বারাণী ভগবৎ ভয়ে ভীত মুসলিম নৃপতির জ্ঞাননেত্র উন্মোচনের জন্য 'তারিখ' রচনা করেন। বারাণী বর্ণিত কাহিনী ও তাঁর ব্যক্তিগত দর্শন অভিন্ন। তাঁর দর্শনকে জোরদার করার জন্যই সব ঘটনাকে সাজান হয়েছে। সব সুলতানের ভাগ্যকে তাঁর ভালো বা মন্দ কাজের দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে। কিন্তু কোনটা ভালো বা কোনটা মন্দ, কোনটা ধর্ম বা কোনটা অধর্ম, সে সম্পর্কে বারাণীর মতই চরম। বারাণী বর্ণিত আদর্শপালন ও অবহেলাই সব ঐতিহাসিক চরিত্রের পরিণতির যথার্থ বিশ্লেষণ। তিনি ইতিহাসকে এক অদ্ভুত বিশ্বাসের তবকে আবৃত করেছিলেন ও অতীতকে ধর্মের পরকলায় দেখেছেন। ইতিহাসের ঘটনাবলী অন্ধ মানুষের যষ্টি, কিন্তু কিভাবে সেগুলি পথ দেখাবে তা বারাণী বর্ণিত ধর্মের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ঐতিহাসিকরূপে বারাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তিনি ইতিহাসকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন। তিনি অবসর বিনোদনের উপায়স্বরূপ নামুলি সাহিত্যকর্মরূপে ইতিহাস রচনা করেন নি। তাঁর হৃদয়ের সকল ধ্যান-ধারণা ইতিহাসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যযুগের ঘটনাবর্ণনাকারীদের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত দর্শন তাঁকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে।

তিনি ধর্মীয় মনোভাবসম্পন্ন হলেও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কে গভীর চিন্তা করেছেন। এই দিক থেকেও তিনি সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের চেয়ে কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। 'জোয়াবিৎ' বা রাষ্ট্রীয় আইন ও 'আসলব্' বা সরকারী নির্দেশনামা সম্বন্ধে তিনি মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। আলাউদ্দীনের অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে তাঁর বিবৃতির জন্য ইতিহাসের যে কোন ছাত্র কৃতজ্ঞ থাকবে। অবশ্য তিনি যে সচেতনভাবে বা পৃথকভাবে এই শাসনতান্ত্রিক বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন—এই কথা মনে করা ভুল হবে।

বারাণী আদৌ আধুনিকমনা ছিলেন না। তথাপি প্রসঙ্গতঃ একমাত্র তিনিই রাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন এবং সেইজন্য আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

কিন্তু দার্শনিক বারাণীর দর্শন ছিল সঙ্কীর্ণ। ইসলাম ধর্মের কঠোর নিয়মাবলী না পালন করলে, উলেমাদের ২১ পৃষ্ঠপোষকতা না করলে এবং হিন্দুদের নিপীড়নে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে কোন শাসক আদর্শ সুলতান রূপে বরণীয় হতে পারেন না। হিন্দুদের প্রতি বারাণী অত্যন্ত গোঁড়া মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। তিনি 'ফুতুহাৎ'-এর একাদশ অধ্যায়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সামগ্রিক জেহাদ ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছেন। কাজী মুঘিসুদ্দীনের বক্তৃতাতেও তিনি হিন্দুদের সম্পূর্ণভাবে দমনের জন্য সুলতানদের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর রচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিন্দুদের কুক্ষিগত ছিল এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি বারাণীর গাত্রদাহ সৃষ্টি করেছিল। কারণ বারাণী হলেন আগ্রাসী মনোভাবসম্পন্ন মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং তিনি স্বভাবতই অন্য শ্রেণীর সমৃদ্ধি সহ্য করতে সক্ষম ছিলেন না। ফলে তাঁর রচিত ইতিহাস অস্বাভাবিক গোঁড়ামির জন্য পক্ষপাতিত্বশূন্য গ্রন্থের সম্মান কোন মতেই লাভ করতে পারে না।

ইতিহাসের চরিত্র বিচারেও বারাণীর সীমাবদ্ধ মনের পরিচয় আছে। মধ্য যুগের সেরা আরবী ঐতিহাসিক 'মুকদ্দমা' রচয়িতা ইবন-ই-খলদূনের সঙ্গে জিয়া বারাণীর তুলনামূলক আলোচনা করলেই এই ধারণা স্পষ্ট হবে। খলদূনের কাছে ইতিহাস সামাজিক মানুষের বিবর্তন কাহিনী। এই রকম সামগ্রিক ধারণায় রাজবংশের উত্থান-পতনের কাহিনী নগণ্য স্থান অধিকার করে থাকে। 'বিশ্বকৃষ্টির অনুধ্যান' ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য হয়। অপরপক্ষে বারাণী সমাজের চেয়ে ব্যক্তির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ঘটনার অন্তরাল থেকে যে অমোঘ ঐতিহাসিক শক্তি ব্যক্তির কার্যকলাপকে পুতুলের মত নিয়ন্ত্রিত করে সেই অদৃশ্য অথচ দুর্বার শক্তি সম্পর্কে তিনি একেবারে অজ্ঞ ছিলেন। ইতিহাসের বিরাট মহিমাময় রূপ 'তারিখ'-এ প্রতিফলিত হয় নি।

কালানুক্রমিক অসঙ্গতি ও ঘটনাকে বাদ দিয়ে যাওয়া বারাণীর প্রধান ত্রুটি। প্রথমতঃ বারাণীর স্মৃতিশক্তি যে ৭৬ বছর বয়স পর্যন্ত সবল ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয়তঃ তিনি ঘটনার কাল সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করেন নি। তিনি ঘটনাগুলিকে সময়ের ভিত্তির পরিবর্তে গুরুত্বের ভিত্তিতে বিন্যাস করেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন: "যাতে জ্ঞানী লোকেরা সমগ্রভাবে রাজ্যের কার্যাবলী নিরীক্ষণ করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক হতে পারে সেজন্য আমি কোন বিজয়, বিদ্রোহ বা ঘটনাকে আগে পরে ঠিকমত সাজিয়ে লিখিনি। ঘটনার কালানুক্রমিক বিন্যাসের প্রতি আমি উদাসীন ছিলাম।"২২ এর ফলে ইতিহাসের ছাত্রদের পদে পদে অসুবিধা ভোগ করতে হয়। দোয়াবে মহম্মদ কর্তৃক রাজস্বের হার বৃদ্ধিকে প্রথম সংস্কার বলে মনে হলেও বস্তুতঃ সেটা তাঁর শেষ সংস্কার সাধন। আলাউদ্দীনের দাক্ষিণাত্য অভিযান বা তাঁর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন, কোনটা আগে পরে—সে বিষয়ে 'তারিখ' থেকে আমরা কিছুই জানতে পারি না। আবার তরনাশিরিনের ভারতাক্রমণের কথা বারাণী বেমালুম ভুলে গেছেন।

এছাড়াও 'তারিখে' আমরা একটি অদ্ভুত ত্রুটি লক্ষ্য করি। 'তারিখে' আমরা যে সব কথোপকথন পাই, তাঁর অধিকাংশই বারাণীর উর্বর মস্তিষ্কে উদ্ভূত। তিনি ঐতিহাসিক চরিত্রের মুখ দিয়ে নিজের দর্শন প্রচার করেছেন এবং সেগুলি প্রায়ই বাস্তব সম্পর্ক রহিত। প্রথমতঃ ঐ কথোপকথনের সময় ও গ্রন্থ রচনার কালের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান আছে। বারাণী যেভাবে ছেদ চিহ্ন সমেত সুদীর্ঘ সংলাপগুলি অক্ষরে অক্ষরে লিখেছেন, তাতে সেইগুলির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ 'ফতুহাৎ' ও 'তারিখে'র মধ্যে অনেক স্থানে হুবহু মিল আছে। যেমন, মুবিসুদ্দীনের উক্তি ও 'ফতুহাৎ'-এ হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষোদগার একই সুরে গাঁথা। আবার মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে লিপ্ত না হওয়ার জন্য আলাউদ্দীনের প্রতি কোতোয়াল আলা-উল-মুলকের উপদেশ এবং 'ফতুহাৎ'-এর ষোড়শ অধ্যায়ে একটি মাত্র ভাগ্যনির্ণায়ক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে নিষেধবাক্য প্রায় সমার্থক।

সুতরাং বারাণী সুযোগ পেলেই 'তারিখে' নিজের মতবাদ প্রচার করেছেন ও বাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করতে অনুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি।

সব দিক বিচার করলে বারাণীর জীবন ও ইতিহাস দর্শনের যে চিত্র আমরা পাই তা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে প্রীতিপ্রদ নয়। তাঁর ধর্মীয় অনুদারতা, বিভ্রান্ত স্মৃতিশক্তি ও সমসাময়িক বিখ্যাত গ্রন্থগুলি সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য 'ফুতুহাৎ' ও 'তারিখের' ঐতিহাসিক মূল্য অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তাঁর রচনাবলী প্রকৃত ইতিবৃত্ত লেখার রসদ সরবরাহ করে মাত্র। বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকদের 'তারিখের' মালমশলার উপর ভিত্তি করেই প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনা করতে হবে। 'তারিখের' হুবহু অনুকরণ সুলতানী যুগ সম্পর্কে কোন সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করবে না। তথাপি একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে সুলতানী আমলের সাধারণ বিবৃতিকারের মধ্যে একমাত্র বারাণীর ঔজ্জ্বল্য আছে আর সেই ঔজ্জ্বল্য হল একটি অসম্পূর্ণ, সঙ্কীর্ণ দর্শনের দ্যুতি। এই দিক দিয়ে বারাণীর স্থান সুলতানী আমলের ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনন্য।

পাদটীকা

১৩। তারিখ। এলিয়ট ও ডাওসন অনূদিত। পৃঃ ২।

১৪। ঐ পৃঃ ১৫।

১৫। তারিখ। সৈয়দ আহমদ খাঁন অনূদিত। পৃঃ ১৬।

১৬। ঐ পৃঃ ১২৪।

১৭। ফুতুহাৎ। বেগম আফসর্ উমর সালিম খাঁন অনূদিত। পৃঃ ১০৫।

১৮। তারিখ। সৈয়দ্ আহমদ্ খাঁন অনূদিত। পৃঃ ২১৬।

১৯। যাজ তুর্ক—তুর্কীদের ওঘুজ শাখার আরবী নাম। অষ্টম শতকের অরখন শিলালিপি অনুসারে এই শাখা নয়টি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। এই শাখার অনুপ্রবেশ চতুর্থ থেকে দশম শতক পর্যন্ত মুসলিম জগতে চলতে থাকে।

পশ্চিম এশিয়ায় ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত আজ তুর্করা বিস্তার লাভ করে ও স্থানে স্থানে শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করে।

২০। কারাখিতাই বা খিতান—মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণাংশে বসবাসকারী জাতি। লিও বংশের প্রতিষ্ঠাতা আপাওকির নেতৃত্বে এই জাতি চীনের উত্তরাংশ ও মঙ্গোলিয়া জয় করে শক্তিশালি সাম্রাজ্য স্থাপন করে ও সুং বংশের আক্রমণ প্রতিহত করে। দুজুরদজেন্ নামক একটি উপজাতির হাতে সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হলে খিতানরা পশ্চিম এশিয়ায় অনুপ্রবেশ করে ১১২৫ সালে খোটান ও কাশগড়ে রাজ্য স্থাপন করে। এদের শাসকদের নাম ছিল "গুরখাঁন" ও জায়গীর প্রথা এই সাম্রাজ্যে একেবারে ছিল না। মুসলিমদের চরম শত্রু ছিল খিতানরা। চেঙ্গিজ খাঁনের হাতে পশ্চিম এশিয়ার খিতান রাজ্য বিধ্বস্ত হয়।

২১। উলেমা—'আলিম'-এর বহুবচন উলেমা। আলিম হলেন এমন ব্যক্তি যার 'ইলম্' বা জ্ঞান আছে। উলেমারা দুইভাগে বিভক্ত। (ক) উলেমা-ই-দুনিয়াভি বা ব্যবহারিক জগৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। (খ) উলেমা-ই দাভিনি বা আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তি।

২২। তারিখ। সৈয়দ আহমদ খাঁন অনূদিত। পৃঃ ৭৬৭।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় পর্তুগীজ

কালিদাস দত্ত

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে যে সকল ইউরোপীয় জাতি বঙ্গদেশে আসেন পর্তুগীজ তন্মধ্যে অন্যতম। তাঁহারা সেই সময় এদেশে আসিতেন কেবলমাত্র বাণিজ্যের লোভে নহে। দুঃসাহসিক অভিযান, রাজ্য জয়, দস্যুতা দ্বারা অর্থোপার্জন প্রভৃতি অন্যান্য বহু কারণেও। দিল্লীর মুঘল সরকারের সনন্দবলে তাঁহারা প্রথমে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে বাণিজ্যের ব্যপদেশে বন্দর স্থাপন করেন। চট্টগ্রাম তাঁহাদের নিকট তখন বড় বন্দর (Porto-grande) ও সপ্তগ্রাম ছোট বন্দর (Porto Pequero) নামে অভিহিত হইত। বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত উক্ত ছোট বন্দর সপ্তগ্রামেও তাঁহাদের শুল্কভবনাদি ছিল। পরে, ঐ বন্দরে পণ্যবাহী জাহাজ যাতায়াতের প্রধান পথ, সরস্বতী নদী পলি পড়িয়া স্থানে স্থানে রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইলে ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা উহা হুগলীতে স্থানান্তরিত করেন[১] এবং তদবধি উক্ত বন্দর ব্যাণ্ডেল নামে তাঁহাদের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করে। নৌবাহিনী রাখিবার নিরাপদ স্থান বন্দরকে তাঁহারা ব্যাণ্ডেল বলিতেন। আজিও হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল সহরের নাম উহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

১৫৮৩ হইতে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লিন্‌সটেন (Linschoten) নামে জনৈক ইউরোপীয় পর্যটক ভারতে ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে ঐ সময়ও হুগলীতে পর্তুগীজদের কোন দুর্গ ছিল না। তখন তাঁহারা সেখানে বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকিতেন। কেহ কাহারও শাসন মানিতেন না এবং নানাপ্রকার অপরাধ করিতেন বলিয়া একস্থানে কিছুদিন স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে পারিতেন না।[২]

সেই সময়ের কিছুদিন পরে তাঁহারা হুগলীতে দুর্গ ও স্থায়ী নানারূপ গৃহাদি নির্মাণ করেন ও ক্রমশঃ সেখানে একটি সমৃদ্ধ পর্তুগীজ উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। কিন্তু তখনও তাঁহাদের দুষ্ট প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকায়

হুগলী ও তৎপার্শ্ববর্তী জনপদ সমূহের অধিবাসীদের উপর তাঁহারা নানারূপ উৎপীড়ন করিতে বিরত ছিলেন না।

ঐসমস্ত উৎপীড়নের অভিযোগের মধ্যে প্রধান ছিল, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অত্যধিক শুল্ক ও করাদি আদায়, তাঁহাদের অনেককে বলপূর্বক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করান, নারী হরণ, বহু নরনারী ও শিশুকে ধরিয়া লইয়া গিয়া অন্য দেশের দাস বাজারে বিক্রয়।

অনেককাল ক্রমান্বয়ে উল্লিখিত রূপ উৎপীড়ন চলিতে থাকিলে অবশেষে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন বঙ্গদেশের শাসনকর্তা কাসিম খাঁ, সম্রাট সাজাহানের নির্দ্দেশে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান আরম্ভ করিতে বাধ্য হন এবং তিন মাস যুদ্ধের পর তাঁহাদের হুগলী হইতে বিতাড়িত করেন। সেই যুদ্ধে বহু পর্তুগীজ সৈন্য প্রাণত্যাগ করে, কয়েক সহস্র নৌবাহিনীর কর্মী বন্দী হয়, চারিশত পর্তুগীজ নরনারী ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন এবং অনেক বড়, মাঝারি ও ছোট পর্তুগীজ জাহাজ নষ্ট হইয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র রণতরী কোনরকমে পলাইয়া গিয়া সাগর দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৩]

উক্ত ঘটনার বহুপূর্বকাল হইতে বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশ প্রদেশে অবস্থিত সাগরদ্বীপ, কুলপী ও তাড়দহ প্রভৃতি স্থানে অনেক পর্তুগীজ থাকিতেন। কাসিম খাঁ হুগলী পর্তুগীজ শূন্য করিলেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা হইতে তাঁহাদের তাড়াইতে পারেন নাই। নদীবহুল ও দুর্গম বলিয়া দীর্ঘকাল তাঁহারা সেখানে থাকিতে সক্ষম হন।

পূর্বে তাঁহাদের অনেকে প্রতাপাদিত্যের পোত সংরক্ষণ, নৌবাহিনী ও সৈন্য বিভাগে কাজ করিতেন। ফ্রেডারিক ডুড্‌লী, ফান্‌সিস্‌কো রড্ডা, ও আগষ্টাস পেড্রো নামক তিনজন পর্তুগীজ প্রতাপাদিত্যের উক্ত পোত সংরক্ষণ গোলন্দাজ সৈন্য ও নৌবাহিনী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।[৪] তাড়দহে রড্ডা প্রতাপাদিত্যের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া একটি মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করেন। আদিগঙ্গা ও বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গমস্থলে ঐ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৫] প্রবাদ ঐ স্থানটিতে প্রতাপাদিত্যের একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল। প্রতাপাদিত্যের তৎকালীন ঐরূপ সামরিক ঘাঁটি সমূহের মধ্যে সাগর দ্বীপ খুব প্রসিদ্ধ ছিল।

সেখানে তাঁহার একটি বৃহৎ নৌবাহিনী পর্তুগীজদের তত্ত্বাবধানে থাকিত। প্রতাপাদিত্যের শাসন কৌশলে ঐ সকল পর্তুগীজ তথাকার জনসাধারণের সহিত শান্তিতে বসবাস করিতেন। সাগরদ্বীপে তখন জাহাজ নির্মিত হইত এবং পর্তুগীজদের উপর উহারও ভার অর্পিত ছিল। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধুমঘাট হইতে উক্ত দ্বীপ পর্যন্ত সমগ্র নদীপথ তাঁহার নৌবাহিনীর দ্বারা সংরক্ষিত থাকিত এবং পর্তুগীজরা ঐ পথেরও সংরক্ষণ কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। সেকারণ উক্ত দীর্ঘ জলপথকে লোক তখন ফিরিঙ্গি ফাঁড়ি বলিত।৬ পর্তুগীজরা তৎপূর্বকাল হইতে সর্বত্র ফিরিঙ্গি নামে অভিহিত ছিলেন।৭

১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের পতন ঘটিলে সাগরদ্বীপ অরক্ষিত হইয়া পড়ে এবং ফিরিঙ্গিদের অধীন হয়। তদবধি তাঁহারা সেখানে নানাপ্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করেন ও তাহার ফলে ক্রমশঃ তথাকার জনপদগুলি ধ্বংস হইতে থাকে। বৈদেশিক পর্যটক ম্যানরিকের বিবরণে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ সময় ফিরিঙ্গিরা উক্ত দ্বীপের পূর্বাংশে প্রবাহিত বারাতলা বা মড়িগঙ্গা নদীতে তাঁহাদের নৌবাহিনী (Armada) রাখিতেন এবং সেই সকল জলযানের সাহায্যে নিম্নবঙ্গে নদীতীরবর্তী জনপদ সমূহে লুঠ তরাজ করিয়া বেড়াইতেন। তজ্জন্য উল্লিখিত বারাতলা বা মড়িগঙ্গা নদী বহুদিন দুর্জ্জনদের নদী (Rogues river) নামে প্রসিদ্ধ ছিল ৮।

উপরোক্ত কারণে তৎকালে কলিকাতার দক্ষিণাংশ প্রদেশকেও জনসাধারণ ফিরিঙ্গির দেশ বলিত এবং ঐ সকল ফিরিঙ্গির ভয়ে ঐ অঞ্চল দিয়া আদিগঙ্গা পথে সাগরগামী নাবিকেরা তাঁহাদের জলযানগুলিকে দ্রুত গতিতে দিবারাত্রি বাহিয়া লইয়া যাইতেন। মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী তাঁহার চণ্ডীকাব্যে উহার এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,

"দক্ষিণে মেদিনীমল্ল বামে বীরখানা।
কেরোয়ালে ঝমকমি নদীজুড়ে ফেণা॥
কানাহাট ধুলিগ্রাম পশ্চাতে করিয়া।
অঙ্গরপুরের ঘাট বামদিকে থুয়া॥
ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিদিন বেয়ে যায় হরমদের ৯ ডরে॥"

বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত যে সকল স্থানে ফিরিঙ্গিদের ঘাঁটি ছিল তন্মধ্যে উক্ত সাগরদ্বীপ ব্যতীত কুলপী ও তাড়দহের নাম উল্লেখযোগ্য। কুলপী সাগর দ্বীপের অনতিদূরে হুগলী নদীর উপর অবস্থিত। সেখানে একটি পর্তুগীজ মহিলার গোর এখনও আছে। এই প্রবন্ধের শেষাংশে উহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাড়দহ অধুনা বিদ্যাধরী নদীর উপর অবস্থিত। কলিকাতা সহর পত্তন হইবার একশত বৎসর পূর্বে তথায় পর্তুগীজ অধিকার স্থাপিত হয়।১০

মুসলমান রাজত্বকালে ও চব্বিশ পরগণায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রারম্ভ সময়েও উপরোক্ত স্থানগুলি হইতে পর্তুগীজেরা নিম্নবঙ্গের নদীতীরবর্তী জনপদ সমূহে হানা দিয়া বহু নরনারীকে উল্লিখিত হরমদে উঠাইয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেন এবং দাক্ষিণাত্য ও অন্যান্য দেশে গিয়া দিনেমার, ইংরাজ ও ফরাসী বণিকদের নিকট উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতেন। তখন তমলুক ও বালেশ্বরেও দাসদাসী বিক্রয়ের বাজার ছিল। সেই সকল বাজারেও ঐরূপে ধৃত বহু নরনারীকে বিক্রয় করা হইত। তমলুকের রাজা ঐ সময় উক্ত ফিরিঙ্গি দস্যুদের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া থাকিতেন।

তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক শিহাবুদ্দীন তালীশের লিখিত বিবরণে ফিরিঙ্গিদের ঐসকল নিষ্ঠুর আচরণের উল্লেখ আছে। উহার কিয়দংশ এইরূপ, "They carried off Hindus and Moslems threw them one another in the docks of their ships and sold them to the Dutch, English and French merchants at the ports of Deccan. Sometimes they brought the captives to sell at a high price to Tamluk and the port of Balasore." ১১

বার্ণিয়ার ও অন্যান্য বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের গ্রন্থগুলি পাঠে জানা যায় যে ফিরিঙ্গিদের উল্লিখিতরূপ অত্যাচারেই বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী প্রদেশের অনেক প্রাচীন জনপদ অধিবাসীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ক্রমশঃ বনে পরিণত হয়। বার্ণিয়ার তাঁহার ভ্রমণ বিবরণে উহা এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, "Their ordinary trade was robbery and piracy. With some small and light gallies they did nothing

but coast about that sea, and entering into all rivers thereabout, and into the channels and arms of Ganges and between all these isles of the lower Bengal and often penetrating even so far as forty or fifty leagues up into the country, surprised and carried away whole towns, assemblies, markets, feasts and weddings of the Gentiles and others of that country, making women slaves great and small, with strange cruelty, and burning all they could not carry away. And thence it is that at present there are seen in the mouth of Ganges so mary fine isles quite deserted which were formerly well-peopled, and where no other inhabitants are found but wild beasts, especially tigers." ১২

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত রেণেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে ঐ সময়ের পূর্বকাল হইতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অধিকাংশ ভূভাগ বনময় ছিল। ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে সেখানে বন হাসিল কার্য আরম্ভ হয়। এখনও উহা শেষ হয় নাই। অধুনা ঐ প্রদেশের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড অরণ্যাবৃত হইয়া আছে। এনাগাৎ বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে যে সকল স্থান হাসিল হইয়াছে তথাকার বিভিন্ন অংশে বনমধ্য হইতে ও পুষ্করিণী, খাল প্রভৃতি খনন কালে ভূগর্ভ হইতে প্রাচীন মনুষ্যাবাসের বহু নিদর্শন বাহির হইয়াছে ১৩।

ঐ সকল প্রাচীন মনুষ্যাবাস যে বার্ণিয়ার বর্ণিত ফিরিঙ্গিদের উল্লিখিতরূপ অত্যাচারে জনশূন্য হইয়া বনে পরিণত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নানা স্থানে উহার বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন বিবরণাদি পাঠে জানা যায় যে মুঘল সরকার ঐ সকল অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত ফিরিঙ্গিদের শাসন করিবার অনেক চেষ্টা করেন এবং তদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে দুর্গ নির্মাণ ও সৈন্য মোতায়েন করান। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে উহার জন্য হুগলী ও হিজলীতে নওয়ার মহল অর্থাৎ নৌ সৈন্যের ঘাঁটি স্থাপন করান হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেও নবাব আলিবর্দী খাঁ উল্লিখিত কারণে কুলপীতে দেড়শত সিপাই রাখেন ১৪।

কিন্তু নিম্নবঙ্গের সাগরতীরবর্তী প্রদেশের দুর্গমতার নিমিত্ত ঐ সকল ব্যবস্থা বিশেষ ফলদায়ক হয় নাই।

তৎকালে পর্তুগীজদের পূর্বোক্তরূপ লুণ্ঠনকার্যে মগেরাও যোগ দিতেন। তাঁহাদের লুণ্ঠন ও যুদ্ধোপযোগী জলযান সমূহ ছিল। তাঁহারা আরাকানে থাকিলেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় আসিয়া পর্তুগীজদের সহিত সময় সময় একত্র হইয়া ভাগীরথী নদীর শাখাগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন ও নদীতীরবর্তী জনপদ সমূহে লুণ্ঠতরাজ করিতেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় শাসন ছিল না। তখন ঐ প্রদেশ উক্ত ফিরিঙ্গি ও মগ দস্যুগণের অত্যাচারের প্রধান ক্ষেত্র হইয়াছিল এবং সর্বত্র অরাজকতা বর্তমান থাকায় মগের মুল্লুক নামেও অভিহিত হইত।

কতকাল সেখানে মগ ও ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার অপ্রতিহত ছিল তাহা ঠিক জানা যায় না। প্রাচীন বিবরণাদিতে উল্লিখিত আছে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চব্বিশ পরগণা জেলা অধিকারের প্রারম্ভকালেও কলিকাতা অঞ্চলে তাঁহাদের অকস্মাৎ আক্রমণের ভয় ছিল। সে কারণ তখন উহা প্রতিরোধের নিমিত্ত উক্ত কোম্পানীর সরকার কলিকাতা ও হাওড়া জেলাতে অবস্থিত শিবপুরের মধ্যবর্তী হুগলী নদীর উপর একটি প্রকাণ্ড লোহার শিকল ঝুলাইয়া রাখিতেন [১৫] ও একটি বাঁধও নির্মাণ করেন [১৬]।

এখন যেখানে বোটানিক্যাল বাগান অবস্থিত তথায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যে একটি দুর্গও নির্মিত হইয়াছিল। উহা মগ বা মাকেয়া কেল্লা নামে অভিহিত হইত। মগ ও ফিরিঙ্গিদের ভয়ে তখন কেহ ঐ দুর্গের দক্ষিণে গিয়া গঙ্গাস্নান করিতেন না এবং রাত্রিতে আলোও জ্বালিতেন না।

ইংরাজ শাসন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে উহাদের অত্যাচার বন্ধ হইয়া যায়। লং সাহেব লিখিয়াছেন যে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দেও কলিকাতাবাসীগণ উহাদেরও ভয়ে শঙ্কিত থাকিতেন [১৭]।

বাঙ্গলা দেশে পূর্বোক্ত ফিরিঙ্গিগণ বহুদিন থাকিলেও এ প্রদেশের ভাষায় পর্তুগীজ ভাষার কতকগুলি শব্দ ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিশেষ সাংস্কৃতিক অবদান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ব্যাণ্ডেল ও কলিকাতায় দুইটি গির্জা ব্যতীত তাঁহাদের উল্লেখযোগ্য কোন স্থাপত্য নিদর্শনও দেখা যায় না। দক্ষিণ চব্বিশ

পরগণায় তাঁহাদের একটিমাত্র ছোট সমাধি মন্দির আছে। অধুনা উহা ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত কুলপী গ্রামে হুগলী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত এবং মল্ল বিবির গোর নামে প্রসিদ্ধ।

উহার সমগ্র অংশ ইষ্টক নির্মিত ও নিরেট। আকারে উহা বাঙ্গালা দেশের চালাঘরের অনুকরণে গঠিত মন্দিরের অনুরূপ। উচ্চে উহা প্রায় পঁয়তাল্লিশ ফুট হইবে। অধুনা হুগলী নদীতে যাতায়াতকারী অর্ণবপোতাদির সাহায্যার্থে রাত্রিতে উহার উপর আলো দেওয়া হয়। তজ্জন্য ইদানীং উক্ত সৌধটির সংস্কার সাধন করিয়া উহার শিখরে একটি লোহার মঞ্চ ও পশ্চাতে একটি লোহার মই সংলগ্ন করা হইয়াছে।

প্রবাদ মল্লবিবি নামক একজন পর্তুগীজ মহিলার সমাধির উপর উহা গঠিত হয় ১৮। উহার নির্মাণকাল ও উক্ত মহিলার পরিচয় অজ্ঞাত।

উহাতে পর্তুগীজদের স্মৃতি বিজড়িত আছে সত্য। কিন্তু উহার কোথাও তাঁহাদের সংস্কৃতির কোনরূপ প্রভাব নাই। উহার গঠন পরিকল্পনায় যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহা বাঙ্গালী স্থপতিরই সৃষ্টি।

কিছুদিন পূর্বে ঐ সমাধির অনতিদূরে, ভূগর্ভ খনন কালে, বন্দুকধারী জনৈক পর্তুগীজ সৈনিকের একটি পোড়ামাটির মূর্তি ও উহার সহিত কয়েকটি মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সৈনিকের মূর্তিটি ৭ ইঞ্চি উচ্চ। উহা হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে যে সকল পর্তুগীজ সৈন্য ছিল তাহাদের সামরিক বেশভূষার পরিচয় পাওয়া যায়।

পাদটীকা

(১) Hunter. Statistical Account of Hugli. p. 262.

(২) Bengal Past and Present. Part I. 1915. pp. 80,81.

(৩) History of Bengal. Dacca University. pp 326-27.

(৪) সতীশ চন্দ্র মিত্র, যশোর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯১।

(৫) "It is said that a Portuguese admiral of Protapaditya (named Rodda) defeated the Mughal forces in a battle fought at the confluence of Adiganga and Bidyadhari". O' Malley. District Gazeteer, 24-Parganas. p. 28.

(৬) সতীশ চন্দ্র মিত্র, যশোর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৮।

(৭) পর্তুগীজদের ঐ প্রকার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে ক্যাম্পস্ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, "Frank is the parent word of Feringhi by which name the Indiaborn Portuguese are still known The Arabs and Persians called the French crusaders Frank, Ferang, a corruption of France. When the Portuguese and other Europeans came to India, the Arabsapplied to them the same name Ferong, and then Feringi". Campos, Potuguese in Bengal. p. 47.

(৮) O' .Malley, Bengal Dsitriot Gazeteer. 24-Parganas. p. 34

(৯) ফরমন শব্দ পর্তুগীজ নৌবহরের নাম Armada শব্দের বাংলা অপভ্রংশ।

(১০) "The English were not the first European nation to settle in the district. The Portuguese are said to have occupied Tardaha on the Bidyadhari, at the spot where Tollys Nullah now joins that river, a century before the foundation of Calcutta." O' Malley. Bengal District Gazeteer. 24-Parganas. p. 34.

(১১) Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1907.

(১২) F. Bernier, Travels in Mogul Empire, Bangabasi edition.

(১৩) Kalidas Datta. Antiquities of Khari.
Do, Antiquities of the North-West Sundarban.
Do, Antiquities of the Sundarban.
Varendra Research Society's Monographs. Nos. 3,4 and 5.

(১৪) Jamini Mohan Ghose. Magh Raiders of Bengal. p. 70

(১৫) "The Sundarban were infested by these corsairs, and a chain had to be run accross the Hoogly between Calcutta and Sibpur to prevent them extending their raid up the river." O' Malley, Gazeteer, 24-Parganas. p. 39.

(১৬) "In 1760, the Government had a bund thrown accross the river near the site of Botanical Gardens to prevent them (Mage) and the Portuguese pirates coming up". Rev. J. Long. Journal of The Asiatic Society of Bengal. 1864.

(১৭) Ibid

(১৮) Jamini Mohon Ghose. Magh Raiders of Bengal. p.95

উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার

কুণাল সিংহ

উত্তরপাড়া জায়গাটি খুব প্রাচীন নয়। এ স্থানটির বর্তমান উন্নতির সূচনা উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। বালি গ্রামের উত্তর দিকে অবস্থিত বলেই এই স্থানের নাম উত্তরপাড়া। কবি কঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে, কবি বিজয়রাম রচিত তীর্থমঙ্গলে এবং দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী কাব্যে বালি ও কোন্নগরের উল্লেখ আছে। উত্তরপাড়ার আলাদা কোনও অস্তিত্ব সপ্তদশ শতকেও তেমন ভাবে জানা ছিল না। তবে সপ্তগ্রামের অবনতির পর থেকেই উত্তরদিকের এই সব অঞ্চলে জনবসতি বৃদ্ধি পায় তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাবর্ণ চৌধুরী বংশের রত্নেশ্বর রায় এখানে প্রথমে আসেন। তারপর গরলগাছা নিবাসী রামনিধি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চৌধুরী বংশে বিবাহ করে উত্তরপাড়াবাসী হয়েছিলেন। তাঁর কন্যা শিবানী দেবীর সহিত নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। নন্দগোপালের থেকেই উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় জমিদার বংশের উদ্ভব হয়েছে। নন্দগোপালের পুত্র জগমোহন ইংরেজ সৈন্যের বেনিয়ান হয়ে প্রভূত ধনের অধিকারী হন।

জগমোহনের পুত্রদের মধ্যে জয়কৃষ্ণ (জ্যেষ্ঠ পুত্র), রাজকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ সমধিক প্রসিদ্ধ। জয়কৃষ্ণ কিছুদিন পিতার মত ইংরেজ সৈন্যদলে কর্মরত ছিলেন। পরে ১৮৩০ সালে হুগলী জেলার কালেক্টরের মহাফেজের কর্মপ্রাপ্ত হন। এখানে নিযুক্ত থেকে তিনি জমিদারী সেরেস্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং প্রয়োজনবোধে সুবিধা মত নীলামে জমিদারী ক্রয় করে ধনবৃদ্ধি করতে থাকেন।

১৮৩৬ অব্দে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে উত্তরপাড়ার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৮ সালের মধ্যে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় ও

ঔষধালয় স্থাপন করে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন করার কথা ভাবছিলেন। সরকারের কাছে এ ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য চেয়ে তিনি বিফল মনোরথ হলেন। তারপর সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেই তিনি এ কাজে নেমে পড়লেন। ৮৫,০০০ টাকা ব্যয়ে হুগলী নদীর তীরে একটি বিরাট উদ্যানসংলগ্ন সুউচ্চ অট্টালিকা তিনি নির্মাণ করলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সাংবাদিক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁর বিখ্যাত'সম্বাদ-ভাস্কর' পত্রিকার ১৮৫৭ সনের ২৭শে জানুয়ারি সংখ্যায় এই গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সম্বন্ধে লেখেন :

"জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উত্তরপাড়া গ্রামে নিজ ব্যয়ে এক পুস্তকালয় নির্মাণ করাইতেছেন—ওই গ্রন্থ মন্দির প্রায় গ্রন্থন হইয়া উঠিল, অল্পদিনের মধ্যেই প্রস্তুত হইবেক—উক্ত মহাশয় পৃথিবীর প্রায় সকল খণ্ড হইতেই সংস্কৃত গ্রন্থ সকল আনয়ন করাইতেছেন বাবু সঙ্কল্প করিয়াছেন সংস্কৃত ভাষায় যত গ্রন্থ পাইবেন সমস্ত আহরণ করিয়া গ্রন্থালয়ে রাখিবেন এবং প্রয়োজনীয় ইংরেজি পুস্তকাদিও থাকিবে, আর বাংলা ভাষায় সমুদয় পুস্তক ও সকল ভাষার সমাচার পত্র এই গ্রন্থালয়ে রাখিবেন।"

গ্রন্থাগার নির্মাণের পর সুরু হ'ল গ্রন্থ সংগ্রহের পালা। এই সাধারণ গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠার সময়েই পুরাতন Hurkaru Library বিক্রয় সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। জয়কৃষ্ণ এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। একসঙ্গে বহু পুরাতন গ্রন্থ তিনি তাঁর গ্রন্থাগারের জন্য ক্রয় করে নিলেন। তারপর কোলকাতার পুরাতন পুস্তক বিক্রেতাদের কাছ থেকেও তিনি বহু পুরাতন ও মূল্যবান পুস্তক ক্রয় করেন। বইয়ের সংখ্যা এতে হ'ল প্রায় ১২,০০০। ১৮৫৯ সালে তিনি একজন গ্রন্থাগারিক, একজন সহ-গ্রন্থাগারিক, একজন দফ্‌তরি, একজন মেথর, একজন দরোয়ান এবং দু'জন মালী নিয়ে তাঁর গ্রন্থাগারের কাজের সূচনা করেন। বহুদিন পর্যন্ত গ্রন্থাগারের সংবিধানে এই কটি লোকের ব্যবস্থা ছিল। গ্রন্থাগারের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য জয়কৃষ্ণ কয়েকজন স্থানীয় লোককে গ্রন্থাগারের পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। জয়কৃষ্ণ যাকে Committee of Curators নাম দিয়েছেন, তার বর্তমান নামকরণ হতে পারতো

Library Committee। ১৯০২ সালের গ্রন্থতালিকা থেকে সেই সময়ের Committee of Curators-এর তালিকাটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ আছে : ১) রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ২। বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, ৩। বাবু সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪। বাবু পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৫। বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। এই সময়ে গ্রন্থাগারিক ছিলেন কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সহ-গ্রন্থাগারিক ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মাহিনা বাবদ গ্রন্থাগারের ব্যয় বহন করবার জন্য জয়কৃষ্ণ বছরে ১৮০০ টাকা আয়ের ছুটি তালুক—লাট জগৎবল্লভপুর ও লাট ইড়পাড়া—দান করে যান। গ্রন্থাগারের সর্বময় কর্তৃত্ব সংবিধান অনুযায়ী বংশের সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র-সন্তানের উপর অর্পণ করা হ'ত। অতি আধুনিক গ্রন্থাগারের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, জয়কৃষ্ণ উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে সেইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

গ্রন্থাগারের উপরের তলার কয়েকটি ঘর গণ্যমান্য অতিথিদের জন্য রক্ষিত ছিল। এখানে জনসমাগম, বক্তৃতা ইত্যাদির ব্যবস্থা হ'ত। গ্রন্থাগারের ফল ফুলের সুরম্য উদ্যানটিতে প্রতিবেশীদের অবাধ যাতয়াত ছিল। Mary Carpenter তাঁর "Six months in India" গ্রন্থে লিখেছেন, "The upper rooms are reserved to accommodate respectable visitors as well as to hold public meetings and to deliver lectures—in fact to serve the purpose of a Town Hall।"

এখানকার পুস্তকগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে আশ্চর্যভাবে সমৃদ্ধ। পুরাতন পুস্তকতালিকায় (১৯০২) যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে সেগুলি হ'ল—বিজ্ঞান, অঙ্ক, শিল্পবিদ্যা, ধর্ম, শিক্ষা, মনোবিদ্যা, সাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনী, স্থাপত্যবিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ডাক্তারী, কাব্য, নাটক, অভিধান, বিশ্বকোষ, সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রবিদ্যা, জীবনী, কৃষিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ইতিহাস, আইন, পার্লামেন্টের বিতর্কবলী, গেজেট, দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা, পঞ্জিকা ইত্যাদি। এছাড়া বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সী ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত পুস্তকে সমৃদ্ধ ছিল এই পুস্তকাগারটি। তখনকার দিনের প্রায় সমস্ত

প্রচলিত সাময়িক পত্র এখানে রাখা হ'ত। বিদেশের ইংরেজী পত্রপত্রিকার জন্য বছরে ১০০০৲ টাকার ব্যবস্থা ছিল। ১২,০০০ ইংরেজি পুস্তক ছাড়াও গ্রন্থাগারে বাংলা ও সংস্কৃত বইয়ের একটি বিশেষ বিভাগ ছিল। এই বিভাগে ২,৫০০রও বেশী পুস্তক ছিল। জয়কৃষ্ণের মাতুল, পণ্ডিত জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কার ভারতের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁর ন্যায়শাস্ত্রের যাবতীয় পুঁথি এবং তাঁর কৃত ভাষ্য তিনি জয়কৃষ্ণকে এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য দিয়েছিলেন।

এই আশ্চর্য গ্রন্থ-সংগ্রহের মধ্যে কয়েকটি অসামান্য গ্রন্থের নামোল্লেখ এখানে করা হ'ল :

শব্দকল্পদ্রুম ২য় খণ্ড (রাজা রাধাকান্ত দেব প্রণীত), সমর্থকোষ, শিক্ষা কোষ, সংস্কৃত শব্দকল্পদ্রুম (১৭৪৯-৭৯), হিস্টরিকাল অ্যাণ্ড ক্রিটিকাল ডিক্সানারী (পিটার বেইলী কর্তৃক সম্পাদিত), ডিকসানারি অব কেমিষ্ট্রি (১৭৮১), জেকবের অভিধান, রিচার্ডসনের ইংরেজি-পর্শিয়ান অভিধান, সেরিডন ও স্মাইলের অভিধান, উডফেলের পার্লামেণ্টারী ডিবেট্স্ (১৭৯৬), ডডসনের রিপোর্টস্ অব কেসেস্ ইন হাইকোর্ট অব অ্যাডমিরালটি (১৮১৯), সংস্কৃত বাইবেল (১৮৫৮), ম্যাক্সমূলার প্রণীত দেবনাগরী ও রোমান অক্ষরে সংস্কৃত গ্রামার (১৮৬৬), কেরির ব্যাকরণ, কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (১৭৪৩), হ্যালহেডের গ্রামার (১৭৭৮), ডানকানের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব জাস্টিস ইন দেওয়ানি আদালত (১৭৮৫), মার্সম্যানের ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৩১) দোম আন্তেনিওর ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ, রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্ (১৮০৫), রামমোহন রায়ের বেদান্ত-চন্দ্রিকা (১৮১৭) ও বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫)। ইহা ছাড়া অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, রামকমল ভট্টাচার্য, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারী চাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়; মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং তৎকালীন ও পরবর্তীকালের বহু লেখক লেখিকার রচনা এই গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের লেখকগণের রচনা, প্রথম যুগের

বাংলা নাটক, চারুমুখ বিত্তহরা ও ভানুমতি চিত্তবিলাস, বেণীসংহার প্রভৃতি গ্রন্থ কৌতূহলী সাহিত্য-ঐতিহাসিকের নির্ভরযোগ্য উপাদান।

প্রাচীন পত্রপত্রিকা, রিপোর্ট ইত্যাদির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য : সোম প্রকাশ ; দিগ্‌দর্শন (১ম সংখ্যা) ; কল্পদ্রুম (১২৮৭ থেকে) ; নিত্য ধর্মানুরঞ্জিকা (১৮৫৮ থেকে) ; বামা বোধিনী (১২৭২-১৩০০ খণ্ড) ; বিবিধার্থ সংগ্রহ (ইং ১৭৭৩-১৭৮২) ; বান্ধব (১২৮৮-৯১) ; সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র (১২৬২) ; তত্ত্ববোধিনী, আর্য দর্শন, বঙ্গদর্শন, সাধনা, ভারতী প্রভৃতি বাংলা পত্রিকা এবং এশিয়াটিক জার্ণাল্‌স্ (১৮১৬ থেকে ৫৩১ টি খণ্ড) ; ব্রিটিশ রিভিউ (১৮১১ থেকে ২১ খণ্ড) ; আমেরিকান কোয়ার্টারলি রিভিউ (১৮০৮ থেকে ৭৯ খণ্ড) ; এডিনবার্গ রিভিউ (১৮০৮ থেকে ৭৯ খণ্ড) ; গভর্ণমেণ্ট গেজেট ইন বেঙ্গল (১৮৪০-১৮৯৭) ; গেজেট অব ইণ্ডিয়া (১৮৭১-১৯২২) ; কালকাটা গেজেট (১৮৫৪ থেকে ১৯৫৩) ; এসিয়াটিক অ্যানুয়াল রেজিষ্টার ; ক্যাম্পবেল সম্পাদিত অ্যানুয়াল রেজিষ্টার ; জেণ্টলম্যান্‌স্ ম্যাগাজিন ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া ট্রাক্টস্ (১২টি সংখ্যা) ; ক্যালকাটা মান্থলি জার্ণাল।

Sir William Hunter তাঁর Gazetteerএর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এই পুস্তকালয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেন :

Special acknowledgements are due to Babu Joykisseen Mukherjee for the use of his large and excellent library at Uttarpara, in Hoogly district. The facilities afforded by the unique storehouse of local literature, alike in English and vernacular tongues, have materially aided in the verification of statements, avoidance of errors and the addition of new facts. They have tended to lessen the inevitable disadvantages under which the literary work has to be done in India, separated by half the globe from those great libraries of reference which more fortunate writers in England have at their disposal.

Hunter একাধিকবার উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের এই সাধারণ গ্রন্থাগারটির দ্বিতলের কক্ষগুলিতে বাস করে গেছেন। জয়কৃষ্ণের পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সময়েও হাণ্টার সাহেব উত্তরপাড়াতে কিছুদিন অতিবাহিত করেছিলেন। কোলকাতার পাঁচ মাইল উত্তরে, সহরের

ধোঁয়া ও কোলাহলের বাইরে—এখানে হাণ্টারের দিন চমৎকার কেটে যেত। ১৮৫৫ সালের ২৯শে ডিসেম্বর এই গ্রন্থাগারের দ্বিতলের কক্ষে বসে তিনি তাঁর স্ত্রীকে লিখেছেন যে, "The Library is quite unique for books on Indian History, and it takes the place of mine own at Simla. I have set apart a suite of rooms overlooking Hooghly for my work on the Gazetteer।"

১৮৬৯ ও ১৮৭৩ সালে মাইকেল মধুসূদন এই গ্রন্থাগারে কিছুকাল বাস করে ছিলেন। ১৯০৯ সালের ৫ই মে শ্রীঅরবিন্দ এই গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে তাঁর প্রসিদ্ধ উত্তরপাড়া ভাষণ দান করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, লর্ড লরেন্স (গভঃ জেনারেল), স্যার এ্যাশলি ইডেন (লেঃ গভর্ণর), স্যার রিভার্স টমসন (লেঃ গভর্ণর), স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলি, স্যার এডুইন আরনল্ড, মার্কুইস অব ডাফরিন এণ্ড আভা (গঃ জেনারেল), মার্কুইস অব হাণ্টলি, মেরি কার্পেণ্টার প্রমুখ বিশিষ্ট নরনারীগণ জয়কৃষ্ণের জীবিতাবস্থায় এই গ্রন্থাগার পরিদর্শনে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, কবি হেমচন্দ্র, বিপিন পাল ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা লেখক ও চিন্তানায়কগণের সাহচর্য এই গ্রন্থাগার লাভ করে। বিশ শতকের প্রথম দশকে এই গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করার অনুমতি চেয়েছিলেন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ও বিশ্বকোষ রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসু।

১৯২৩ সালের পর থেকেই এই গ্রন্থাগারটি পতন সুরু হয়। এই সময় লাট জগৎবল্লভপুর গ্রন্থাগারের সত্বাধীনে আর থাকে না, এতে গ্রন্থাগারের আয় অনেকাংশে কমে যায়। কালক্রমে গ্রন্থাগারটি মুখোপাধ্যায় বংশের কোন এক শাখার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে এই গ্রন্থাগারটি 'স্পনসর্ড লাইব্রেরীর' মর্যাদা লাভ করেছে। এ সত্বেও গ্রন্থাগারটির বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান আজও সম্ভব হয়নি। প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে এই গ্রন্থাগারের বর্তমান গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত করার কাজটি সম্পূর্ণ হচ্ছে না। গ্রন্থতালিকাটি সম্পূর্ণ হলে ইতিহাসের ছাত্রদের গবেষণা কার্যে বিশেষ সহায়ক হবে।

শিশুমেধ

বেলা দত্তগুপ্ত

পৃথিবীতে বহু গুরুতর সমস্যা থাকা সত্ত্বেও 'শিশুমেধ' এই সমস্যাটি বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় কেন হল এ নিয়ে বিদগ্ধজনের মনে একটু প্রশ্নের অবকাশ আছে জানি। এ ধরণের একটি প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে হয় বিদেশে একটি অপ্রিয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ১৯৫৯ সনে ইংলণ্ডে ট্রেনে এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি ১৯৫৮ সনে ভারতবর্ষ সফর করে গেছেন বললেন। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে প্রশ্ন করি ভারতবর্ষ তাঁর কেমন লেগেছে। প্রশ্ন মাত্রই ভদ্র মহিলা প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়েন এবং ইংরেজের স্বল্প বাচনের প্রায় প্রবচন প্রসিদ্ধ স্বভাবটি মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে অজস্র কটু ভাষণে তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁর মূল অভিযোগ ছিল যে, আমরা ভারতবাসীরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, বর্ব্বর, শিশুদের কদর বুঝিনা, মূল্য দিই না। তাদের যথেচ্ছ পীড়ন করি, নানারকম শ্রমসাধ্য কাজ করিয়ে নিই তাদের দিয়ে। অসংখ্য 'সুসাইন বয়' ও রেঁস্তরা বয়-এর কথা মহিলা বললেন। এবং আগে আমরা আরও বর্বর ছিলাম নানা ভাবে শিশুদের হত্যা করেছি। ইংরেজ শাসনকর্তা লর্ড ড্যালহৌসি ভারতবর্ষে না এলে এ ধরণের শিশুহত্যা বন্ধ হত কিনা সন্দেহ। সর্বোপরি, ইংরেজের দেশে এবং ইওরোপীয় সমাজে এ ধরণের বর্বর প্রথার কোনও স্থান হয়নি কখনও। প্রতিবাদের পথ ছিল না ; কারণ অর্থনৈতিক পঙ্গুতার জন্য আমাদের দেশে শিশুদের উপর পীড়ন চলেছেই এবং চলবেও। এবং ড্যালহৌসি প্রমুখ রাজপুরুষেরা যে এই ধরণের সামাজিক ক্ষত দূর করেছিলেন তাও ঠিক। কিন্তু মনে একটা কাঁটা বিঁধে রইল। অলিভার টুইষ্ট কিংবা ডক্টর বার্ণাডোর জীবনী Father of Nobody's Children কিংবা বার্ণার্ড শ'র Man of Destiny এই সব বইতে উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের যে ছবি উদ্ঘাটিত হয়েছে, তাতে তো শিশু দরদের কোন আভাস নেই। মার্ক্স এঙ্গেলস্-এর কিংবা

হ্যামণ্ড দম্পতীর লেখায় শিশুদরদের চাইতে শিশুপীড়নের কাহিনীই তো বেশী সোচ্চার। তবে প্রত্যক্ষ শিশুনিধনের কোন তথ্য পাইনি তাতে। সম্প্রতি ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইংলণ্ডে শিশু নিধনের বিশেষ করে শিশুকন্যা নিধনের কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। বর্ব্বরতায় ও নিষ্ঠুরতায় এ হত্যাকাণ্ডের তুলনা পাওয়া কঠিন।

লর্ড ড্যালহৌসির প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে শিশুহত্যা বন্ধ হয়। এই মহৎ কার্যের জন্য সমসাময়িক দেশী ও বিদেশীদের কাছ থেকে প্রচুর সাধুবাদও তিনি পেয়েছিলেন। স্বীয় কীর্ত্তিতে "greatest triumph" বলে আত্মশ্লাঘাও প্রকাশ করেন এবং স্যার জন লরেন্স-এর সঙ্গে সমকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছিলেন "if future success should crown these initiatory measures, then in some respects a social revolution will have been effected. Not only will a barbarous and secret crime have ceased to exist but endless abuses connected with the betrothal will be repressed, domestic morality improved and female positions secured"। ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর মনোভাব নিয়ে তিনি যখন ভারতবর্ষের এক কলঙ্ক মুছে দেবার চেষ্টা করছিলেন ঠিক সেই সময়ই ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের চেয়ে অনেকগুণ বেশী বর্ব্বর শিশুহত্যা সংঘটিত হয়ে চলেছে। প্রশ্ন জাগে ওয়াকার, ড্যালহৌসি প্রমুখ শাসকেরা নিজেদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সত্যিই কি অজ্ঞ ছিলেন, না হুইগ-সুলভ ইতিহাস দর্শন তাঁদের প্রায়ান্ধ করে রেখেছিল ? ইংরেজের দেশে শিশুহত্যার চেহারা বর্ণনা করার আগে ভারতবর্ষে শিশুহত্যা ও ব্রিটিশ যুগে তার অবসান অধ্যায়টি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। এ থেকেই কিছুটা বোঝা যাবে যে, সামাজিক ও ধর্মগত কোন পরিবেশে ভারতবর্ষে শিশু হত্যা সংঘটিত হত আর ইংলণ্ডেই বা তার কি পরিবেশ বা পশ্চাদভূমি ছিল।

নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শিশুহত্যা, বিশেষ করে মেয়ে শিশু হত্যা, বিভিন্ন উপজাতি ও কৌমের ভিতর অনেক দিন থেকেই প্রচলিত ছিল এবং এ সম্বন্ধে নানাবিধ নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও আছে। ভারতবর্ষে

দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃত ও প্রাকৃত মানুষের সহাবস্থানের সুযোগ ঘটেছে। ধর্মে, দৈনন্দিন আচার ব্যবহারে, ক্রিয়া কাণ্ডের পরস্পরের প্রভাব তাই অবশ্যম্ভাবী। উপজাতীয় বহু আচার রীতি হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে—মেয়ে শিশু হত্যা তাদের মধ্যে একটি। তাছাড়া, জাতি-বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের বিবাহ ব্যাপারটি বাপ মায়ের একটি শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' প্রচলিত ছিল ; কিন্তু উচ্চ বর্ণের মেয়ের পক্ষে কুলের বাইরে থেকে স্বামীরত্ন লাভের অনুমোদন সমাজ কখনও দেয়নি। তাছাড়া, রজঃস্বলা হবার আগে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বিবেচিত হওয়ায় উচ্চ বর্ণের বাপমায়েরা এক কঠিন সংকটে পড়েন এবং মেয়ে শিশু হত্যা তাদের এই সংকটে একটি মুক্তির পথ এনে দেয়। ১৮৫১-৫২ সনে বার্ণেস (M. G. Barnes) রাজপুতদের ভিতর মেয়ে শিশু হত্যার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখলেন "female infanticide arose from combined motives of pride and poverty"। কারণ বর্ণ ও জাতিভেদের সমাজব্যবস্থায় সর্বোচ্চ বর্ণের মধ্যে মেয়েদের বিবাহ ব্যাপারে প্রায়শঃ একটি অসুবিধা দেখা দেয়। কিছু সংখ্যক মেয়েকে হয় অবিবাহিত রাখা আর নয়ত পদমর্যাদায় ন্যূন অন্য বর্ণের পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া—উভয়ই সমান অসম্মানজনক। এই অসম্মানজনক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার একটিমাত্র পথ—শিশু কন্যাকে নিধন করা। এবং বার্নেসের মতে সেই পথই রাজপুতেরা অনুসরণ করে চলেছে। এক্ষেত্রে হত্যাকারীর কোন সাজা হয় না কারণ "artificial restraints cannot be avoided without loss of caste and honour"।

অপর পক্ষে দশ বছরের বেশী বয়স পর্যন্ত মেয়েদের অবিবাহিত রাখা হবে না—বিভিন্ন স্থানীয় প্রধানদের এই দৃঢ় মনোভাব থাকার দরুণ পাত্রের দল অত্যন্ত উচ্চ হারে বিবাহপণ দাবী করতে আরম্ভ করে। ফলে, উচ্চ বর্ণের বাপ মায়ের পক্ষে শিশু কন্যা হত্যার পথটি নিতান্ত আর্থিক প্রয়োজনেই নিতে হয় "being driven to it by their inability to meet the heavy marriage expenses"।

পাঞ্জাবেও শিশু কন্যা হত্যা ব্যাপক ছিল—বিশেষ করে শিখদের "বিরি"

সম্প্রদায়ের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে, এরা শিশু কন্যা হত্যার জন্য কুখ্যাতই ছিল। এদের বলা হত "কোরী-মার" অর্থাৎ মেয়ে-মারা। জলন্ধরের ডেপুটি কমিশনার এইচ. বি. এডওয়ার্ডস্ (H. B. Edwards) গবেষণার মনোবৃত্তি নিয়ে 'মেয়ে-মারা'-র কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং বিরিদের কাছ থেকে এক কিম্বদন্তী সংগ্রহ করেন শিশু কন্যা হত্যা সম্পর্কে। এডওয়ার্ডস্ তাঁর সংগৃহীত কিম্বদন্তী থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে শিশু কন্যা হত্যার ব্যাপারটি প্রকৃত পক্ষে "a social custom mixed with religious pride"। শিশু কন্যা হত্যা সম্বন্ধে বিরিদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীটি নিম্নরূপ :

"ধরম চাঁদের দুই ছেলে, মিহির চাঁদ ও নানুক চাঁদ ও এক মেয়ে ছিল। মেয়েটি বয়ঃপ্রাপ্তা হলে কুলপ্রথা অনুযায়ী একটি ক্ষত্রী পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়। বিবাহের দিন পাত্রের ডুলি কন্যাপক্ষের বাড়ীর দরজা দিয়ে সহজে ঢোকেনা। অনেক জোর জবরদস্তি করে তা ঢোকানো হয় এবং বিশেষ মনোমালিন্যের মধ্য দিয়ে বিবাহ কার্য শেষ হয়। মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পৌঁছে দিতে মেয়ের দুই ভাই সঙ্গে যায় এবং তারা অত্যন্ত অপমানিত হয়ে ফিরে আসে। এতে বিরি সম্প্রদায়ের লোকজন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এই শপথ গ্রহণ করে যে বিরি সম্প্রদায়ের আর কোন মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখা হবে না।"

কিম্বদন্তী অথবা লোকশ্রুতির সত্য মিথ্যা যাচাই করা অসম্ভব। তবে এ কথা নিতান্ত মিথ্যা নয় যে, এই কাহিনীর ভিত্তিতেই বিরি সম্প্রদায় শেষ পর্যন্ত "কোরী-মারা"য় পরিণত হয়। শিশুকন্যা হত্যার ব্যাপারটি এত সহজ হয়ে ওঠে যে, এডওয়ার্ডস সাহেবের জনৈক সংবাদদাতা (informer) নিতান্ত তুচ্ছ ভাবে মন্তব্য করেছিল "You see, sir, they are but poor little things and a puff of wind puts them out।"

রেভারেণ্ড জন কর্ম্যাক গুজরাট ও কচ্ছের রাজপুতদের ভিতর শিশুকন্যা হত্যার কথা উল্লেখ করেছেন ১৮১৫ সনে প্রকাশিত তাঁর *An Account of the Abolition of Female Infanticide in Gujrat* নামক সমীক্ষায়। এক্ষেত্রে তিনি ও কর্ণেল ওয়াকার একই কিম্বদন্তীর উল্লেখ করেছেন। গুজরাটের রাজার একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। তাঁর জন্য সুযোগ্য পাত্রের অন্বেষণে ব্যর্থ হয়ে রাজা অরক্ষণীয়া কন্যার কলঙ্ক থেকে মুক্তি

পাবার জন্যই তাকে হত্যা করবার নির্দেশ দেন এবং নিজের কৌমের অন্য সবাইকে অনুরূপ আদেশ পালন করতে বলেন।

রাইকস তাঁর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বর্ণনায় চৌহানদের মধ্যে শিশুকন্যা হত্যার পশ্চাদভূমি হিসেবে প্রচলিত একটি কিম্বদন্তী উল্লেখ করেছেন। চৌহানদের জনৈক রাজা তাঁর কন্যার বিবাহের পর জামাতার হাতে অত্যন্ত নিগ্রহ ভোগ করেন এবং ভবিষ্যতে অন্য কেউ যেন এ ধরণের নিগ্রহ ভোগ না করে তার জন্য তিনি তাঁর ছেলেদের ডেকে সমবেতভাবে একটি শপথ নেন যে, ভবিষ্যতে তাঁদের শিশুকন্যা মাত্রেই হত্যা করা হবে। ওয়ার্ড অনুরূপভাবেই শিশুকন্যা হত্যার কারণ বিবৃত করেছেন—'জনৈক ব্রাহ্মণ রাজপুত রাজার কাছে এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে কোন কন্যা সন্তান দ্বারা তাঁর রাজ্য ধ্বংস হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী যাতে সফল না হয় তার জন্য রাজা সমস্ত শিশুকন্যা হত্যার আদেশ দেন'।

এই সমস্ত কাহিনী ও কিম্বদন্তী পড়ে একথাই প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষে "pride, poverty are in league with superstition to perpetuate these horrors"।

দীর্ঘদিনের এবং বিভিন্ন রাজপুরুষের সমবেত চেষ্টায় এই কুপ্রথা রহিত হয়। সর্বপ্রথম সূচনা দেখা দেয় বাংলাদেশে। ১৮০২ সনের ৬নং রেগুলেশন অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রচলিত সাগরে শিশু উৎসর্গ নামক প্রথাটির উপর একটি ছেদ টানা হল। কারণ বাংলা সরকার স্থির নিশ্চয় হন যে, এই প্রথাটি "was not sanctioned by the Hindoo law, nor countenanced by the religious order or by the people at large, nor was it at any time authorized by the Hindoo or Mahomedan Governments of India."(১) (Preamble to Regulation VI of 1802)।

১) ১৮০২ সনে বঙ্গ সরকার সাগরে শিশু উৎসর্গের পিছনে কোন ধর্মীয় কারণ আছে কিনা তা অনুসন্ধানের ভার উইলিয়ম কেরীর উপর ন্যস্ত করেন। উইলিয়ম কেরী বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করে জানান যে, এই প্রথা সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় অনুশাসন নিরপেক্ষ।

পরে, ১৮৫৩ সনে পাঞ্জাবের বিচার বিভাগীয় কমিশনার আর. মন্টগোমারী পাঞ্জাব সরকারের কাছে শিশুহত্যার দুর্নীতি নিরোধ উদ্দেশ্যে কয়েকটি অনুমোদন পাঠান, যথা, "এই ধরণের হত্যাকার্যের সর্বতোভাবে সুতীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করা ; কৌমপ্রধানদের সমক্ষে এই কুপ্রথার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা ; শিশুহত্যা সম্বন্ধে সরকারকে যথাযথ তথ্য সরবরাহে গ্রাম বা অঞ্চল প্রধানদের উৎসাহিত করা ; শিশুপুত্র ও শিশুকন্যার জন্মের এক আদমসুমারীর ব্যবস্থা করা ; অমৃতসরের একশ মাইলের মধ্যে এই ধরণের শিশুহত্যায় নিযুক্ত যাবতীয় জাতি ও উপজাতি প্রধানদের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করা এবং পরিশেষে, সরকারী কর্মচারীদের আরো বেশী তথ্যজ্ঞ ও তৎপর হতে নির্দেশ দেওয়া"।

মন্টগোমারীর মতো উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কমিশনার জন লরেন্সও এই দুর্নীতি বন্ধ করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তাঁর মতে এই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন "a radical change in the feelings, the prejudices and the social customs of the people themselves."

শিশুহত্যা নিরোধ ব্যাপারে জন লরেন্স, রবার্ট মন্টগোমারী, চার্লস্ রাইকস্, জেমস টমসন, হেনরী এডোয়ার্ড প্রভৃতি রাজপুরুষদের আদি ও অকৃত্রিম আগ্রহ ও প্রচেষ্টা লর্ড ড্যালহৌসিকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। এঁদের প্রতি উপযুক্ত সমর্থন ও সহানুভূতি দেখাবার জন্যই ১৮৫৩ সনের ৮ই আগষ্ট তারিখে শিশুকন্যা হত্যা ও নিরোধ সম্পর্কে গভর্ণর জেনারেলের একটি 'মিনিট' প্রকাশিত হয়। লর্ড ড্যালহৌসি ঘোষণা করেন যে, শিশুহত্যার পিছনে, সামাজিক বা অর্থ নৈতিক, যে ধরণের কারণই বর্তমান থাকুক না কেন, শিশুকন্যা হত্যা—এই কার্যটি নিঃসন্দেহে অন্যান্য হত্যাকার্যের ন্যায় দণ্ডণীয় হবে।

এদেশে শিশুহত্যার সমাধি রচিত হল। কিন্তু সমসাময়িককালে ইংলণ্ডে যে শিশুহত্যা কাণ্ড অনুষ্ঠিত হত তা নৃশংসতা ও নির্মমতার দিক থেকে আরও বেশী করুণ। ইংলণ্ডের এই শিশুমেধ অত্যন্ত স্থির মস্তিষ্কে, লাভ ক্ষতির চুলচেরা বিচার করেই সংঘটিত হত। Bishop Heber বর্ণিত "pride in league with superstition' ধরণের কোন কারণ সেখানে বর্তমান ছিল না। ছিল অপরিসীম অর্থগৃধ্নুতার এক চরম রুচি বিকার এবং শাসনযন্ত্রের শৈথিল্য।

মাত্র একশ বছর আগেকার ইংলণ্ড ; কিন্তু কী আশ্চর্য সেখানকার দুর্নীতি এবং নির্মমতা। তদানীন্তন ম্যানচেষ্টার শহরে কোন শিশুর পক্ষে পাঁচ বছর বেঁচে থাকাটাই এক আশ্চর্য ব্যাপার মনে করা হত। শিশুদের সম্বন্ধে বাপ মায়ের ঔদাসীন্য এমনি চরমে পৌঁছয় যে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তার কোন সুযোগ নেওয়া হত না। নেশার জিনিস খাইয়ে শিশুদের ঘুম পাড়িয়ে রাখাটা রীতিমত একটি প্রথায় পরিণত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ইংলণ্ডে। Godfrey's mixture এবং "Quietness" প্রতিটি ডাক্তারখানায় কিনতে পাওয়া যেত। বড় শহরের অবস্থা সম্বন্ধে একটি তদন্ত কমিশনের কমিশনারের কাছে (Commissioner on the state of large Towns) ম্যানচেষ্টারের একজন ওষুধ বিক্রেতা স্বীকার করেন যে, তিনি প্রতি সপ্তাহে এক গ্যালন করে গডফ্রে মিকশ্চার ও পাঁচ ছয় গ্যালন করে 'Quietness' বিক্রি করেছেন।

এ ধরণের কাজ অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নেই কিন্তু শিশুমেধের সর্বাপেক্ষা করুণ ও নির্মম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সৎকার সমিতিগুলির (বেরিয়াল ক্লাব) মাধ্যমে শিশুর জীবন বিনিময়ে বাপ মায়ের অন্ত্যেষ্টি অর্থ (burial money) সংগ্রহ করার ব্যাপারে। ইংলণ্ডে তখন অসংখ্য সৎকার সমিতি। ছেলে মেয়ের অন্ত্যেষ্টি কার্যের জন্য বাপ মায়েরা এই সব সৎকার সমিতিতে অন্ত্যেষ্টি বীমা করে রাখতেন। যদিও অন্ত্যেষ্টি কার্যে ১।১½ পাউণ্ড খরচ ছিল, সৎকার সমিতিগুলি বীমাকারীদের মৃত্যু খরচ বাবদ ৪।৫ পাউণ্ড অবধি দিয়ে দিত। টাকা উপায়ের এই সহজ পন্থাটা বাপ মায়ের আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠল। তাঁরা ছেলে মেয়েদের, বিশেষ করে মেয়েদের কলে কৌশলে হত্যা করে এই অন্ত্যেষ্টি অর্থ আত্মসাৎ করত। ১৮৪৬ সনে লিভারপুল শহরের এক পরিবারে এক মাসের মধ্যেই তিনটি শিশুর মৃত্যু খবর পাওয়া যায় —৬ই মার্চ তারিখে ১০ মাসের সর্বকনিষ্ঠ শিশুটি, ২১শে মার্চ সাড়ে চার বছরের একটি এবং ২৭শে মার্চ আরেকটি। সন্দেহের অবকাশ থাকায় কবর খুঁড়ে মৃতদেহগুলো তোলা হল এবং দেখা গেল তিনজনকেই আর্সেনিক প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। লিভারপুল লীগ্যাল বেরিয়াল সোসাইটি স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, তারা প্রথম শিশুর মৃত্যু বাবদ ১পাউণ্ড ১৫ শিলিং এবং দ্বিতীয় ও

তৃতীয় শিশু বাবদ পাঁচ পাউণ্ড করে এদের অভিভাবকদের দিয়েছে। সেই বছরেই জনৈক জন রডা (John Rodda) তার শিশু পুত্রকে ঘনীভূত (concentrated) সালফিউরিক অ্যাসিড খাইয়ে মারবার চেষ্টা করে। ছেলেটির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়নি, অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে সে ধীরে ধীরে মারা যায়। জন রডা অবশ্য সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল এ ব্যাপারে কারণ সে মন্তব্য করে "he did not care when the child died as it was in a burial club and that he would get £ 2.10s।" তাছাড়া, সে তার আরও দুই পুত্রের সৎকার সমিতিকে নাম লিখিয়ে রেখেছিল এবং এদের বাবদ সে পাঁচ পাউণ্ড করে পাবে। Poor Law Unionগুলি বিনা পয়সায় ওষুধের ব্যবস্থা করত ; কিন্তু সৎকার সমিতির মাধ্যমে মুনাফা-শিকারী বাপ মায়েরা সে সুযোগ সুবিধাটুকুও গ্রহণ করতে চাইত না। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বাপ মায়ের এক জবাব ছিল "No, thank you, my child is in two burial clubs।" আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুকন্যারাই এই নিধন যজ্ঞের বলি হত—শিশুপুত্ররা রেহাই পেয়ে যেত। শুধু যে বিনা চিকিৎসায় কিম্বা বিষ প্রয়োগেই এদের হত্যা করা হত তা নয়, আরও বীভৎস উপায় ছিল। সৎকার সমিতিতে নাম লেখানো শিশুদের, বিশেষ করে ছোট মেয়েদের আগুনের চুল্লীর (unguarded fire place) কাছে একলা ঘরে রেখে বাপ মায়েরা বেরিয়ে যেত। প্রায়শঃ দেখা গেছে শিশুটি জামায় আগুন লেগে সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। আরও বহু উপায়ে হত্যাকাণ্ড সাধিত হত ; যেমন গলা টিপে, বাথ টবে ডুবিয়ে। ১৮৬০ সনে পার্লামেণ্টের একটি সিলেক্ট কমিটির কাছে ডারহামের জনৈক বিচারক এই মর্মে স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হন যে, "there are many murders committed we know nothing about"। বিচারক Chief Baron Pollock মন্তব্য করেন, "child murder for the sake of burial money prevailed to fearful extent." ১৮৬০ সনে করোনার বিল (Coroners Bill) পাশ হবার সময় বলা হয় "one could scarcely take up a newspaper without seeing a case of suspected or proved murder by poisoning।"

অন্ত্যেষ্টি অর্থ সংগ্রহ করবার আরও একটি সুচতুর পদ্ধতি ছিল শিশুর জন্ম গোপন করা। এই দুর্নীতি এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, ১৮৬৪ সনে ব্রিটিশ সরকার এই ধরণের জন্ম-গোপনকারী বাপমায়ের সন্ধান দাতাকে পুরস্কৃত করা হবে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু উনিশ শতকে খোদ ব্রিটেনে আইন এতই 'underdoveloped' ছিল যে, ১৮৪৫ সনে স্বরাষ্ট্র সচিব পার্লামেণ্টের কাছে অভিযোগ করেন যে, "one murderer had managed to dispose of more than twenty victims without a single inquest having been held।" কারণ inquest-এর খরচ বহন করতে সরকার রাজী ছিলেন না এবং ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসএর বিচারালয়গুলিতে (Quarter sessions) এই মর্মে নির্দেশ হয় যে, coroners should not be informed of cases of sudden death, except in extreme cases। ১৮৫৭ সনে ষোল মাসের একটি শিশুকে আগুনে ঝলসিয়ে মারার একটি মামলায় করোনার গ্রাণ্টারসায়ারের বিচারালয়ে inquestএর জন্য আবেদন করেন কিন্তু সে আবেদনটি অগ্রাহ্য হয়। Lord Campbell ও Lord Coleridge সম্বলিত বিচারকমণ্ডলী মন্তব্য করেন inquestএর ব্যাপারে বিচারকেরাই "proper persons"। সেই বছরেই East Ridingএর পুলিশ প্রধান পুলিশ মহলে এই নির্দেশ জারী করেন যে, "the coroner should not be called or informed in cases of more accidental death, such, as death, caused by falling from a house or from scaffolding or a building or infants overlaid in bed।"

এ সব জানার পর ঐতিহাসিক Chadwickএর মন্তব্যে "the clubs (burial clubs) provided a bounty on neglect and infanticide" বিস্মিত হবার কিছুই থাকে না।

শিশুমেধ এবং Burial clubএর মাধ্যমে অন্ত্যেষ্টি অর্থ সংগ্রহ করা এখন আর নেই। কিন্তু শিশুমেধ সেদেশে সমানেই চলেছে। এখনও প্রতি বছর ১,০০,০০০ মৃত্যু ডাক্তার না দেখেই certify করেন। পালিত শিশুর

মৃত্যু হলে করোনারকে জানাবার প্রয়োজন নেই—এই অভূতপূর্ব সংশোধন ১৯৫৮ সনে সাধিত হয়েছে। চিকিৎসক মহলে নতুন একটি উপসর্গ (battered baby syndoome) নিয়ে বর্তমানে জোর গবেষণা চলেছে যে কী মানসিক কারণে মানুষ সন্তানকে আছড়ে বা পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে। এবং এই battered babyর ঘটনাটি ক্রমবর্ধমান।

উনিশ শতকের ইংল্যাণ্ড ও উনিশ শতকের ভারতবর্ষের একটি তুলনামূলক সমালোচনায় ইংল্যাণ্ডকেই লর্ড ড্যালহৌসির ভাষায় অধিকতর barbarous মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ওয়াকারের এই মন্তব্য ঠিক নয় যে, "The extent to which this horrid practice (female infanticide) has been carried, affords melancholy picture of human nature and depravity. *The fact which would scarcely obtain credit among the more civilized nations of Europe,* (নিম্নরেখা বর্তমান প্রবন্ধকারের) is now established to demonstration" (Colonel Walkers Report on Infanticide in India, para 295)।

এবং "A custom as singular as barbarous and as contrary to the general feelings of parents and humanity as ever disgraced the history of man"-এর সত্যতাও আজ আর কোন ক্রমেই স্বীকার করা যায় না।

খাকসার অন্দোলনের ইতিহাস

অমলেন্দু দে

(পূর্বানুবৃত্তি)

লখ্‌নৌ ফ্রন্ট :—স্থাপিত হবার কয়েক বছরের মধ্যে খাকসার দল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। স্বভাবতই সরকারও সতর্ক হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সরকার এনায়তুল্লা খানকে পেশোয়ার জেলা থেকে চলে যাবার জন্য আদেশ জারী করে। প্রায় এক বছর সতর্কতার সংগে সংগঠন পরিচালনার পর ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি দিল্লীতে খাকসার শিবির স্থাপন করেন। তাতে প্রথমেই প্রায় তিনশত খাকসার সঙ্ঘবদ্ধ হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিভিন্ন খাকসার কেন্দ্রের সামরিক কুচকাওয়াজ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য তখনও খাকসারেরা কেবলমাত্র সেবামূলক কাজকর্মের সংগে যুক্ত ছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রাভী নদীর বন্যার সময় লাহোরের অধিবাসীরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে খাকসারেরা সকলের সেবা করে। এই সেবাপরায়ণ খাকসারদের প্রতি হিন্দু ও শিখ অধিবাসীরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।[১০]

ক্রমান্বয়ে খাকসার দল ধর্মীয় দাবী নিয়ে যেভাবে অগ্রসর হয় তার ফলে রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা সরকারের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাছাড়া প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় খাকসারদের সাথে অহ্‌রারদের সংঘর্ষ বাধে। এদের মধ্যে ছিল অহি-নকুল সম্পর্ক। খাকসার নেতা অহ্‌রারদের উদ্দেশ্য করেই 'পোলাওভোজী নেতৃবৃন্দ', 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন অপদার্থ' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এনায়তুল্লা পাঞ্জাব ও সিন্ধু সরকারের নিকট কয়েকটি দাবী পেশ করেন। তাতে বলা হয় : (ক) ইসলামের বাণী প্রচার করবার জন্য খাকসারদের পরিচালনাধীন একটি বেতার প্রতিষ্ঠান রাখতে দিতে হবে, (খ) সমস্ত মুসলমানকে 'জাকাৎ' (ঐচ্ছিমিক জনহিতকর বাধ্যতামূলক দান) দিতে বাধ্য করতে হবে, (গ) মুসলমানদের দানে পরিচালিত ঐসলামিক প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ খাকসারদের তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং (ঘ) সরকারী কর্মচারীদের

খাকসারদলের সদস্য হবার অধিকার স্বীকার করতে হবে।[১১] এই দাবী দিয়ে খাকসার দল আন্দোলন আরম্ভ করে। তারা খুব সংগঠিত ভাবে প্রচারকার্য-চালায়। এই দাবী না মানলে মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করবার হুমকী দেওয়া হয়।

খাকসার দলের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ব্যবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ হিন্দু ও শিখ সদস্য এই দাবী সমর্থন করে, তবে মুসলমান সদস্যগণ এই সুযোগ গ্রহণে মোটেই উদ্যোগী হয়নি। তাই এনায়তুল্লা এই দাবী আদায় করতে ব্যর্থ হন। দলের মুখপত্র 'আল-ইসলাহ' পত্রিকায় সমর্থনকারী সদস্যদের কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু শ্রীগোপীনাথ শ্রীবাস্তব (উত্তর প্রদেশ সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী) লেখেন: "We do not know what action the Punjab Govt. took in this matter but if we are to trust the Allama, once at least, the Punjab Govt. was alleged by the Allama himself to have agreed to the lifting of the ban on Govt. officials and consider the second demand." [১২]

তারপর ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে খাকসার দল আর একটি চরমপত্র উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে দেয়। তাতে বলা হয়, তিনি যদি খাকসারদের বিরুদ্ধাচরণ করার নীতি পরিহার না করেন, তাহলে তাঁকে ভয়াবহ পরিণতি জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

১৯৩৭-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে খাকসার আন্দোলন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়। তখন নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। উত্তর প্রদেশ, সিন্ধু ও পাঞ্জাবে খাকসারদের শক্ত ঘাঁটি থাকায় প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাকে খাকসার সমস্যা নিয়ে বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস সরকার জনসেবামূলক কাজের জন্য খাকসারদের সম্পর্কে উদার নীতি অবলম্বন করে।

তাই সেখানে তাদের প্রভাব বৃদ্ধির দিক থেকে বিশেষ কোন অসুবিধা ছিল না। অবশ্য প্রথম দিকে তারা আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেনি। উত্তর

প্রদেশে খাকসারদের প্রধান কেন্দ্র ছিল ভারিয়াচ নামক স্থানে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় খাকসার দলের সদস্য ছিল ৪২৬৯।৭০ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে লখ্‌নৌ শহরে 'তাবারা' ও 'মাধে সাহাবা' নিয়ে শিয়া ও সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই বিরোধের প্রকৃত কারণ জানতে হলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শিয়া-সুন্নী সম্পর্ক আলোচনা করা দরকার। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই বিরোধ চলে আসছে। আর এর কোন স্থায়ী সমাধান কখনই হয়নি। শিয়া সম্প্রদায় 'তাবারা' গান করবার রীতিকে তাদের ধর্মানুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করত। তাই যে কোন আত্মত্যাগের বিনিময়ে তারা এই অধিকার বজায় রাখার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। লখ্‌নৌ শিয়াদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। অন্যদিকে সুন্নী সম্প্রদায় প্রকাশ্যে 'মাধে-সাহেবা' আবৃত্তি করাকে তাদের ধর্মীয় অধিকার বলে মনে করে। তাতে শিয়া সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়। উভয় সম্প্রদায় নিজ নিজ পদ্ধতি বজায় রাখতে এতটা দৃঢ়তা ও ক্রমান্বয়ে উগ্রতা প্রকাশ করে যে, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ উত্তর প্রদেশের রাজনীতিকে অত্যন্ত জটিল করে তোলে। ধর্মীয় অধিকার বজায় রাখতে গিয়ে ছয় হাজারেরও বেশী শিয়া বন্দী হয়। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার লখ্‌নৌ শহরে ১৪৪ ধারা এবং কারফিউ জারী করে শহরের বিভিন্ন জায়গায় সশস্ত্ররক্ষী নিযুক্ত করে। স্বভাবতই সেখানকার অধিবাসীরা উদ্বেগের মধ্যে দিনযাপন করে। কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের নির্দেশে মৌলানা আবুল কালাম লখ্‌নৌ শহরে এসে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের সংগে সাক্ষাৎ করেন। তাঁকে কয়েক-বার সেখানে যাতায়াত করতে হয়। দীর্ঘ সময় কংগ্রেস এই সমস্যা নিয়ে বিব্রত ছিল। এমনকি মুসলীম লীগের পক্ষেও সম্ভব হয়নি এর মীমাংসা করা। এম, এ, জিন্না উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের এই বলে সতর্ক করেন যে, মুসলমানদের শত্রুরা শিয়া-সুন্নী বিরোধ নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। কিন্তু মুসলিম লীগ কেন এই সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হল তার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা জিন্না বা লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছে পাওয়া যায় না। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয়তে এই ব্যর্থতার জন্য মুসলিম লীগের সমালোচনা করা

হয়েছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলিম লীগ এই বিরোধকে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে সমালোচনার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। মুসলিম লীগের নেতা স্যার মহম্মদ ইয়াকুব শিয়া-সুন্নী বিরোধের জন্য কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে দায়ী করেন। এ কথাও বলা হয়, কংগ্রেসের মুসলমান মন্ত্রীরা পর্যন্ত শান্তি রক্ষার্থে তৎপর হননি। কিন্তু এ অভিযোগ যথার্থ বলে গ্রহণ করা যায় না। কারণ কংগ্রেস মন্ত্রীসভা যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে শিয়া-সুন্নী বিরোধ মীমাংসার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আজাদ এবং অন্যান্য সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আন্তরিকতার সংগে উত্তর প্রদেশকে এই বিরোধ থেকে মুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তবুও মন্ত্রীসভার কিছু ত্রুটি চোখে পড়ে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয়তে উত্তর প্রদেশ সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কে যে উক্তি করা হয়, তা লক্ষণীয়ঃ "The U. P. Govt. ought not to have disregarded the advice of the Allsopp Committee which distinctly advised the Govt· not to depart from the convention which had held good for more than 32 years and allow the Sunnis to publicly recite 'Madh-e-Saheba', a right whose excuse is unknown in any one of the Islamic countries. They ought not to have yielded tothe pressure of those Sunni agitators who were anxious to outrage the feelings of the Shias although they were their brethren in faith. Even now we do not understand why the Government of Mr. Govind Ballav Pant is being deterred from doing justice to the Shias. They ought to cancel their communique of March 31, once again adopt a neutral attitude in the matter and maintain the status quo as it existed before the notification।" 'অমৃতবাজার পত্রিকা' খুব পরিষ্কার করেই বলেছেন যে, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে এ সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হতে পারেননি।

শিয়া-সুন্নী বিরোধ খুব জটিল রূপ ধারণ করায় খাকসার দল হস্তক্ষেপ করতে সুযোগ পায়। এই বিরোধ মীমাংসার জন্য খাকসার দল এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন লাহোরের 'আল্ ইসলাহ্' পত্রিকায় প্রথম এই বিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তাতে বলা হয়, যারা এই বিরোধে অংশ গ্রহণ করছে কোরাণের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের মৃত্যু দণ্ড দেওয়া দরকার। আর শিয়া-সুন্নীরা যদি এক পক্ষকালের মধ্যে আপোষ মীমাংসায় পৌঁছুতে না পারে তাহলে খাকসার দল এই দুই সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। আল্লামা মশরেকী কর্তৃক উল্লিখিত প্রতি সম্প্রদায়ের তিনজন করে নেতাকে শাস্তি দেবার কথা ঘোষণা করা হয়। খাকসার দলের হস্তক্ষেপ সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। অহ্‌রর্ দল ও মুসলিম ইয়ুথ লীগ খাকসারদের বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। এই উদ্দেশ্যে আগ্রা থেকে কিছুসংখ্যক মুসলমান লখ্‌নৌ অভিমুখে যায়। ৩০শে জুন 'আল্ ইস্‌লাহ্' পত্রিকায় এ কথা ঘোষণা করা হয় যে, খাকসারেরা লখ্‌নৌতে গিয়ে 'বিশ্বাসঘাতকদের নরকের অগ্নিকুণ্ডে' নিক্ষেপ করবে এবং তারা শুধু নেতার নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। ২১শে জুলাই 'আল্ ইস্‌লাহ্' পত্রিকায় আরও পরিষ্কার ভাবে তাদের আক্রমণাত্মক মনোভাব ব্যক্ত করা হয়। ৪ঠা আগষ্টের সংখ্যায় আল্লামা মশরেকী 'রক্ত এবং আগুনে'র মাধ্যমে শিয়া-সুন্নী বিরোধ মীমাংসার কথা বলেন। অবশেষে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট ভারিয়াচ-এর খাকসার নেতার বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয় এক হাজার খাকসার 'রক্ত ও আগুন' নিয়ে খেলা করবার জন্য লখ্‌নৌর পথে যাত্রা করেছে। খাকসার দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আল্লামা মশরেকী ৭ই আগষ্ট উত্তর প্রদেশ সরকারকে যে টেলিগ্রাম পাঠান, তাতে বলা হয় : **"Orders 3000 Khaksars issuing, forcible Settlement Lucknow dispute. Ready co-operation Government provided reasonable conditions acceptable Shia-Sunni offered. Please wire intentions."** কিন্তু উত্তর প্রদেশ সরকার এই টেলিগ্রামের কোন উত্তর পাঠায়নি। পুনরায় খাকসার দল অনেকটা নরম ভাষায় সরকারকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তারা যে কোন পন্থা অবলম্বন করে শিয়া-

সুন্নী বিরোধ মীমাংসা করবার জন্য বদ্ধপরিকর। উত্তর প্রদেশ সরকারের কাছে এই দ্বিতীয় বার্তার ভাষা প্রথমটার মত আপত্তিজনক মনে না হওয়ায় তারা খাকসার দলের কাছে নিম্নোক্ত উত্তর পাঠায় : "The United Provinces Government is itself desirous of ending this dispute at earliest possible moment and if the Punjabis had not interferred in it, it would have already been ended. Government accepts the co-operation of all organisations in this connexion so long as the methods adopted to end the Shia-Sunni dispute are peaceful and within legal limits." উত্তর প্রদেশ সরকার একথাও আল্লামা মশরেকীর কাছে জানতে চায় যে, 'আল্ ইস্লাহ' পত্রিকায় শিয়া-সুন্নী বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ব্যক্তিকে হত্যা করবার যে ভীতি প্রদর্শন করা হয় তা তার পক্ষ থেকে করা হয়েছে কিনা, অথবা এ সংবাদের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করছেন কিনা। কিন্তু আল্লামা মশরেকী সরকারকে কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নি। কয়েকদিনের মধ্যেই (১৮ই আগষ্ট) 'আল্ ইস্লাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বলা হয়, খাকসারেরা উত্তর প্রদেশ সরকারকে ধ্বংস করবে এবং শিয়া-সুন্নী নেতাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করবে। উত্তর প্রদেশ সরকারের সংগে যুদ্ধ করবার জন্য শিয়া-সুন্নীদের মধ্যে মতৈক্য গড়ে তোলার প্রয়োজনীতার কথাও আল্লামা মশরেকী এ প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরই আল্লামা মশরেকী খাকসারদের লখ্নৌ অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। এই অভিযানে যে সব খাকসারেরা অংশ গ্রহণ করে তারা সকলেই পাঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান ছিল। সরকার লখ্নৌ শহরে ১৪৪ ধারা জারী করে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট খাকসারদের জানিয়ে দেন যে, ১৪৪ ধারা থাকায় সরকার খাকসারদের বেল্চা নিয়ে সামরিক পোষাক পরে শহরের রাস্তায় কুচকাওয়াজ করতে দেবে না। স্থানীয় খাকসার নেতা ওয়াহিদ্উদ্দিন হায়দার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশ মেনে নেন। এই ঘটনায় আল্লামা মশরেকী এতটা ক্ষুব্ধ হন যে, তিনি খাকসার দলের নীতি অনুযায়ী ওয়াহিদ্উদ্দিন হায়দারকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করবার নির্দেশ দেন। এর

ফলে সরকারের সংগে খাকসারদের বিরোধের সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হয়।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট আল্লামা মশরেকী অন্যান্য সংগীদের নিয়ে লখ্‌নৌতে আসেন। তখন থেকেই অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। শিয়া-সুন্নী বিরোধ মীমাংসায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সযত্ন প্রচেষ্টা গুরুতর বাধার সম্মুখীন হয়। সেখানে বিভিন্ন সভায় আল্লামা মশরেকী উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দেন। শিয়া-সুন্নীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আহ্বান জানান। তিনি ঐ সব ব্যক্তিদের নানা ভাবে নির্যাতন, এমন কি হত্যা করবার নির্দেশ দেন। খাকসারেরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে নেতার আদেশ পালন করতে আরম্ভ করে ; তার ফলে কয়েকজন ব্যক্তি তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত হয়। অবশ্য কেউ নিহত হয়নি। স্থানীয় একটি উর্দ্দু কাগজের সম্পাদককে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। ঐ কাগজের একটি যুবক ফেরীওয়ালা নিদারুনভাবে খাকসারদের দ্বারা প্রহৃত হয়। কারণ ঐ কাগজে তীব্র ভাষায় আল্লামা মশরেকীর সমালোচনা করা হয়। তারা আরও কয়েকজন মুসলমানকে বেলচা দিয়ে আক্রমণ করে। এই সব সাফল্যে আল্লামা মশরেকী খুবই খুশি হন এবং সংবাদপত্রের জন্য প্রস্তুত এক বিবৃতিতে বলেন : We do believe in violence. Non-voilent people must be stamped out from the face of the world. Non-violence is unnatural।" কিন্তু উত্তর প্রদেশের কোন খবরের কাগজ এই বিবৃতি প্রকাশ করতে সম্মত হয়নি। উত্তর প্রদেশের কার্যকরী মুখ্যমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রীর অবর্তমানে) রফি আহ্‌মদ্‌ কিদোয়াই-এর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, খাকসারদের আক্রমণাত্মক কার্যবলীর ফলে লখ্‌নৌ শহরে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং একটি জায়গায় স্থানীয় মুসলমানেরা তাদের আক্রমণ পর্যন্ত করে। এই অবস্থায় সরকার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয় এবং লখ্‌নৌ শহরে খাকসারদের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে। তাছাড়া উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় খাকসারদের সম্পর্কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। কয়েকজন খাকসারকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং শাস্তি দেওয়া হয়।

তখন আল্লামা মশরেকী সরকারের নিকট কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেন।

তাতে বলা হয়—(ক) খাকসারদের সামরিক কুচকওয়াজ ও বেলচা ব্যবহার করতে দিতে হবে, (খ) খাকসারদের সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে, এবং (গ) অভিযুক্ত খাকসারদের উপর থেকে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। উত্তর প্রদেশ সরকার এ দাবী মেনে নেয়নি। আল্লামা মশরেকী তখন ঘোষণা করেন যে, তাঁর দাবী না মানা পর্যন্ত তিনি লখ্‌নৌতে থাকবেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ও ৩১শে আগষ্ট লখ্‌নৌ শহরে খাকসার ও স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ ঘটনায় শহরের অধিবাসীরা উদ্বিগ্ন হয়। স্বভাবতই স্থানীয় সরকারের পক্ষে নিঃশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রে আল্লামা মশরেকী ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সংগে সংগে আগন্তুক খাকসারদের ব্যবহারে পরিবর্তন দেখা যায়। তারা নিজ নিজ প্রদেশে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং সরকারকে বিনা ভাড়ায় যাবার ব্যবস্থা অথবা টিকিটের ব্যবস্থা করতে বলে। সরকার এ ধরণের খবর পান যে, আল্লামা মশরেকী নিজেও লখ্‌নৌ শহর পরিত্যাগ করবেন যদি সরকার তাঁর নিজের ও অনুগতদের জন্য বিশেষ রেলগাড়ীর ব্যবস্থা করে। যেহেতু কংগ্রেস সরকার মন্ত্রীদের জন্যও দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত অন্য কোন ব্যবস্থা করে না, তাই খাকসার নেতার এই দাবী তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত খাকসারেরা লখ্‌নৌ শহর পরিত্যাগ করবার জন্য রেল স্টেশনে আসে এবং ট্রেনেও চড়ে বসে। যখন ট্রেন চলতে শুরু করে তখন হঠাৎ খাকসারেরা ট্রেনের শিকল টানে, কামরা থেকে লাফিয়ে বাইরে পড়ে এবং পুলিশকে আক্রমণ করে। খাকসারদের এই ধরনের আচরণের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে কারাগারের অভ্যন্তরে আল্লামা মশরেকীর মতের পরিবর্তন ঘটে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর দুজন বে-সরকারী ভদ্রলোক কারাগারে তাঁর সংগে দেখা করতে গেলে তাঁদের কাছে তিনি লিখিত বিবৃতি দেন যে, তাঁর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে এক বছরের মধ্যে তিনি অথবা অন্য প্রদেশ থেকে খাকসারেরা উত্তর প্রদেশে প্রবেশ করবে না। এমনকি উত্তর প্রদেশের খাকসারেরাও লখ্‌নৌর শিয়া-সুন্নী বিরোধে হস্তক্ষেপ করবে না।

যখন ঐ দুজন বে-সরকারী ভদ্রলোক এই চিঠি উত্তর প্রদেশ সরকারকে

দেখায় তখন সরকার আল্লামা মশরেকী ও অন্যান্য বন্দী খাকসার নেতাদের কাছ থেকে নিয়মসঙ্গত অঙ্গীকার পত্র দাবী করেন। অবশ্য তা দিতেও তাঁরা সম্মত হন। ২রা সেপ্টেম্বর সরকারী কর্মচারীদের উপস্থিতিতে পৃথক ভাবে আল্লামা মশরেকী এবং অন্যান্য খাকসার নেতৃবৃন্দ দুটি অঙ্গীকার পত্র লিখে দেন। আল্লামা মশরেকী স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্র নিম্নরূপ ছিল: "I herby give an undertaking that for a year after the date of the withdrawal of the notice under section 107, I will neither enter the U. P. nor permit or order batches of Khaksars from any other province to enter the United Provinces. Khaksars of the United provinces will be instructed not to interfere in the Lucknow Shia-Sunni dispute. I give this letter to the chief Secretary to Government for his assurance."

অন্যান্য খাকসার নেতৃবৃন্দ কর্তৃক স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্রও এখানে তুলে দিচ্ছি: "We, the persons whose signatures are affixed below, promise and undertake that if the U. P. Govt. withdraw the case under Section 107 cr. P. C. instituted against us we would immediately return to our province and would not interfere in any way in the affairs of the United Provinces for a year from date."

এ দুটি অঙ্গীকার পত্র লেখা ও স্বাক্ষর দেবার সময় কারাগারের অফিসারেরা ছাড়াও কে. বি. হাফিজ আহমদ হোসেন, এম এল. সি সৈয়দ ওয়াজিদ হোসেন রিজভি এবং কর্ণেল জাফ্‌রি প্রভৃতি ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। এই অঙ্গীকার পত্র পাঠের পরই সরকার আল্লামা মশরেকী ও তাঁর সহকর্মীদের মুক্তি দেন এবং তাঁদের ট্রেনের কামরায় বসিয়ে দেন। ট্রেন চলতে সুরু করে, এমন কি মালিহাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছে। হঠাৎ সেখানে আল্লামা মশরেকী ট্রেন থেকে নেমে পড়েন এবং অন্য ট্রেনে লখ্‌নৌ ফিরতে চেষ্টা করেন। তখনও পুলিশ লখ্‌নৌ ষ্টেশনে অন্যান্য খাকসারদের ফেরত

পাঠাবার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিল। আল্লামা মশরেকী লখ্‌নৌ ষ্টেশনে এসে পুলিশ দেখে হরদই গামী তৃতীয় ট্রেনে চড়ে বসেন এবং সাউদিলা ষ্টেশনে নেমে পড়েন। এইভাবে পুলিশের সংগে লুকোচুরী খেলবার পর অবশেষে আল্লামা মশরেকী দিল্লীগামী ট্রেনে চড়েন।

অঙ্গীকার পত্র লিখে দেওয়ায় তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। তাই উত্তর প্রদেশ পরিত্যাগ করার পর তিনি এক বিবৃতিতে বলেন যে, তাঁকে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তিনি কোন অঙ্গীকার পত্র লিখে দেননি। যে অঙ্গীকার পত্রের কথা সরকার বলছে তা জাল করা হয়েছে। এমন কি লখ্‌নৌর ঘটনাকে তিনি নিজের মত করে বিবৃত করেন। আল্লামা মশরেকীর এই বিবৃতি দিল্লী ও লাহোরের পত্রিকায় এবং 'আল-ইসলাহ'তে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই বিবৃতি খাকসারদের ও তাঁর নিজের সম্মান বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ করে। আল্লামা মশরেকী একথাও ঘোষণা করেন, পুনরায় তিনি লখ্‌নৌ শহরে যাবেন। তাঁর সহকর্মীরা উত্তর প্রদেশ থেকে চলে যাবার পর সরকারকে ভীত সন্ত্রস্ত করবার জন্য অনেক টেলিগ্রাম পাঠায়। তাঁরা ভেবেছিলেন, এইভাবে হয়তো খাকসার দলের প্রভাব বজায় রাখা সম্ভব হবে। তাই তিনি দ্বিতীয়বার লখ্‌নৌ অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এইভাবে খাকসারদের লখ্‌নৌ পরিত্যাগের অল্পদিনের মধ্যেই অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৪৪ ধারা অমান্য করবার জন্য উত্তর প্রদেশ সরকার আল্লামা মশরেকী ও তাঁর ছয়জন সহকর্মীকে মালিহাবাদ ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর জ্যোতিপ্রসাদ সেন্ট্রাল জেলে আল্লামা মশরেকীর এবং ডিস্ট্রিক্ট জেলে অন্যান্য ছয়জনের বিচার করেন। অভিযুক্তরা দোষ স্বীকার করেন এবং সাত জনকেই শাস্তি দেওয়া হয়। আল্লামা মশরেকীকে একমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে আরও এক সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যান্য পাঁচজন অভিযুক্তকে—মিঞা অহমদ শাহ, বারিষ্টার ও রেড শার্ট অন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, হবিবুল্লা খান এডভোকেট ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আইন সভার প্রাক্তন ডেপুটি

স্পীকার, আরস্তব শেরখান, সীমান্তের প্রধান, মুহম্মদ আক্রাম খান, হাজারার রয়স এবং আবদুল্লা খান, এডভোকেট প্রভৃতিকে—১০ টাকা করে জরিমানা অথবা অনাদায়ে কোর্ট বসাকালীন সময়ের জন্য কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়। রাজা সরফরাজ খানকে মৃদু ভৎর্সনা করে Section 3 of the First offenders Act অনুযায়ী ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই গ্রেপ্তারের খবরে খাকসারেরা উত্তেজিত হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই বহু সংখ্যক খাকসার দলে দলে উত্তর প্রদেশে প্রবেশ করে। কোন কোন দলে ৩০০ থেকে ৫০০ খাকসার ছিল।[৭৫] এদের মধ্যে বেশীর ভাগই আসে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব থেকে। খাকসারেরা সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করবে ও শান্তি ভঙ্গ করবে এ ধরণের খবর সরকার পায়। খুবই তৎপরতার সঙ্গে উত্তর-প্রদেশ সরকার বিভিন্ন জেলা-শাসককে খাকসারদের কার্যাবলীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করতে নির্দেশ দেন। একথাও বলা হয় যে, কোন জেলায় যদি খাকসারেরা শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করে তাহলে তাদের উপর থেকে যেন নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। খাকসারদের মধ্যে অনেকে গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য মসজিদে আশ্রয় নেয়। ২৯শে সেপ্টেম্বর দু জায়গায়—আমিনাবাদ ও চরবাগ রেলওয়ে স্টেশন—খাকসার-পুলিশ সংঘর্ষ হয়। খবরে প্রকাশ, পুলিশ ১৮ জন খাকসারকে আমিনাবাদে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে কয়েকজন কিছুদিন কাসিয়াবরা মসজিদে ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অনুযায়ী পুলিশ তাদের বেলচা পরিত্যাগ করতে বলে। কিন্তু ধৃত খাকসারেরা বেলচা পরিত্যাগ করতে অথবা পুলিশ ভ্যানে উঠতে সম্মত হয় না। তখন তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। বলা হয় যে, খাকসারেরা বেলচা দিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে এবং পুলিশ আত্মরক্ষার্থে লাঠি চার্জ করে। এই সংঘর্ষে দুজন পুলিশ সাব-ইন্‌স্পেক্টর, চারজন কনষ্টবল ও কয়েকজন খাকসার আহত হয়। পরে অবশ্য খাকসারেরা পুলিশের আদেশ মেনে 'লক-আপে' যায়।[৭৬]

চরবাগ স্টেশনে পুলিশ ৯জন খাকসারকে গ্রেপ্তার করে। এরা ট্রেনে করে সেখানে আসে এবং লখ্‌নৌ শহরে ঢুকতে চেষ্টা করে। পুলিশের নির্দেশ

সত্ত্বেও তারা বেলচা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করায় যে সংঘর্ষ হয় তাতে তিনজন কনষ্টবল আহত হয়। পুনরায় ওরা অক্টোবর চরবাগ রেল ষ্টেশনে একই কারণে খাকসার পুলিশে সংঘর্ষের ফলে পাঁচজন খাকসার ও চারজন কনষ্টবল আহত হয়।

আরও কয়েকটি জায়গায় খাকসার পুলিশ সংঘর্ষ হয়। খাকসারদের দমন করবার জন্য কোথাও কোথাও মিলিটারী পর্যন্ত নিয়োগ করতে হয়। কারণ খাকসারেরা এত বলবান ছিল যে, সাধারণ পুলিশের পক্ষে তাদের দমন করা সম্ভব ছিল না। এর মধ্যে বুলান্দশহর জেলে খাকসার-পুলিশ সংঘর্ষ গুরুতর আকার ধারণ করে। সরকারী বিবরণ থেকে জানা যায়, প্রায় তিনশত খাকসারের একটি বড় জাঠা ৪ঠা অক্টোবর বুলান্দশহর জেলায় প্রবেশ করে। অবস্থা আয়ত্তে আনবার জন্যে একদল অশ্বারোহী সৈন্য পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করে। বুলান্দশহর জেলার খুরজার নিকটে ৮ই অক্টোবর সকালে খাকসারেরা এদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই খাকসারেরা দিল্লী প্রদেশ থেকে এসেছিল। পুলিশ তাদের লরী করে বুলান্দসহরে নিয়ে আসে বুলান্দশহর জেলে রাখবার জন্য। তারপর খাকসারদের দিল্লীতে ফেরৎ পাঠাবার পরিকল্পনাও সরকারের ছিল। ঐ দিন ৯-৩০ মিঃ সময়ে আসার পর খাকসারদের প্রথমদফা শান্তভাবেই জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কিন্তু দ্বিতীয় দলকে জেলের মধ্যে ঢুকবার কথা বলার সংগে সংগে তারা আপত্তি জানায় এবং সজোরে বেলচা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে থাকে। তারা মারমুখী হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় কয়েকজন খাকসার বেলচা ঘোরাতে ঘোরাতে প্রধান রাস্তা ধরে চলতে সুরু করে। দ্রুতবেগে পুলিশ প্রধান রাস্তায় আসে এবং জেলের চত্বরে যেখানে লরী থেকে নেমে খাকসারেরা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে কর্ডন করে পুলিশ ঘিরে থাকে। খাকসারেরা জোর করে প্রধান রাস্তার দিকে যাবার চেষ্টা করলে পুলিশ গুলি চালায়। তার ফলে একজন খাকসার নিহত ও ১৪ জন আহত হয়। ৮জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়। একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট আহত হয়। গুলী চালানোর ফলে অবস্থা দ্রুত আয়ত্তে আসে এবং খাকসারেরা বিনাবাধায় জেলে প্রবেশ করে। মীরাটের কমিশনার বেলা দুটোর সময়

বুলান্দশহরে আসেন এবং ঘটনার তদন্তের প্রয়োজনে রাত দশটা পর্যন্ত সেখানে থাকেন। কিন্তু উত্তর প্রদেশ সরকার প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করে। তাই মীরাটের কমিশনারকে আর তদন্তের দায়িত্ব নিতে হয়নি। যে সব খাকসারেরা বুলান্দশহর জেলে ছিল তাদের ৯ই অক্টোবর মীরাট জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এই হল বুলান্দ-শহরে পুলিশের গুলিচালনা সম্পর্কে সরকারী বিবরণ।

বুলান্দশহরে গুলী চালনায় নিহত পাঁচজন খাকসারই ছিল পাঞ্জাবের অধিবাসী। তাঁদের মৃতদেহ আত্মীয় স্বজনদের দেবার জন্য উত্তর প্রদেশ সরকার লাহোরে প্রেরণের অনুমতি দেয়। ১০ই অক্টোবর এই মৃতদেহ লাহোরে পৌঁছুলে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।৭৭

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই অক্টোবর 'নাকাহিন্দোলা'-র কাছে খাকসার পুলিশ সংঘর্ষ হয়। সরকারী বিবরণে জানা যায়, প্রায় ৬০ জন খাকসার ট্রেণে লখ্‌নৌ জংশনে এসে নামে। তারা সকলেই বেলচা সহ সামরিক পোষাকে সজ্জিত ছিল। কারও কারও সংগে ছোরাও ছিল। পুলিশ তাদের ষ্টেশনে আবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হয়। তারা পুলিশ কর্ডন ভেদ করে শহরের দিকে যাত্রা করে। পুলিশ তাদের অনুসরণ করে এবং অবশেষে 'নাকাহিন্দোলা' নামক স্থানে তাদের গতিরোধ করতে সমর্থ হয়। খাকাসারেরা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। পুলিশের সংগে তাদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ লাঠি চার্জ করে। খাকসারেরা দৌড়ে নিকটবর্তী মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করে। ২০ জন পুলিশ আহত হয়। প্রায় ১৫জন খাকসার আহত হয়, এ সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। সরকারী সূত্রে জানা যায়, যারা আহত হয় তাদের লখ্‌নৌর সরকারী হাসপাতলে ভর্তি হবার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু মাত্র ৬ জন খাকসার চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যায়। সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট চার্লস এবং ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট অব পুলিশ অগ্নিবীর অবস্থা আয়ত্তে আনেন।

১৫ই অক্টোবর ১৪৪ ধারা অমান্যের অভিযোগে ১৩ জন খাকসারকে গ্রেপ্তার করা হয়। লখ্‌নৌর দিকে খাকসারদের অভিযান তখনও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। ২২শে অক্টোবর ১৪৪ ধারা অমান্যের জন্য ২১ জন খাকসারকে

গ্রেপ্তার করা হয়। এর মধ্যে ১৮ জন কানপুর থেকে এসেছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত খাকসার সমস্যা আইন সভার বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল। এই সময়ে খাকসারদের কার্যাবলীর উপর কেন্দ্রীয় সরকারেও প্রখর দৃষ্টি রাখে।

উত্তর প্রদেশের যেসব জেলা খাকসার আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল তা হল—সাহারাণপুর, মুজফ্‌ফরনগর, মীরাট, বুলান্দশহর, আলিগড়, কানপুর, লখ্‌নৌ, বেনারস, ভারিয়াচ, বিজনোর, বালিয়া, গোণ্ডা ও সীতাপুর। সরকারী সূত্রে জানা যায় যে, খাকসারেরা মীরাট, লখ্‌নৌ, বিজনোর ও বুলান্দশহর জেলায় পুলিশ বাহিনীকে আক্রমণ করে। যখন পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করে তখন তারা হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। এমনকি তারা দুজন পুলিশকে নদীতে নিক্ষেপ করে।[৭৮] অবশ্য তাহির হোসেন নামক আইন সভার একজন সদস্য নদীতে দুজন পুলিশকে নিক্ষেপ করা সম্পর্কে যোগাযোগ মন্ত্রীর বিবৃতি প্রমাণের জন্য আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় আইন সভায় খান বাহাদুর শেখ ফজল-ই হক্ পিরাছা বলেন, উত্তর প্রদেশে ২০,০০০ মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হয়, কয়েকশত আহত হয় এবং কয়েক হাজার পরিবার আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়।[৭৯]

উত্তর প্রদেশে খাকসার আন্দোলন আইন সভার ভেতর ও বাইরে উত্তেজনা ও বিতর্কের সৃষ্টি করে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর খাকসারদের প্রতি সরকারের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আইন সভায় জহিরুল হোসেন লারী এক মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন খাকসারদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার অর্থ হল ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা। সরকারী নীতির ফলেই সমস্ত প্রদেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। আহত খাকসারদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি খাকসারদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবী করেন। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সদস্য এইচ, জি, ওয়ালকোর্ড, ব্যারিষ্টার, মন্ত্রী সভাকে সমালোচনা করে বলেন, খাকসার আন্দোলন দমনে কংগ্রেস যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তাতে কংগ্রেস যে অহিংস সংগঠন নয় তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।[৮০] এইভাবে বিরোধীপক্ষ

কংগ্রেস মন্ত্রীসভার সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু এই প্রস্তাব মঞ্জুর করা সম্ভব হয়নি।

পুনরায় ২৭শে অক্টোবর বুলান্দশহর জেলে পুলিশের গুলী চালনা সম্পর্কে আইন সভায় আলোচনার জন্য মোহম্মদ শৌকত আলী খান নোটিশ দেন। এই প্রস্তাবের উপর দীর্ঘ সময় বিতর্ক চলে। যদিও সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়, সেসান জজ, মিঃ হাণ্টার এই ঘটনা সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য নিযুক্ত হয়েছেন। তাই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আলোচনা না হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু বিরোধী পক্ষ আলোচনা দাবী করেন। খাকসার ও মুসলমানেরা তদন্তে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এই অবস্থায় আইন সভায় আলোচনা হওয়া উচিত বলে বিরোধী পক্ষ মনে করে। সরকার পক্ষও আর আপত্তি জানায় নি।

মহম্মদ শৌকত আলী খান বলেন, ৮ই অক্টোবর গুলী চালনা অনিয়ন্ত্রিত আক্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ঘটনা স্থানীয় সরকারের আক্রমণাত্মক নীতির পরিচায়ক। মহম্মদ ইশাক খান সরকারকে সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, খাকসারেরা প্রথমে পুলিশকে আক্রমণ করেনি। তারা শুধু বেলচা দিয়ে মাটিতে আঘাত করছিল। বেকন নামক সার্জেন্ট, যিনি খাকসারদের বুলান্দশহর জেলে নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনিই এখবর তাঁকে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের উপর গুলী চালনার কি সঙ্গত কোন কারণ ছিল? কে এই গুলী চালনার আদেশ দেয়, তাও তিনি জানতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত তিনি কানপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, তাণ্ডা এবং মাউ অঞ্চলের গুলী চালনার কথাও উল্লেখ করেন। পরিশেষে তিনি এই অভিযোগ করেন, সরকার মুসলমানদের অধিকার হরণ করছে এবং তাদের ভাত সন্ত্রস্ত করার নীতি অনুসরণ করছে। মহম্মদ ইশাক খান খাকসারদের সম্পর্কে সরকারের নীতিকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ বলে ব্যাখ্যা করেন। আইনসভায় তিনি যে বিবৃতি দেন, তা এখানে তুলে ধরছি : "it is not a fact that the Muslims alone were the victims of the lawless acts of the upholder of law and order?...Sir, we have always been agitating here that the rights of the Muslims have been

trampled upon, that the Govt. has been sedulously trying to terrorize the Mussalmans of this Province."৮১ বেগম হবিবুল্লাহ এবং নবাব ডাঃ স্যার মহম্মদ সৈয়দ খান প্রস্তাবের স্বপক্ষে বলতে গিয়ে সরকারের সমালোচনা করেন।

স্যার জাওলা প্রসাদ শ্রীবাস্তব প্রস্তাবের সমর্থন করায় সরকারের পক্ষের বিদ্রূপের সম্মুখীন হন। খাকসারদের প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতি ছিল না। তাঁর মতে, খাকসার সম্পর্কে সরকারী নীতি পরিষ্কার নয় এবং বুলান্দশহরে পুলিশের গুলী চালনা সমর্থন করা যায় না। এই ধরণের আন্দোলন দমনে গুলী চালনার মত চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার তিনি পক্ষপাতী নন। সামান্য কারণে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ গুলী চালাচ্ছে। কয়েকদিন পূর্বে কানপুরে 'শান্তিপূর্ণ হিন্দু শোভাযাত্রার' উপর গুলী চালনার ফলে কয়েকজন নিহত ও আহত হয়। তিনি অভিযোগ করে বলেন যে, সরকার আইন সভায় একথাও বলেননি যে খাকসার আন্দোলন এই প্রদেশের পক্ষে বিপদের কারণ। কেবলমাত্র একথাই বলা হয়েছে, খাকসারেরা বেলচা নিয়ে চলাফেরা করে এবং বেলচা বিপজ্জনক। অবশ্য সরকার কর্তৃক তদন্তের ব্যবস্থা করায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। মুসলিম ও খাকসারেরা তদন্ত কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অসম্মত হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি ট্রাইবুন্যাল বসিয়ে এদের আস্থা অর্জ্জনের কথা বলেন।৮২

মনে রাখা দরকার, বেশীরভাগ বিরোধী সদস্য যাঁরা প্রস্তাবের পক্ষে অংশ গ্রহণ করেন, তাঁরা মুসলিম লীগের সংগে যুক্ত ছিলেন। আর তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে হেয় প্রতিপন্ন করা। ডাঃ শ্রীবাস্তব শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকার প্রবর্ত্তিত নীতি সমর্থন করেননি।

বিচার মন্ত্রী ডঃ কে, এন, কাটজু, যোগাযোগমন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম ও রাজস্বমন্ত্রী রফি আহমদ কিদোয়াই সরকারী নীতির স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ করেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, উত্তর প্রদেশ সরকার খাকসারদলকে ধ্বংস করতে অথবা তাদের ন্যায় সঙ্গত কাজকর্ম বন্ধ করতে চায়নি। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই সরকার অবলম্বন করে। কার্যকরী

মুখ্যমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থের অনুপস্থিতিতে) রফি আহমদ কিদোয়াই উত্তর প্রদেশে খাকসার আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে সেপ্টেম্বর যে বিবৃতি দেন তা থেকেই সরকারের মনোভাব পরিষ্কার বুঝা যায়। তিনি বলেন : "The Government have no intention to crush the Khaksar movement or to impose unnecessary restrictions on their legitimate activities. It is only when they claim a right to forcibly interfere in activities of the public or any section of the public or they exceed the limits of law that interference becomes necessary. In district where Khaksars are behaving properly, thre are no restrictions even to day." মহম্মদ শৌকত আলী খান উত্থাপিত প্রস্তাবের উপর বিতর্কের উত্তর দিতে গিয়ে যোগাযোগমন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম বলেন যে, সত্য ঘটনা মিঃ হাণ্টারের তদন্তের পর জানা যাবে। বিরোধী পক্ষের বক্তারা প্রকৃত ঘটনা বলেননি। বুলান্দশহর জেলে গুলী চালনা সম্পর্কে যোগাযোগমন্ত্রীর বিবৃতি এখানে দেওয়া হল : ৮ই অক্টোবর মিঃ বেকন নামক একজন সার্জেণ্ট খাকসারদের বুলান্দশহর জেলে নিয়ে আসবার জন্য নিযুক্ত হন। জেল গেটের সামনে পুলিশ ও খাকসারেরা লরী থেকে খোলা জায়গায় নেমে পড়ে। তিনি তখন সশস্ত্র ও নিরস্ত্র বাহিনী চারিদিকে মোতায়েন করেন। কোন গণ্ডগোল হবে এই আশঙ্কা তিনি করেননি। কিছুক্ষণ পর খাকসারেরা উত্তেজনা প্রকাশ করে। প্রায় ৪০জন খাকসার বেলচা নিয়ে সার্জেণ্টকে ঘিরে ধরে। কয়েকজন খাকসার শূন্যে বেলচা ঘুরাতে থাকে, আর কয়েকজন তাঁর গলার কাছে বেলচা তুলে ধরে। ইতিমধ্যে ৫০ বা ৬০ জন খাকসার জেল ওয়ার্ডারের কাছ থেকে দুটো বন্দুক ছিনিয়ে নেয় এবং পুলিশের দিকে লক্ষ্য করে গুলী করে। দুদিক থেকে জেল গেট খাকসারদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই অবস্থায় পুলিশ গুলী চালায়। অবশ্য যোগাযোগমন্ত্রী একথাও বলেন, মিঃ হাণ্টারের তদন্ত রিপোর্ট পাবার পূর্ব্বে কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়।

ডাঃ কে, এন, কাটজু বলেন : আইনসঙ্গতভাবে কাজ করলে কোন দল

বা পার্টির বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চায় না। ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকার অনেক কিছু করেছে। তা না হলে বিরোধীপক্ষের অনেক সদস্যই ১৪৩এ ধারা মতে অভিযুক্ত হতেন। গত ছ বছর ধরে তো তাঁরা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা ছড়াচ্ছেন। তাছাড়া কাউকে এ প্রদেশে প্রবেশ করতে বাধা দেবার ইচ্ছা সরকারের নেই। কিন্তু খাকসারদের ঘোষিত নীতি কি? তাদের উদ্দেশ্য হল হাজারে হাজারে লখ্‌নৌ অভিযানে অংশ গ্রহণ করে শহরের অধিবাসীদের সন্ত্রস্ত করা। প্রতিটি খাকসার বুলান্দশহর অথবা গাজিয়াবাদ জেলায় প্রবেশ করছে লখ্‌নৌ যাবার জন্যে। তারা তো সেখানে কোন শান্তিপূর্ণ কাজে যাচ্ছে না। তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল সরকার, শিয়া ও সুন্নীদের সন্ত্রস্ত করা। শিয়া-সুন্নী বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রয়োজন হলে হত্যাকাণ্ড করতে তারা প্রস্তুত। এ অবস্থায় সরকারের কাজকে নিন্দা করার অর্থ হল খাকসারদের এই সব কাজ করতে প্ররোচিত করা। অবশ্য অন্যায়ভাবে পুলিশ কাজ করলে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু এই সভা তো এমন কোন নীতি গ্রহণ করছে না যে, পুলিশ আত্মরক্ষার জন্য গুলী চালাবে না, অথবা আত্মরক্ষার জন্য গুলী চালালে পুলিশকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। অবশ্য বুলান্দশহরে গুলী চালনার প্রকৃত তথ্য আমরা জানি না। কারণ বিষয়টি তদন্ত কমিশনের বিবেচনাধীন রয়েছে। সুতরাং তদন্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই সঙ্গত। যাদের অভিযোগ রয়েছে তাদের মিঃ হাণ্টারের কাছে গিয়ে বক্তব্য পেশ করা উচিত। বিরোধী সদস্যরা যদি খাকসারদের অন্যায় আচরণের উদ্দেশে লখ্‌নৌ শহরে আগমন বন্ধ করতে পারেন, তবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবস্থা স্বাভাবিক হবে এইভাবে ডঃ কাটজু তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন।

[ক্রমশঃ]

পাদটীকা

১০। Hiralal Seth, The Khaksar Movement, p. 53 ;
ডাঃ কে. এন. ইসলাম, আমীর আল্লামা মশরেকী, পৃ ৬১।

১১। Amrita Bazar Patrika, Oct. 13, 1939 : ডাঃ কে. এন. ইসলাম আমীর আল্লামা মশরেকী, পৃ ৫৮-৫৭।

১২। Amrit Bazar Patrika, Oct. 13,1939.

১৩। Index to the Proceedings of the Legislative Assembly of the United Provinces, vol. 20, 1939, p. 186.

১৪। Ibid. Oct. 13, 1939.

১৫। R. Coupland, The Constitutional Problem in India, Part II, p. 131.

১৬। Amrita Bazar Patrika, Oct. 7, 1939.

১৭। Times of India, Oct. 12, 1939.

১৮। Index To the Proceedings of the Legislative Assembly of the United Provinces, vol. 21, 1939, p. 258.
Ibid, pp.258-259.

১৯। The Legislative Assembly Debates, vol III, 23rd Sept., 1942, pp.466-468.

৮০। Index To The Proceedings of the Legislative Assembly of the United Provinces. vol. 20, 1939, pp. 41-42

৮১। Ibid.

৮২। Ibid pp. 121-122.

ইতিহাস

সম্পাদক

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

নব পর্যায় দ্বিতীয় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা মাঘ-চৈত্র

ইতিহাস

[ত্রৈমাসিক পত্রিকা]

সম্পাদক

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক

অরুণকুমার দাশগুপ্ত

অমলেন্দু দে

শোভন বসু

ক্যালকাটা হিষ্টরিক্যাল সোসাইটি

৩৩/১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা আড়াই টাকা
বার্ষিক আট টাকা

ইতিহাস কার্যালয়
কাশিমবাজার হাউস
৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
অটো প্রিন্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯, বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা-৬

ইতিহাস বর্ষ ২ সংখ্যা ৪ মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কর্ণসুবর্ণ সুধীররঞ্জন দাস	২১৯
স্মৃতিকথা রমেশচন্দ্র মজুমদার	২৪৮
অবলুপ্তির পথে তিব্বত কল্যাণ কুমার চক্রবর্তী	২৫৬
চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ ও বন্দেমাতরম পত্রিকা কুনাল সিংহ	২৭১
মাদাম ডুপ্লেক্স অজিত নিয়োগী	২৭৭

নিবেদন

ইতিহাস পত্রিকার ২য় বর্ষ (নব পর্য্যায়) শেষ হইল। গ্রাহকগণকে আগামী বৎসরের চাঁদা (৮·০০ টাকা) পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ, কাশিমবাজার হাউস, ৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯—এই ঠিকানায় মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। অন্যথায় নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যা তাঁহাদের নামে ভিঃ পিঃ তে পাঠান হইবে। এই বিষয়ে গ্রাহকবর্গের সহযোগিতা আশা করিতেছি।

ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড | মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ | ৪র্থ সংখ্যা

কর্ণসুবর্ণ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কর্ণসুবর্ণের পুরাবৃত্ত

(খ) শশাঙ্ক ও উত্তর ভারত

(২৪)

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি অধিপতি প্রভাকরবর্ধন প্রথমে মগধের পরবর্তী-গুপ্ত নৃপতিগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। মগধের পরবর্তী-গুপ্ত নৃপতি মহাসেনগুপ্ত তাঁহার পুত্রদ্বয়, কুমার গুপ্ত ও মাধবগুপ্তকে, থানেশ্বরের রাজপ্রাসাদে রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের বাল্য সঙ্গী রূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের মতে প্রভাকরবর্ধন মালবরাজকেই (দেবগুপ্ত) তাঁহার পুত্রদ্বয়কে থানেশ্বরের রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী গুপ্ত নৃপতিগণের সহিত পুষ্যভূতিদিগের সৌহার্দ্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ঘটনাচক্রের আলোড়নে পুষ্যভূতি নৃপতি প্রভাকরবর্ধন কনৌজ-অধিপতি গ্রহবর্মার হস্তে স্বীয় কন্যা রাজ্যশ্রীকে সম্প্রদান করিয়া মৌখরিগণের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। পরবর্তী-গুপ্ত নৃপতিগণ উত্তর ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নিঃসহায় ও মিত্রশূন্য হইয়াছিলেন। তৎকালীন মালব-রাজ দেবগুপ্ত (সম্ভবতঃ পরবর্তী-গুপ্ত বংশজাত) এমতাবস্থায় কর্ণসুবর্ণ-রাজ শশাঙ্কের শরণাপন্ন হইয়া মৈত্রী স্থাপনের আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক বসাক মনে করেন যে, প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর সংবাদ কর্ণগোচর হইবার পরেই শশাঙ্ক উত্তর ভারতে স্বীয় আধিপত্য স্থাপনের

অভিপ্রায়ে মালব-রাজের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, কনৌজ অধিপতি গ্রহবর্মার মৃত্যুর পরেই মালব ও গৌড়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল। ঘটনা প্রবাহের আলোচনান্তে মনে হয় যে, নিঃসহায় মালবরাজই শশাঙ্কের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইবার অভিপ্রায় নিবেদন করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক নিশ্চয়ই মালবরাজের সহিত সন্ধি না করিয়া একাকী উত্তর ভারত সমরাভিযানে অগ্রসর হন নাই। অধ্যাপক বসাক অনন্তর বলিয়াছেন যে, গ্রহবর্মার মৃত্যুর পরেই শশাঙ্ক কনৌজাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু মালবরাজ দেবগুপ্ত শশাঙ্কের প্রতিশ্রুতি না পাইলে, পুষ্যভূতি-মৌখরি সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে রণাঙ্গণে একক অবতীর্ণ হইতে সাহসী হইতেন না। সুতরাং মনে হয় যে, গৌড়-মালব সন্ধি সংস্থাপনান্তেই দেবগুপ্ত কনৌজ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মালবরাজ দেবগুপ্তই কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

(২৫)

কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক প্রথমে পরবর্তী-গুপ্ত নৃপতিগণের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন। সুতরাং তিনি দেবগুপ্তের প্রস্তাবে ইতস্ততঃ না করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক মৌখরি-অভিযান প্রসূত কলঙ্ক কোনদিনই ভুলিতে পারেন নাই; প্রতিহিংসা গ্রহণের নিমিত্ত সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। আগত সুবর্ণসুযোগ উপেক্ষা না করিয়া দেবগুপ্তের প্রস্তাবানুসারে তিনি সামরিক সাহায্য দানেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই প্রকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও মৈত্রী স্থাপনের ফলে উত্তরভারতের প্রধান রাজন্যবর্গ দুইটি পরস্পর বিরোধী পক্ষে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন—পুষ্যভূতি-মৌখরি এবং পরবর্তী গুপ্ত-গৌড়। কর্ণসুবর্ণ-রাজ শশাঙ্কের সৌহার্দ্যে বলীয়ান হইয়া মালবাধিপতি দেবগুপ্ত মৌখরিগণের বিরুদ্ধে সমরাভিযান পরিচালনাপূর্বক কনৌজ আক্রমণ করিলেন। শশাঙ্কও পূর্বভারতে স্বীয় আধিপত্য সুদৃঢ় করিয়া দেবগুপ্তের সাহায্যার্থে কর্ণসুবর্ণ হইতে কনৌজ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। দেবগুপ্ত গ্রহবর্মাকে নিহত করিয়া কনৌজ

অধিকার করিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি থানেশ্বর অভিমুখেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইত্যবসরে থানেশ্বর-অধিপতি প্রভাকরবর্ধন পরলোকগমন করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণান্তর মালবরাজ কর্তৃক কনৌজ অধিকার এবং গ্রহবর্মার প্রাণ সংহার-বার্তা রাজ্যবর্ধনের কর্ণগোচর হইলে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং সত্বর সৈন্য সমাবেশ করিয়া কনৌজ উদ্ধারের নিমিত্ত যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রামাণিক উপাদান প্রসূত তথ্যানুসারে পথিমধ্যেই রাজ্যবর্ধনের সহিত সাক্ষাৎ সংঘর্ষে মালবরাজ দেবগুপ্ত নিহত হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে শশাঙ্ক সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে উত্তর ভারতের রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সম্মুখ সংগ্রামেই কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক পুষ্যভূতি রাজ্যবর্ধনকে নিহত করিয়া উত্তরভারতের রাজনৈতিক মঞ্চের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গৌড়বৈরী মৌখরিগণের এবং পুষ্যভূতিদিগের আধিপত্য ধূলিসাৎ করিয়া শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণের বিজয় পতাকা উত্তর ভারতের রণাঙ্গণে সংস্থাপন ও গৌড়কে নিষ্কলঙ্ক করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

শশাঙ্ক ও রাজ্যবর্ধন

(২৬)

এই প্রসঙ্গে শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধন-হত্যার কাহিনী উল্লেখযোগ্য। হিউয়েন-সাঙ্ এবং বাণভট্ট রাজ্যবর্ধন-হত্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। উভয়ের বিবরণেই রাজ্যবর্ধন যে প্রতারণায় বশীভূত হইয়া শশাঙ্কের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন এই কাহিনী বর্তমান। এতদ্ সম্পর্কে হিউয়েন-সাঙ্ ও বাণভট্টের উক্তির এবং অন্যান্য মূল উপাদান-তথ্যের আলোচনা প্রয়োজন। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এতদ্ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। উহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তথাপি বিভিন্ন উপাদান-প্রসূত তথ্যের যাথার্থ্য নির্ধারণ কর্তব্য। সি-ইউ-কিতে লিখিত আছে যে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সততা ও নিষ্ঠা-সহকারে রাজধর্ম পরিচালনা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে পূর্বভারতের

কর্ণসুবর্ণরাজ তাঁহার মন্ত্রীবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন যে, সন্নিকটস্থ প্রতিবেশী ধর্মরাষ্ট্র স্বীয় রাষ্ট্রের প্রতিবন্ধক ও দুর্ভোগদায়ক। সদৃশ সম্বোধনান্তে শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে একটি সাক্ষাৎ মিলনের আমন্ত্রণ করিয়া প্রাণ সংহার করেন। এই বর্ণনে 'বিশ্বাসঘাতকতা' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু সি-ইউ-কির অপর একটি অনুবাদ-গ্রন্থে স্পষ্টাকারে লিখিত আছে যে কর্ণসুবর্ণরাজ আমন্ত্রিত রাজ্যবর্ধনকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' পূর্বক হত্যা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু হিউয়েনসাঙের ভ্রমণ বিবরণের অন্যান্য অংশের বর্ণনে উক্ত আছে :—(ক) মন্ত্রীবর্গের ত্রুটির জন্যই রাজ্যবর্ধন শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ; (খ) হর্ষবর্ধন স্বয়ং বোধিসত্ত্বের নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অগ্রজ অতীব ধার্মিক ও সৌম্য প্রকৃতির নৃপতি ছিলেন এবং তিনি গর্হিত উপায়েই নিহত হইয়াছিলেন ; (গ) হর্ষ-অগ্রজকে নৃশংস উপায়েই হত্যা করা হইয়াছিল। কিন্তু জীবন চরিতের বর্ণনানুসারে রাজ্যবর্ধনের উচ্চতর সামরিক প্রতিভায় ঈর্ষ্যান্বিত কর্ণসুবর্ণরাজ ষড়যন্ত্র পূর্বক তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। ওয়াটার্সের ইয়ান চোয়াঙের ভ্রমণ বিবরণের উক্তি অনুযায়ী বৌদ্ধ-নিগ্রহক পূর্বভারতের কর্ণসুবর্ণরাজ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙের বিভিন্ন বর্ণনায় কর্ণসুবর্ণরাজ বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক ছিলেন এবং রাজ্যবর্ধন-হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। কিন্তু হিউয়েন-সাঙের বিবরণে কোথায়ও শশাঙ্কের নাম উক্ত হয় নাই। সর্বত্রই কর্ণসুবর্ণ-রাজ উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ সম্পর্কে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সে-কিয়া-ফাংঙ-চের বর্ণনায় শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধন-হত্যার বিস্তারিত কাহিনী অবিদ্যমান।

হিউয়েন-সাঙের বিবরণে রাজ্যবর্ধন-হত্যার সংক্ষিপ্ত নির্দেশ বাণভট্টের বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত। হর্ষচরিতে বিবৃত আছে যে, রাজ্যবর্ধন প্রলুব্ধ হইয়া শত্রুশিবিরে গমনান্তর নিহত হইয়াছিল। হর্ষচরিত টীকাকার এই সংক্ষিপ্ত উক্তির বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রাজ্যবর্ধন শশাঙ্ক-কন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষেই প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। যখন রাজ্যবর্ধন সান্ধ্যভোজে লিপ্ত ছিলেন, তখন শশাঙ্ক ছদ্মবেশে তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। হর্ষবর্ধনের মধুবন ও বাঁশখেরা লেখদ্বয় হইতেও প্রতিপন্ন হয় যে, রাজ্যবর্ধন 'সত্যানুরোধের' নিমিত্তই শত্রুশিবিরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

(২৭)

উপরিউক্ত তথ্যসমূহ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, শশাঙ্কই রাজ্যবর্ধনের প্রকৃত হন্তা। অধ্যাপক বসাক উক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, কনৌজের বা উহার সন্নিকটস্থ কোন স্থানে শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত স্থান নির্ধারণ সম্ভবপর নহে। অধ্যাপক বসাক হর্ষচরিতের দুটি পংক্তির অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবনান্তে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শশাঙ্কই বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক রাজ্যবর্ধনকে নিহত করিয়াছিলেন। সুতরাং অধ্যাপক বসাক হর্ষচরিতের বর্ণনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া শশাঙ্ককে রাজ্যবর্ধন হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু হিউয়েন-সাঙ্ ও বাণভট্টের এতদ্ সম্পর্কিত উক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে। উভয়ের বর্ণনাই পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। এই সম্পর্কে অধ্যাপক বসাক মন্তব্য করিয়াছেন যে, উক্ত চিন্তাধারা ঐতিহাসিকগণের পক্ষে অযৌক্তিক। কিন্তু ইতিহাসের মূল উপাদানসমূহের যথার্থতা বিচার ও নির্ধারণ করাই ঐতিহাসিকের প্রধানতম কর্তব্য। ইতিহাস-উপাদানের প্রকৃত তথ্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন না করিয়া ইতিহাস লিখন অনুচিত। বিবিধ উপাদানের বৈশিষ্ট্য ও তুলনামূলক বিচার ও আলোচনা দ্বারাই কোন ঘটনার যথার্থতা বা সত্তা প্রতিপন্ন করা সম্ভবপর। অধিকন্তু প্রাচীন সাহিত্যিক উপাদানের মূল ভিত্তি অতীব দুর্বল। একক সাহিত্যিক উপাদান প্রসূত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনৈতিহাসিক। বাণভট্টের বিবরণ পাঠে মনে হয় যে, তিনি সর্বত্রই পাক্ষিক বর্ণনা প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার বর্ণনায় কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক 'গৌড়ভুজঙ্গ', 'গৌড়পাষণ্ড এবং 'গৌড়াধম' রূপে বর্ণিত। এই প্রকার বর্ণনের ঐতিহাসিক ভিত্তি কোথায়? ইহা কি রাগ-দ্বেষ প্রণোদিত উক্তি নহে?

প্রকৃতপক্ষে রাজ্যবর্ধন-হত্যার কাহিনী অদ্যাপি তমসাচ্ছন্ন। উল্লিখিত কোন লেখকই শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধন-হত্যার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা প্রদান করেন নাই। হিউয়েন-সাঙের একটি বর্ণনায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, মন্ত্রিগণের ত্রুটির জন্যই রাজ্যবর্ধনের প্রাণহানি সংগঠিত হইয়াছিল। সুতরাং রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর নিমিত্ত তাঁহার মন্ত্রীবর্গই প্রধানভাবে দায়ী। মন্ত্রীবর্গের ভ্রান্তি-

পূর্ণ সমর কৌশলের জন্য রাজ্যবর্ধন শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক উপাদানের বর্ণনায় কোথায়ও স্পষ্টাক্ষরে রাজ্যবর্ধন হন্তার নাম উল্লিখিত হয় নাই। হর্ষবর্ধনের লেখমালায় দেবগুপ্তের পরাজয়ের নির্দেশ বিদ্যমান, কিন্তু শশাঙ্কের নামোল্লেখ নাই। হিউয়েন-সাঙের বিবরণে কর্ণসুবর্ণ-রাজই রাজ্যবর্ধনের হন্তা বলিয়া বর্ণিত। হর্ষচরিতের একখানি পুঁথিতে রাজ্য-বর্ধন-হন্তাকে নরেন্দ্রগুপ্ত নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। অন্য পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন এবং নরেন্দ্রগুপ্তই গৌড়াধিপ-রাজ্যবর্ধন-হন্তা। কিন্তু হিউয়েন-সাঙের বিবরণে কর্ণসুবর্ণরাজই রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন। কর্ণসুবর্ণরাজ যে শশাঙ্ক ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধনের পরাজয়ের কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নহে। রাজ্যবর্ধন কেবলমাত্র শশাঙ্কের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন অথবা সাক্ষাৎ সমরে বন্দী হইয়াছিলেন।—এই উক্তির যথার্থতা কোথায়? আত্মসমর্পণ করা অথবা বন্দী হওয়া উভয়ই পরাজয়ের পরিণাম। অধ্যাপক বসাক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে সাক্ষাৎ সংগ্রামে নিহত করিলে হর্ষবর্ধন তাঁহার বিরুদ্ধে অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ এবং ব্যাপক সমরায়োজন করিতেন না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নিমিত্ত শশাঙ্কের বিরুদ্ধে ব্যাপক সমরায়োজন ভিন্ন হর্ষবর্ধনের গত্যন্তর ছিল না।

(২৮)

রাজ্যবর্ধন-হত্যা সম্পর্কিত বর্ণনা সমূহের পূর্বাপর আলোচনান্তে মনে হয় যে, শশাঙ্ক সম্ভবতঃ মালবরাজ দেবগুপ্তের সাহায্যার্থে কনৌজ হইতে থানেশ্বর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রাজ্যবর্ধনও দেবগুপ্তকে পরাজিত করিয়া শশাঙ্কের সহিত সাক্ষাৎযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সাক্ষাৎ সংগ্রামেই শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধন নিহত হইয়াছিলেন। রণাঙ্গনে পরাজয় ও মৃত্যুর প্রকৃত ঘটনা গোপন রাখিয়া রাজ্যবর্ধনকে পরাজয়ের গ্লানি হইতে বিমুক্ত করিবার অভিপ্রায়েই কর্ণসুবর্ণরাজকে প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক, হন্তা প্রভৃতি

আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিলাষে প্রতরণাপূর্বক রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিবার অপরাধে শশাঙ্ককে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। হর্ষবর্ধন নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। অতএব রণাঙ্গণের প্রকৃত ঘটনা ও তথ্য তাঁহার নিকট অবিদিত ছিল। মন্ত্রীগণই হর্ষবর্ধনের নিকট রাজ্যবর্ধন-মৃত্যু-কাহিনী পরিবেশন করিয়াছিলেন। সুতরাং হর্ষবর্ধনের লেখমালায় কেবলমাত্র একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। শশাঙ্কের নামও উল্লিখিত হয় নাই। শশাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় বাণভট্ট ও হিউয়েন-সাঙ বর্তমান থাকিলে কর্ণসুবর্ণরাজ বিশ্বাসঘাতক বা প্রতারক ও রাজ্যবর্ধন-হন্তা রূপে নিশ্চয়ই রূপায়িত হইতেন না। উপরিউক্ত ঘটনা প্রবাহের সম্যক উপলব্ধি করিলে মনে হইবে যে, রাজ্যবর্ধন রণাঙ্গণেই নিহত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক মজুমদার যথার্থই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, প্রতারণা-পূর্বক রাজ্যবর্ধন হত্যাকাহিনী গ্রহণ করা অনুচিত ও অযৌক্তিক কিন্তু অধ্যাপক বসাকের মতে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রতারণা দ্বারা শত্রু হত্যা নিন্দনীয় বা দূষণীয় নহে। তিনি মনে করেন যে, বিবিধ উপাদান দ্বারা শশাঙ্ক কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক রাজ্যবর্ধন হত্যার বৃত্তান্ত প্রমাণিত। কিন্তু উপাদান সমূহের আলোচনা হইতে মনে হয় যে, রাজ্য-বর্ধন হত্যার কাহিনীর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক ও প্রতারণা দ্বারা রাজ্যবর্ধন হত্যার কাহিনী সুপরি-কল্পিত ও কাল্পনিক রচনা। পক্ষীয় সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া কর্ণসুবর্ণ-রাজ শশাঙ্ককে অপরাধী সাব্যস্ত করা অযৌক্তিক এবং অনৈতিহাসিক।

(চ) শশাঙ্ক ও হর্ষবর্ধন

(২৯)

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রথমেই হর্ষবর্ধন উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তৎকালীন উত্তর ভারতের রাজন্য-বর্গের মধ্যে শশাঙ্কই সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী শত্রু এবং তাঁহাকে পরাভূত করিতে না পারিলে থানেশ্বর-কনৌজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইবে না। সুতরাং

শশাঙ্ককে দমন করিবার অভিপ্রায়েই হর্ষবর্ধন গৌড়-অরি কামরূপরাজ ভাস্কর-বর্মার সহিত সন্ধি স্থাপনে মনস্থ করিলেন। ভাস্করবর্মাও এই সুবর্ণ সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। কামরূপে গৌড়গণের সামরিক অভিযান-প্রসূত গ্লানি ভাস্কবর্মা ভুলিতে পারেন নাই। সুতরাং প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত তিনিও হর্ষের সহিত সন্ধিসূত্র স্থাপনে অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। পূর্ব পশ্চিম দিক হইতে এককালীন আক্রমণ পূর্বক গৌড়রাজ্যকে বশীভূত করিবার সময় কৌশলই কামরূপ ও থানেশ্বর রাজ্যদ্বয়ের মৈত্রীবন্ধনের প্রকৃত ভিত্তি ছিল। শশাঙ্ককে বশীভূত করাই হর্ষবর্ধনের ও ভাস্করবর্মার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হর্ষবর্ধন সর্বপ্রথম কনৌজ উদ্ধারের জন্য মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। কনৌজ পুনরুদ্ধারান্তে শশাঙ্ককে পরাজিত করিয়া উত্তর ভারতে পুষ্যভূতি সার্বভৌমত্ব সংস্থাপনের নিমিত্ত হর্ষবর্ধন দিগ্‌বিজয় অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক সম্ভবতঃ কামরূপের আক্রমণের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া উত্তরভারতের রণাঙ্গণ হইতে বিদায় গ্রহণান্তে স্বদেশ অভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হর্ষবর্ধনের সহিত শশাঙ্কের কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নির্ভরযোগ্য বা যথার্থ মৌলিক তথ্যের সন্ধান অদ্যাপি অজ্ঞাত। বাণভট্ট, হিউয়েন-সাঙ প্রভৃতির বৃত্তান্তে হর্ষ-শশাঙ্কের সাক্ষাৎ সংঘর্ষের উল্লেখ অবর্তমান। কেবলমাত্র সে-কিয়া-ফাঙ-চে এবং আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের বর্ণনে হর্ষ-শশাঙ্কের সাক্ষাৎ সংগ্রামের উল্লেখ বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে মূল উপাদান সমূহের আলোচনা প্রয়োজন।

(৩০)

হর্ষচরিতে বর্ণিত আছে যে, হর্ষবর্ধন ধর্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৃথিবী হইতে গৌড়কে নিশ্চিহ্ন এবং অন্যান্য দুষ্ট রাজন্যবর্গকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে অকৃতকার্য হইলে পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিকুণ্ডে আত্ম বিসর্জন করিবেন। হর্ষচরিতের এই বর্ণনের অংশ বিশেষ হইতে তৎকালীন উত্তরভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও জনসাধারণের দুঃখ-

দৈন্যের আংশিক পরিচয়ও পাওয়া যায়। হর্ষবর্ধন পৃথিবী হইতে গৌড়দিগকে অপসারিত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইয়াছিলেন কিনা তাহার কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। উল্লিখিত উপাদান সমূহের বর্ণনায় শশাঙ্কের সহিত হর্ষবর্ধনের সাক্ষাৎ সংগ্রামের উল্লেখ নাই।

(৩১)

হিউয়েন-সাঙের জীবনচরিতে ও ভ্রমণ বিবরণীতে হর্ষ এবং শশাঙ্কের মধ্যে সাক্ষাৎ-যুদ্ধের উল্লেখ অবর্তমান। জীবনচরিতে লিখিত আছে যে, হর্ষবর্ধন সহর ভ্রাতৃপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণান্তে ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সি-ইউ-কিতে বিবৃত আছে যে, হর্ষবর্ধন পূর্ব হইতে পশ্চিম দিক পর্যন্ত সকল উদ্ধতমনাঃ নৃপতিবর্গকে পরাভূত করিয়া ষষ্ঠ বৎসরান্তে সমগ্র পঞ্চভারত পদানত করিয়াছিলেন। ইয়ান-চোয়াঙের ভ্রমণ-বিবরণ অনুসারে হর্ষবর্ধন পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া সকল উদ্ধত রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি ষষ্ঠ বৎসর যাবৎ পঞ্চভারতের বিরুদ্ধে অবিরাম সমরাভিযানে লিপ্ত ছিলেন। ইয়ান-চোয়াঙের ভ্রমণ-বিবরণের অপর একটি পাঠানুক্রমে হর্ষবর্ধন পঞ্চভারত পদানত করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ওয়াটার্সের মতে চীন-পরিব্রাজক স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ষষ্ঠ বৎসরের মধ্যে হর্ষবর্ধনের বিজয় অভিযান সমাপ্ত হইয়াছিল। হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ বিবরণ অনুসারে সমরাভিযানের ত্রিংশৎ বৎসরান্তে অবসান ঘটিয়াছিল।

— উপরিউক্ত বিবিধ বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, সিংহাসন আরোহণের সময় হইতেই হর্ষবর্ধন বিপদসমুদ্রের সম্মুখীন হইয়া অবিশ্রান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন। পঞ্চভারতের অধিপতি হইবার পরেও সমরাভিযান অব্যাহত ছিল। হর্ষবর্ধন ৬০৬-০৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ অনুসারে ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হর্ষবর্ধন অবিরাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। উক্ত সময়ের মধ্যে হর্ষবর্ধনের সহিত শশাঙ্কের পরোক্ষ বা সাক্ষাৎ কোন সংগ্রামের নির্দেশ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র সে-কিয়া-ফাঙ-চে-তে লিখিত আছে যে, হর্ষবর্ধন ও কুমাররাজ (ভাস্করবর্মা) সম্মিলিত হইয়া

ধর্মদ্বেষী শশাঙ্ক ও তাঁহার সৈন্যবাহিনী এবং অনুচরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উক্তিও সুস্পষ্ট নহে। কোন সময়ে এবং কি উপায়ে বা প্রকারে হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে পরাজিত করিয়াছিলেন তাহার কোন নির্দেশ প্রদত্ত হয় নাই।

(৩২)

আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের বিবরণে হর্ষবর্ধন এবং শশাঙ্কের মধ্যে সাক্ষাৎ সংঘর্ষের বর্ণন বিদ্যমান। উক্তগ্রন্থে লিখিত আছে, যে 'হ' (হর্ষ) 'সোমের' (শশাঙ্ক) বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করিয়া পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যের সীমানার মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। যদিও আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের উক্ত বর্ণন কোন প্রামাণিক উপাদান দ্বারা নিষ্পন্ন নহে তথাপি অধিকাংশ পণ্ডিতগণ মন্তব্য করিয়াছেন যে, হর্ষ শশাঙ্ককে পরাভূত করিয়া পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অধ্যাপক বসাকও স্বীকার করিয়াছেন যে, এই অভিযানের ফলে শশাঙ্ক সাময়িক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক ৬১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বীয় রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মতে হর্ষবর্ধনের দ্বিতীয় অভিযান ফলপ্রসূ হইয়াছিল—অর্থাৎ শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে এবং হিউয়েন-সাঙের কর্ণসুবর্ণ পরিদর্শনের পূর্বে এই অভিযানের ফলেই হর্ষবর্ধন কর্ণসুবর্ণ ও পুণ্ড্রবর্ধনের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অধ্যাপক বসাক অন্যত্র বলিয়াছেন যে হর্ষবর্ধন কর্তৃক কর্ণসুবর্ণ রাজ্য বিজয় শশাঙ্কের প্রচলিত দূষিত (অধিকখাদ মিশ্রিত) মুদ্রাদ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় দূষিত মুদ্রাদ্বারা পরাজয় বা বিজয় প্রমাণীকৃত হয় না; দূষিত মুদ্রা অর্থনৈতিক অবনতির যথার্থ পরিচায়ক।

অন্য পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, উক্ত পরাজয়ের পরেই হর্ষবর্ধন এবং শশাঙ্ক এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সন্ধির সর্ত অনুসারে একে অন্যের রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রকার পুনর্মিলনের বা সন্ধির সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রামাণিক তথ্য অবিদ্যমান।

অধিকন্তু আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের বর্ণনাও অস্পষ্ট। তবে সে-কিয়া-ফাঙ-চের সংক্ষিপ্ত নির্দেশ বহুলাংশে স্পষ্ট। সে-কিয়া-ফাঙ-চের একক নির্দেশের উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হর্ষবর্ধন যথার্থই শশাঙ্ককে পরাজিত করিয়াছিলেন।

(৫৩)

আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের এবং সে কিয়া-ফাঙ-চের বর্ণনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনুচিত। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প পরবর্তী সময়ের রচনা এবং উহার মূল উপাদান বহুলাংশে বৌদ্ধ-জনশ্রুতি সম্বলিত। সে-কিয়া-ফাঙ চের বর্ণনায় কোন বিস্তারিত তথ্য পরিবেশিত হয় নাই। হর্ষবর্ধন কর্তৃক শশাঙ্কের পরাজয় তৎসময়ে উত্তরভারতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু সি ইউ-কির ও জীবনচরিতের বর্ণনে হর্ষ-শশাঙ্কের সাক্ষাৎ সংগ্রামের স্পষ্ট নির্দেশের অভাবে কেবলমাত্র সে-কিয়া-ফাঙ চের উক্তির উপর নির্ভরশীল কোন সিদ্ধান্ত স্বীকার্য নহে। অধিকন্তু হর্ষবর্ধনের লেখ-মালায়ও শশাঙ্কের পরাজয় কাহিনীর কোন সূত্র পাওয়া যায় না। সুতরাং সংগৃহীত তথ্যসমূহ হইতে মনে হয় যে, কনৌজ পুনরধিকারান্তে হর্ষবর্ধনের সেনাবাহিনী সম্ভবতঃ শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণ রাজ্য পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ-জনক। মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক পরম বিক্রমে তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কর্ণসুবর্ণের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তী আলোচনা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে, শশাঙ্কের মৃত্যুকাল পর্যন্ত মগধ ও উড়িষ্যা কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে পরাজিত করিয়া পূর্বভারতের প্রভুত্ব স্থাপনের অভিপ্রায়ে সর্বদাই ব্যাপৃত ছিলেন। চৈনিক উপাদান হইতে অবগত হওয়া যায় যে, হর্ষবর্ধন আনুমানিক ৬৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে মগধ ও উড়িষ্যার উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন—অর্থাৎ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর। শশাঙ্কের জীবদ্দশায় ভাস্করবর্মাও কর্ণসুবর্ণ জয় করিতে সক্ষম হন নাই।

হর্ষবর্ধন যে শশাঙ্ককে উত্তর ভারতের রণাঙ্গণ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে

বাধ্য করিয়া ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই স্বীয় রাজ্য সংরক্ষার্থে পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙের বিভিন্ন বিবরণ পাঠে মনে হয় যে, উত্তরভারত হইতে প্রত্যাগমনের পথে শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মাভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙ বর্ণিত শশাঙ্ক কর্তৃক বৌদ্ধউৎপীড়নমূলক কার্য্যাবলীর মধ্যে কুশীনগরে বৌদ্ধগণের উচ্ছেদসাধন, পাটলীপুত্রে বুদ্ধস্মৃতিচিহ্নবাহক শিলাফলক ধ্বংসের প্রচেষ্টা এবং বৌদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের উৎপাটন ও বুদ্ধমূর্তি অপসারণের প্রয়াস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ হইতে প্রনাণিত হয় যে, বৌদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষ উৎপাটন পর্বের অন্তে কর্ণসুবর্ণরাজ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, শশাঙ্কের জীবদ্দশা পর্যন্ত কর্ণসুবর্ণের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

(ছ) শশাঙ্ক ও কর্ণসুবর্ণ-সাম্রাজ্য

(৩৪)

এই প্রসঙ্গে কর্ণসুবর্ণ সাম্রাজ্যের ও শশাঙ্কের আধিপত্য বিস্তারের আকার ও প্রকার নির্ধারণ প্রয়োজন। সমগ্র বাঙলা, বিহার এবং উড়িষ্যার উপর শশাঙ্কের সার্বভৌম প্রভুত্ব বিস্তৃত ছিল। হিউয়েন সাঙ তৎকালীন বাঙলার চতুষ্টয় রাজ্যের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন—পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত এবং কর্ণসুবর্ণ। এই চতুষ্টয় রাজ্যের মধ্যে হিউয়েন-সাঙ একমাত্র কর্ণসুবর্ণের রাজার নামোল্লেখ করিয়াছেন। সমতটে এক ব্রাহ্মণ রাজবংশের নির্দেশ বর্তমান। হিউয়েন-সাঙ শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে বাঙলা দেশ পরিভ্রমণে আগমন করিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকের ভ্রমণ বিবরণে বাংলা দেশের অপর রাজ্যত্রয়ের অধিপতিগণের নামানুল্লেখ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিয়াছেন যে, বাঙলার চতুষ্টয় রাজ্য সমূহই তৎসময়ে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সুতরাং চীন পরিব্রাজকের বিবরণে রাজ্যসমূহের অধিপতিগণের নামোল্লেখ অবর্তমান। কিন্তু তাহা হইলে তিনি কর্ণসুবর্ণের রাজার নাম উল্লেখ করিলেন কেন? হিউয়েন-সাঙ শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী সময়েই কর্ণসুবর্ণ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। কর্ণসুবর্ণের

তৎকালীন রাজার নাম উল্লিখিত হয় নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে শশাঙ্কের মৃত্যুর অনতিপরেই হর্ষবর্ধন কর্ণসুবর্ণ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মতবাদও প্রমাণসাপেক্ষ। সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙলা দেশে অপর কোন সার্বভৌম নৃপতি বর্তমান ছিলেন না। কোন রাজ্য বিদ্যমান থাকিলেও শশাঙ্কের আধিপত্য স্বীকৃত ছিল। জ্ঞাত তথ্যসমূহ হইতে মনে হয় যে, শশাঙ্কের সার্বভৌমত্ব সমগ্র বাঙলা দেশের উপরই বিস্তৃত ছিল। সুতরাং হিউয়েন-সাঙের বিবরণে অন্য রাজ্যের বর্ণন বর্তমান সত্ত্বেও অধিপতিগণের নাম উল্লিখিত হয় নাই। সমতট রাজ্য যে, কর্ণসুবর্ণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে মহারাজাধিরাজগণের বংশধরদিগের এবং আন বংশজাত নৃপতি বর্গের রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপরই কর্ণসুবর্ণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সমতট রাজ্য অক্ষত রাখিয়া শশাঙ্কের পক্ষে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা বিজয় সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং সমতট যে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

(৩৫)

উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ (পুণ্ড্রবর্ধন এবং তাম্রলিপ্ত) শশাঙ্কের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল। অদ্যাপি মেদিনীপুর জিলায় বহু প্রাচীন নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষের সহিত শশাঙ্কের নাম জড়িত। লেখমালার সাক্ষ্য হইতেও প্রমাণিত হয় যে, মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা শশাঙ্কের শাসনাধীনে ছিল। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুর জেলা হইতে প্রাপ্ত দুইটি তাম্রলেখের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় দাঁতন থানার অন্তর্গত মোহনপুর নামক গ্রামের অধিবাসী জনাব সুরত খাঁর নিকট হইতে উক্ত তাম্রফলকলিপিদ্বয় সংগৃহীত হয়। বর্তমানে তাম্রলেখদ্বয় মেদিনীপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই তাম্রফলকলিপিদ্বয়ের পাঠোদ্ধার এবং ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। তাম্রলিপিদ্বয়ের যথার্থ সন-তারিখ অনিশ্চয়াত্মক। প্রাচীন

লিপিপদ্ধতির বিচারে তাম্রলেখদ্বয় আনুমানিক ৫৫০-৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ ও প্রচারিত হইয়াছিল। অধ্যাপক মজুমদার তাম্রলিপিদ্বয়ের উৎকীর্ণ বৎসর-সংখ্যার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, যথাক্রমে, ৩০৯ অথবা ১৯ এবং ৮। ৩০৯ বৎসর-সংখ্যা শকাব্দ হইতে গণনা করা হইলে, প্রথম তাম্রলিপি ৬২৯ (৩২০ + ৩০৯ = ৬২৯) খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত হইয়াছিল। অন্য পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, লিপিদ্বয়ে লিখিত বৎসর-সংখ্যা, ১৯ এবং ৮, সিংহাসনারোহণের বাৎসরিক দিন হইতে গণিত। অতএব তাম্রলিপিদ্বয় রাজত্বের ১৯ এবং ৮ বৎসরে প্রচারিত হইয়াছিল। অপর পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মেদিনীপুর তাম্রফলকদ্বয় ৬২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ও প্রচারিত হইয়াছিল। সম্প্রতি অধ্যাপক বসাক অধ্যাপক মজুমদার কর্তৃক মেদিনীপুর তাম্রলেখের প্রস্তাবিত বৎসর, ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ, অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত প্রস্তাবিত বৎসর সমর্থন করিলে ৬১৯-২০ (গঞ্জামলিপি বৎসর) খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে (অর্থাৎ, ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে) শশাঙ্ক কর্তৃক মেদিনীপুর জয়ের ঘটনা অনস্বীকার্য। কিন্তু মেদিনীপুর অবিজিত রাখিয়া শশাঙ্কর পক্ষে উড়িষ্যা বিজয় অসম্ভব ছিল। সুতরাং অধ্যাপক বসাক মনে করেন যে, মেদিনী তাম্রলিপিদ্বয়ের বৎসর সংখ্যা যথাক্রমে ১৯ এবং ৮ সিংহাসন আরোহণ দিন হইতে গণিত। তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শশাঙ্ক মেদিনীপুর বিজয় ৫৯৪ অথবা ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই সমাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক বসাকের প্রথম মন্তব্য স্বীকার্য নহে। প্রথমতঃ, মেদিনীপুর তাম্র লিপিদ্বয়ে লিখিত সংখ্যার পাঠোদ্ধার বিতর্কমূলক; দ্বিতীয়তঃ, লেখদ্বয়ে শশাঙ্কের মেদিনীপুর বিজয়ের বর্ণন অবর্তমান। মেদিনীপুর তাম্রফলক শশাঙ্কের রাজকর্মচারী কর্তৃক প্রচারিত গ্রাম ও ভূমি দানপত্র। তৃতীয়তঃ, দানপত্রে যে শশাঙ্কের মেদিনীপুর বিজয়ের অনন্তরে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার কোন নির্দেশ নাই। অধ্যাপক মজুমদার এমন কোন স্পষ্ট মন্তব্য করেন নাই যে, শশাঙ্ক ৬২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জয় করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক চতুর্জলধি-মেখলা-মহীর অধিপতি থাকাকালীন দানপত্রদ্বয় প্রচারিত হইয়াছিল। এই বর্ণন হইতে প্রমাণিত হয় না যে, শশাঙ্ক উক্ত বৎসরেই মেদিনীপুর জয় করিয়াছিলেন। উপরন্তু মেদিনীপুর, উড়িষ্যা ও মগধ জয় অসমাপ্ত রাখিয়া

শশাঙ্কের পক্ষে উত্তরভারত সমরাভিযান সম্ভবপর ছিল না। উত্তরভারত অভিযানের পূর্বেই (৬০৫ খ্রীঃ) শশাঙ্ক উক্ত রাজ্যসমূহের বিজয় সমাপ্ত করিয়াছিলেন। পূর্বভারতে স্বীয় আধিপত্য সুদৃঢ় করিয়াই শশাঙ্ক উত্তরভারত অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু মেদিনীপুর তাম্রলিপিদ্বয়, গঞ্জাম-লেখ, প্রভৃতি পরবর্তী সময়ে যথাক্রমে ৬২৯ এবং ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত হইয়াছিল।

(৩৬)

মেদিনীপুর প্রথম তাম্রলিপি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, শশাঙ্ক যখন 'চতুর্জলধি —মালাবিভূষিত' পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন তখন সামন্ত মহারাজ শ্রীসোমরাজ উৎকল দেশ সংলগ্ন দণ্ডভুক্তির শাসক ছিলেন। দ্বিতীয় তাম্র-ফলকে লিখিত আছে যে, শশাঙ্ক পৃথিবীর অধীশ্বর থাকাকালীন মহাপ্রতিহার শুভকীর্তি দণ্ডভুক্তির শাসন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। উভয় তাম্র-ফলকই গ্রাম ও ভূমিদানপত্র। প্রথম ফলকটি কাশ্যপ গোত্রীয় সুকৃত পুরোহিত ভট্টেশ্বরকে প্রদত্ত মহাকুন্তার পড়ক নামক গ্রাম—দানপত্র। দ্বিতীয় ফলক ভরদ্বাজ গোত্রীয় দামস্বামীকে দেশকেতক পড়িকের অন্তর্গত কুন্তার পড়ক নামক গ্রামে চল্লিশ দ্রোণ ক্ষেত্র এবং এক দ্রোণ বাস্তুভূমি অর্পণের দানপত্র। দণ্ডভুক্তির সামন্ত মহারাজ এবং মহাপ্রতিহার পুণ্যার্জনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি ও গ্রাম দান করিয়াছিলেন। দানপত্রদ্বয় তাবীর অধিকরণ হইতে প্রচারিত। এই তাম্রফলকদ্বয়ে দানপত্র দ্বারা ভূমি ও গ্রাম অর্পণের বিস্তারিত বর্ণনা বর্তমান।

তাম্রফলকদ্বয়ের লেখ হইতে মনে হয় যে, প্রথম তাম্রফলক এক ব্যক্তিকে অর্পিত সমগ্র গ্রাম দানপত্র এবং দ্বিতীয় ফলক উক্ত বা ভিন্ন গ্রামের অন্তর্গত ক্ষেত্র ও বাস্তুভূমি সম্প্রদান বিষয়ক দানপত্র। ভিন্ন ব্যক্তিদ্বয়কে একই গ্রামে ও উহার অন্তর্গত ভূমিদান কি প্রকারে সম্ভবপর? প্রথম দানপত্রে গ্রামের নামের উপসর্গ 'মহা' বর্তমান। কিন্তু দ্বিতীয় দান পত্রে গ্রামের নামের পূর্বে উপসর্গ অবর্তমান। দ্বিতীয় ফলকে স্পষ্টাক্ষরে

লিখিত আছে যে কুম্ভার পত্তক দেশ কেতকপত্তিকের অন্তর্গত। সুতরাং তাম্রলিপিতে উল্লিখিত গ্রামদ্বয় ভিন্ন। উক্ত গ্রামদ্বয় অভিন্ন হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্ষেত্র ও বাস্তুভূমি প্রথমে দয়ামন্ন স্বামীকে এবং পরবর্তী সময়ে সমগ্র গ্রাম ভট্টেশ্বরকে প্রদান করা হইয়াছিল। সামন্ত-মহারাজ মহাপ্রতিহারের ঊর্ধতন রাজকীয় পদমর্যাদা। সুতরাং সম্ভবতঃ মহাপ্রতিহার প্রথমে ক্ষেত্র ও বাস্তুভূমি দান করিয়াছিলেন এবং তৎপরে সামন্ত-মহারাজ সমগ্র গ্রাম ভট্টেশ্বরকে অর্পণ করেন। শুভকীর্তি মহাপ্রতিহাররূপেই দণ্ডভুক্তি শাসন করিতেন এবং পরে সোমদত্ত সামন্ত মহারাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উপরন্তু উভয়েই এককালীন দণ্ডভুক্তির শাসনকার্যে নিযুক্ত থাকাও অসম্ভব নহে। সম্ভবতঃ মহাসামন্ত সোমদত্তের অধীনেই মহাপ্রতিহার শুভকীর্তি শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু তাম্রফলকদ্বয়ের তারিখ ভিন্ন. ১৯ এবং ৮। মনে হয়, রাজ কর্মচারীদ্বয় কর্তৃক ভিন্ন গ্রাম ও ভূমিদান বিষয়ক দানপত্রদ্বয় ভিন্ন সময়েই প্রচারিত হইয়াছিল। ভট্টেশ্বরকে প্রদত্ত প্রথম দানপত্র পরের এবং দানস্বামীকে প্রদত্ত দ্বিতীয়-দানপত্র পূর্বের।

মেদিনীপুর তাম্রলিপিদ্বয়ে লিখিত আছে যে, রাজকর্মচারীদ্বয় দণ্ডভুক্তির শাসন কার্যে নিযুক্ত থাকাকালীন ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম ও ভূমিদান করিয়াছিলেন। দণ্ডভুক্তির শাসন বিভাগের প্রধান রাজকীয় কার্যালয় তাবীর (বর্তমান দেবরা, মেদিনীপুর হইতে ১৫ মাইল দূরবর্তী) নামক স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। বর্তমান মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার সংলগ্ন অঞ্চল সমূহই দণ্ডভুক্তির অন্তর্গত ছিল। মেদিনীপুর তাম্রলিপিদ্বয়ের উল্লিখিত স্থানসমূহের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারণ সম্ভবপর হয় নাই। সম্ভবতঃ লিপিদ্বয়ে উক্ত স্থান সমূহ মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার প্রান্ত অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। মেদিনীপুর তাম্রলেখ হইতে দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বর্তমান মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা এবং সংলগ্ন অঞ্চল সমূহ শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(৩৭)

মেদিনীপুর তাম্রলিপিতে কর্ণসুবর্ণরাজ কেবলমাত্র 'শ্রীশশাঙ্ক' নামে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু গঞ্জাম লেখতে শশাঙ্ক মহারাজাধিরাজ আখ্যায়

ভূষিত। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'শ্রী' একটি অধস্তন সংজ্ঞানির্দেশক। সুতরাং শশাঙ্ক হর্ষের অধীনে অধস্তন নৃপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালীনই মেদিনীপুর দানপত্র প্রচারিত হইয়াছিল। এই কারণ বশতঃই মেদিনীপুর লেখতে শশাঙ্ককে মহারাজাধিরাজ উপাধিতে বিভূষিত করা হয় নাই। কিন্তু 'শ্রী'র সহিত কোন রাজকীয় পদমর্যাদার সম্পর্ক অজ্ঞাত। 'শ্রী' নামের উপাধি বিশেষ এবং শ্রীবৃদ্ধিসূচক। শশাঙ্ক মহারাজাধিরাজ আখ্যায় বর্ণিত হন নাই সুতরাং তিনি তৎসময়ে অধস্তন শাসক বা নৃপতি ছিলেন বলিয়া মন্তব্য করা অযৌক্তিক; অনেক লেখমালায় সার্ব্বভৌম নৃপতির নামের পূর্বে কেবলমাত্র 'শ্রী' উপাধি বর্তমান। শশাঙ্কের মুদ্রায়ও 'শ্রীশ' লিখিত আছে। শশাঙ্ক নিশ্চয়ই অধস্তন সামন্ত নৃপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন মুদ্রা প্রচলন করেন নাই। উপরন্তু অধস্তন শশাঙ্কের অধীনে সামন্ত মহারাজ পর্যায়ে রাজকর্মচারীর অবস্থান যুক্তিসিদ্ধ নহে। শশাঙ্ক যে পরবর্তী সময়ে একজন অধস্তন শাসক ছিলেন তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ অবর্তমান। তথ্য সমূহের আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, শশাঙ্ক জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত কর্ণসুবর্ণের সার্বভৌম নৃপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মেদিনীপুর তাম্রলিপির উৎকীর্ণকের ভ্রমের বা অসাবধানতার প্রশ্ন অবান্তর।

(৩৮)

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, হর্ষবর্ধনের সহিত শশাঙ্কের সাক্ষাৎ যুদ্ধের মৌলিক তথ্য অবিদ্যমান। হিউয়েন-সাঙের বিবরণীতে হর্ষ-শশাঙ্কের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ সম্পর্কিত কোন নির্দেশ উল্লিখিত হয় নাই। কেবলমাত্র সে-কিয়া-ফাঙ-চে ও মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের বর্ণনে হর্ষবর্ধনের সহিত শশাঙ্কের সাক্ষাৎ সংগ্রামের বর্ণনা বিদ্যমান। কিন্তু পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, সে-কিয়া-ফাঙ-চে ও মঞ্জুশ্রীমূলকল্প প্রসূত তথ্য নির্ভরযোগ্য নহে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় সে-কিয়া-ফাঙ-চের উক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া হর্ষবর্ধন কর্তৃক শশাঙ্কের পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, ৬১৯ হইতে ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কর্ণসুবর্ণরাজ অধস্তন অধিনায়কের

পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ যখন শশাঙ্ক অধস্তন অধিপতি রূপে শাসন করিতেন তখনই মেদিনীপুর তাম্রশাসন প্রচারিত হইয়াছিল। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য অন্য তথ্য দ্বারা সমর্থিত নহে। হর্ষবর্ধন কর্তৃক কর্ণসুবর্ণ বিজয় সন্দেহজনক। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পঞ্চদশ সমষ্টির প্রারম্ভের পূর্বে হর্ষবর্ধন পূর্বভারতে আধিপত্য বিস্তারে সাফল্যলাভ করেন নাই। উপরন্তু অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক শশাঙ্কের অধস্তন নৃপতিপদে অধিষ্ঠানের নির্ধারিত বৎসর লেখমালা তথ্যের বিরুদ্ধ। গঞ্জাম লেখমালা ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক নিশ্চয়ই মহারাজাধিরাজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মেদিনীপুর তাম্রলিপির প্রচারিত বৎসর ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ ধার্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত বৎসর পর্যন্ত শশাঙ্ক সার্বভৌম নৃপতি পদে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইলে হর্ষবর্ধন কর্তৃক ৬১৯ হইতে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শশাঙ্কের পরাজয় অসম্ভব। সুতরাং মনে হয় যে, হর্ষবর্ধনের বিজয় এবং শশাঙ্কের পরাজয়ের মতবাদ যুক্তিসিদ্ধ নহে। মেদিনীপুর তাম্রফলকদ্বয়ের লেখ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, উক্ত তাম্রশাসন প্রচারিত হইবার সময় শশাঙ্ক সার্বভৌম নৃপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(৩৯)

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, হর্ষ-ভাস্করবর্মার সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী শশাঙ্ককে পরাজিত করিয়াছিল এবং গঙ্গানদী দ্বারা বিজয়ী নৃপতি-দ্বয়ের রাজ্যসীমা নির্ধারিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, দেবখড়্গের আম্রফপুর এবং লোকনাথের লেখমালাদ্বয়ে উৎকীর্ণ বৎসর হর্ষাব্দ হইতে গণিত। অতএব তাঁহার মতে পূর্ববঙ্গের উপরও হর্ষবর্ধনের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু উল্লিখিত লেখদ্বয়ের সন-তারিখ, আরম্ভকাল অনিশ্চিত। হর্ষবর্ধন কর্তৃক পূর্ববঙ্গ বিজয়ের বা আধিপত্য বিস্তারের কোন প্রামাণিক তথ্যের নির্দেশ অবিদ্যমান। অধিকন্তু অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে ভাস্করবর্মা গঙ্গার

পূর্ববর্তী অঞ্চল সমূহ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতানুসারে হর্ষবর্ধনের আধিপত্য পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহা হইলে হর্ষবর্ধনের জীবদ্দশায় ভাস্করবর্মা কর্তৃক পূর্ববঙ্গ বিজয়ের অভিমত স্বীকার্য নহে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরই ভাস্করবর্মা পূর্ববঙ্গের অংশবিশেষ ও কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

(৪০)

মেদিনীপুর তাম্রফলক লেখানুশ্রুত তথ্য চতুষ্টয় সোরো (উড়িষ্যা) দানপত্র দ্বারা সমর্থিত। প্রথম সোরো দানপত্রে লিখিত আছে যে, মহাবলাধিকৃত-অন্তরঙ্গ মহাসন্ধি-বিগ্রহিক সোমদত্ত ওড্র বিষয়ান্তর্গত উত্তর তোসলীতে গ্রাম দান করিয়াছিলেন। উক্ত দানপত্রের প্রচার-বৎসর ৫৮০ (২৬০ + ৩২০ = ৫৮০) খ্রীষ্টাব্দ। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সোরোফলক সম্ভবতঃ মেদিনীপুর দানপত্রদ্বয়ের পূর্ব-প্রচারিত নহে। প্রথম মেদিনীপুর এবং সোরো দানপত্রের দাতা সোমদত্ত সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি ছিলেন। সোমদত্ত প্রথমে মহাসন্ধি-বিগ্রহিক পদমর্যাদায় আসীন ছিলেন এবং পরবর্তী সময় সামন্ত-মহারাজ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সোরো দানপত্রে রাজচক্রবর্তী নামোল্লেখ অবর্তমান। অধ্যাপক মজুমদার যথার্থই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তৎসময়ে, শশাঙ্কই পূর্বভারতে একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন।

(৪১)

দক্ষিণ উড়িষ্যায় শশাঙ্কের আধিপত্য বিস্তার গঞ্জাম তাম্রফলক লেখ দ্বারা প্রমাণিত। গঞ্জাম তাম্রলিপিতে লিখিত আছে যে যখন মহীয়ান মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক 'চতুরুদধিসলিলবীচী-মেখলানিলীনায়াম্-সদ্বীপ···' পরিবেষ্টিত পৃথিবী শাসন করিতেন (মহারাজাধিরাজ শ্রীশশাঙ্করাজে শাসতি), তখন কঙ্গোদের শৈলোদ্ভব বংশজাত মাধববর্মন তাঁহারই অধীনে মহারাজ-মহাসামন্ত ছিলেন। ৬১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দ গঞ্জাম লিপির সুনির্দিষ্ট বৎসর (গৌপ্তাব্দের বর্ষশতত্রয়ে)। সুতরাং ৬১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ উড়িষ্যা শশাঙ্কের শাসনাধীনে ছিল। কর্ণসুবর্ণ হইতে বিতাড়িত হইয়া শশাঙ্কের দক্ষিণ উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণের মতবাদও গ্রাহ্য নহে। অধিকন্তু প্রথম সোরো

স্কন্দগুপ্তের লেখ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উত্তর-তোসলী শম্ভুযসসদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। শম্ভুযসস যে দক্ষিণ-তোসলীর শাসক ছিলেন তাহা পতিয়কল্প (৬০৩ খ্রীঃ) দানপত্রের লেখদ্বারা সমর্থিত। উপরন্তু ছুধপাণি শিলালেখ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, শম্ভুযসস দক্ষিণ তোসলীর মান বংশজাত ছিলেন। সম্ভবতঃ শশাঙ্ক মান-শম্ভুযসসকে পরাজিত করিয়াই উড়িষ্যায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

(৪২)

মেদিনীপুর সোরো এবং পতিয়কল্প দানপত্রলেখমালার বর্ণনা হইতে অধ্যাপক মজুমদার উড়িষ্যা ও দণ্ডভুক্তির শাসনকার্যে নিযুক্ত রাজকীয় কর্মচারিগণের অনুক্রম অধিষ্ঠানের কাঠামো স্থিরীকৃত করিয়াছেন : (ক) দণ্ডভুক্তির শাসক মহাপ্রতিহার শুভকীর্তি ; (খ) ওড্র শাসক মহাবলাধিকৃত—অন্তরঙ্গ—মহাসন্ধিবিগ্রহিক সোমদত্ত (দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সোরো লেখ) ; (গ) উৎকল ও দণ্ডভুক্তির (?) শাসক সামন্তমহারাজ সোমদত্ত ; (ঘ) উৎকল দণ্ডভুক্তির শাসক মহাপ্রতিহার-মহাসামন্ত—মহারাজ ভানুদত্ত (চতুর্থ সোরোলেখ)। সম্ভবতঃ ভানুদত্ত সর্বপ্রথম উড়িষ্যার অধিকৃত অঞ্চল সমূহের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উল্লিখিত রাজকীয় পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত রাজকর্মচারিগণ মহারাজা শশাঙ্কের অধীনে দণ্ডভুক্তি ও উড়িষ্যার শাসনকার্যে লিপ্ত ছিলেন। লেখমালার তথ্য হইতে অধ্যাপক মজুমদার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মানগণ প্রথমে গয়া এবং মেদিনীপুর জেলার পার্বত্যঅঞ্চল সমূহের অধিপতি ছিলেন এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে উড়িষ্যার উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। মানবংশজাত নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়াই শশাঙ্ক উৎকল এবং কঙ্গোদ অধিকার করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। অধিকৃত উড়িষ্যার এবং মেদিনীপুরের প্রান্তবর্তী অঞ্চলসমূহ নবপ্রতিষ্ঠিত দণ্ডভুক্তি নামক শাসন কেন্দ্রের অধিকারভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে এই নূতন শাসনকেন্দ্র বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

উত্তরভারত অভিযানের পূর্বেই (আনুমানিক ৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) শশাঙ্ক উপরিউক্ত অঞ্চলসমূহের বিজয় সমাপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত

তাম্রশাসন লেখমালা শশাঙ্কের উত্তরভারত হইতে প্রত্যাগমনের অনেক পরে প্রচারিত হইয়াছিল।

(৪৩)

শশাঙ্ক কর্তৃক বিহার বিজয়ের কাল অনির্দিষ্ট। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, হিউয়েন-সাঙের বিহার পরিভ্রমণের অনতিপূর্বে শশাঙ্ক গয়া জয় করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙের বৃত্তান্ত অনুসারে বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষ উৎপাটনের অনতিপরেই শশাঙ্ক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণে লিখিত আছে যে, উক্ত ঘটনার কতিপয় মাস অন্তর অশোকের বংশধর পূর্ণবর্মা মগধের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি বোধিবৃক্ষের সংরক্ষণের সুব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙ উল্লিখিত বিবৃতি হইতে মনে হয় যে, শশাঙ্কের মগধ বিজয় ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের অনতিপূর্বে সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্তু এই অনুমান স্বীকার্য্য নহে। বিহার বিজয় অসমাপ্ত রাখিয়া শশাঙ্কের পক্ষে উত্তরভারত অভিযান সম্ভবপর ছিল না। পূর্বভারতে স্বীয় আধিপত্য সুদৃঢ় করিয়াই শশাঙ্ক উত্তর-ভারত অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শশাঙ্ক পরবর্তী সময়ে কোন কারণবশতঃ মগধ পুনর্জয় ও অধিকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(৪৪)

এই প্রসঙ্গে হিউয়েন-সাঙের বিভিন্ন বিবরণীতে বর্ণিত পূর্বভারতের রাজ্য সমূহের আয়তনের আলোচনা প্রয়োজন।

রাজ্যের ও রাজধানীর আয়তন

রাজ্য	পরিধি (মাইল)	রাজধানী	পরিধি	রাজ্য	পরিধি (মাইল)	রাজধানী	পরিধি (মাইল)
মগধ	১০০০ (৮৩৩·৩)	মগধ		সমতট	৬০০ (৫০০)	সমতট	৪ (৩·৩)
হিরণ্য পর্বত	৬০ (৫০)	হিরণ্য পর্বত	৮ (৩·৩)	তাম্রলিপ্তি	২৮০(২৩৩·৩) ৩০০ (২৫০)	তাম্রলিপি	২ ১·৬
চম্পা	৮০০ (৬৬৬·৭)	চম্পা	৮ ৬· (৬)				
কর্ণসুবর্ণ	৪০০ (৩৩৩·৩)	কর্ণসুবর্ণ		কর্ণসুবর্ণ	৮৯০(৭৪১·৭) ৯০০(৭৫০)	কর্ণসুবর্ণ	৪ (৩·৩
পুণ্ড্রবর্ধন	৮০০ ৬৬৬·৭	পুণ্ড্রবর্ধন	৬·(৮) (৫) (৬.৬)		২৮০(২৩৩·৩ ৩০০(২৫০)		
কামরূপ	২০০০ (১৬৬৬·৬)	কামরূপ	৬ (৫)	ওড্র	১৪০(১১৬·৬)	ওড্র	৪ (৩·৩)

উপরিউক্ত নির্ঘণ্ট হইতে প্রতীয়মান হয় যে, চীন পরিব্রাজকের বিবরণী সমূহে কর্ণসুবর্ণের পরিধি বিভিন্ন—১৪০০, ১৫০০—৪৪৫০ এবং ৪৫০০ লী। ওয়াটার্স কর্তৃক অনুদিত সংখ্যা (৪৫০০ লী) গ্রাহ্য হইলে রাজ্যসমূহের আয়তনের আকার-অনুসারে কর্ণসুবর্ণের স্থান তৃতীয়। কামরূপ ব্যতীত পূর্বভারতের উল্লিখিত রাজ্যসমূহের উপরেই শশাঙ্কের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। কর্ণসুবর্ণ সাম্রাজ্যের সাকুল্য-আয়তন ৬২৩০ (৫১৯১·৬) ছিল। সুতরাং শশাঙ্ক এই বিশাল কর্ণসুবর্ণ - সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। শশাঙ্ক প্রকৃতই মহারাজাধিরাজ আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন। উত্তরভারতে আধিপত্য সংস্থাপনের নিমিত্ত মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কই বাঙলাদেশকে সর্বপ্রথম দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী পাল নৃপতিগণ সমর অভিযান পরিচালনা পূর্বক উত্তরভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে বাঙলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। আনুপূর্বিক আলোচনা হইতে মনে হয় যে, কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক হর্ষমালোক ঝটিকা দ্বারা তমসাচ্ছন্ন বা পরিম্লান হন নাই। উপরন্তু জীবদ্দশা পর্যন্ত শশাঙ্ক পূর্বভারতে অধিকতর দীপ্তিশালী হইয়াই মহারাজাধিরাজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শশাঙ্কের মৃত্যুকাল

(৪৫)

শশাঙ্কের জীবিতকাল অবিদিত। বেভারিজের মতে শশাঙ্কর মৃত্যু সময় ৬১৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী নহে। কিন্তু এই মতবাদ গঞ্জাম লেখ দ্বারা অপ্রমাণিত। ল্যাসেন মন্তব্য করিয়াছেন যে, শশাঙ্ক ৬১৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং শীলাদিত্যের রাজত্বকাল পর্যন্ত তাঁহার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষিত ছিল। ল্যাসেনের অভিমতও গ্রাহ্য নহে ; কারণ রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পরই হর্ষবর্ধন ৬০৬ ৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন।

চীন পরিব্রাজকের বিবরণী পাঠে মনে হয় যে, শশাঙ্ক উত্তরভারত হইতে প্রত্যাগমনের পথে বৌদ্ধস্মৃতি সমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যু-বর্ণনা প্রসঙ্গে সি ইউ কিতে লিখিত আছে যে, বুদ্ধ গয়ায় বৌদ্ধ সৌধ-ধ্বংস,

বোধিবৃক্ষ উৎপাটন এবং বুদ্ধমূর্তি অপসারণ প্রচেষ্টার অনন্তর কর্ণসুবর্ণরাজ সন্ত্রাসগ্রস্ত হইয়া অতীব যন্ত্রণাদায়ক কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই ব্যাধিতে তাঁহার শরীর গলিত মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। অনন্তর শশাঙ্ক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। সে-কিয়া-ফাঙ-চেতেও অনুরূপ উক্তি বিদ্যমান। সুতরাং মনে হয় যে, বুদ্ধগয়ায় ঘটনার কিয়ৎ পরেই শশাঙ্ক প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। যদি উত্তরভারত হইতে কর্ণসুবর্ণে প্রত্যাগমনের পথে বোধিবৃক্ষ উৎপাটন প্রচেষ্টার মতবাদ গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ৬০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দের পরেই শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছিল। এই অনুমান চীন পরিব্রাজকের অন্য বর্ণনা দ্বারাও সমর্থিত।

(৪৬)

সি-ইউ কির বিবরণীতে লিখিত আছে যে, শশাঙ্ক বোধিবৃক্ষ সমূলে উৎপাটনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। জীবন চরিতের বর্ণনা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বুদ্ধের জীবদ্দশায় বোধিবৃক্ষ কয়েকশত ফুট উচ্চ ছিল। কিন্তু হিউয়েন সাঙের বুদ্ধগয়া পরিভ্রমণের সময়ে বোধিবৃক্ষ মাত্র ৫০ ফুট উচ্চ ছিল। শশাঙ্ক বোধিবৃক্ষ উৎপাটন করিয়াছিলেন এবং হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ সময়ে ইহা ৫০ ফুট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ন্যূনপক্ষে ৩০ বৎসরের পূর্বে বোধিবৃক্ষের ৫০ ফুট বৃদ্ধিপ্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। হিউয়েন-সাঙ্ ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধগয়া পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শশাঙ্ক ৬০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে (৬৪৭—৩০ = ৬০৭) বোধিবৃক্ষ উৎপাটন করিয়াছিলেন। অতএব ৬০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দের অনতিপরেই শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছিল। এই তথ্যবিবৃতি অনুসারে হিউয়েন-সাঙের বুদ্ধগয়া ও কর্ণসুবর্ণ পরিদর্শনের (৬৩৭-৩৮ খ্রীঃ) বহুপূর্বেই শশাঙ্ক পরলোকগমন করিয়াছিলেন।

(৪৭)

শশাঙ্কের উপরিউক্ত মৃত্যুকাল নির্ধারণ লেখমালাপ্রসূত তথ্যবিরুদ্ধ। গঞ্জাম লেখ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শশাঙ্ক ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজাধি-

রাজ রূপে জীবিত ছিলেন। মেদিনীপুর তাম্রলিপির গৌড়-বৎসর ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ ধার্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, শশাঙ্ক ন্যূনপক্ষে উক্ত বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইয়ান্-চোয়াঙের ভ্রমণ-বিবরণে লিখিত আছে যে, বোধিবৃক্ষ এক রাত্রেই ১০ ফুট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই অলৌকিক বর্ণনের যথার্থতা স্বীকার্য নহে। ইয়ান্ চোয়াঙের বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, তাঁহার বুদ্ধগয়া পরিদর্শনের (৬৩৭ খৃঃ) কিয়ৎ পূর্বে বোধিদ্রুম উৎপাটন সংসাধিত হইয়াছিল। এই উক্তি অনুসারে শশাঙ্ক ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের অনন্তরই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। উক্ত অনুমান হিউয়েন-সাঙের অন্য উক্তি দ্বারা স্বীকৃত। ৬১৯ অথবা ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের পরে শশাঙ্ক কত বৎসর জীবিত ছিলেন তাহা অবিদিত। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতে শশাঙ্ক ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের কিয়ৎ পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ইয়ান চোয়াঙ ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মগধ পরিদর্শনের সময় শশাঙ্ককে 'অধুনাতন' বা 'অচিরগত রাজা' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। ওয়াটার্সের অনুবাদে লিখিত আছে যে, 'অধুনাতন কালে' কর্ণসুবর্ণরাজ বুদ্ধ-পদ চিহ্ন বাহক শিলা ফলক গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন সে-কিয়া-ফাঙ-চেতেও 'অধুনাতন কালের' উক্তি বর্তমান। কিন্তু 'অধুনাতন কালের' প্রকৃত সময় নির্দেশ অবিদিত। উপরন্তু এই উক্তি হিউয়েন-সাঙের অন্য বর্ণন বোধিদ্রুম উৎপাটন প্রচেষ্টার পরবর্তী কোন সময় বিরুদ্ধ। শশাঙ্ক ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে দেহত্যাগ করিলে হিউয়েন সাঙের নিকট হইতে সুস্পষ্ট উক্তি প্রত্যাশা করা অন্যায় নহে। কিন্তু কর্ণসুবর্ণ পরিদর্শনের সময় হিউয়েন-সাঙের বিবরণীতে শশাঙ্কর মৃত্যু ও কর্ণসুবর্ণের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কিত কোন প্রত্যক্ষ উক্তির অবিদ্যমানতা বিস্ময়কর। হিউয়েন-সাঙের উক্তির—'অধুনাতন কালে'—কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য বোধগম্য নহে। অধুনাতন অর্থে ১০-১২ বৎসর হওয়াও অসম্ভব নহে।

(৪৮)

হিউয়েন-সাঙ পূর্বভারতের রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিপতিগণের ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কিত কোন তথ্যই পরিবেশন করেন নাই। কিন্তু তাঁহার

বিবরণী পাঠে মনে হয় যে, কর্ণসুবর্ণ ও সন্নিকটস্থ রাজ্য সমূহে শান্তি বিরাজমান ছিল। অতএব হিউয়েন সাঙের পরিভ্রমণের পূর্বে এবং শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে কর্ণসুবর্ণে ও সংলগ্ন রাজ্য সমূহে হর্ষবর্ধনের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু অনুক্রম ঘটনা প্রবাহের বিচারে হর্ষবর্ধন ৬৪১-৪২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে পূর্বভারতে প্রভুত্ব সংস্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং হিউয়েন সাঙের পরিভ্রমণের পূর্বে হর্ষ কর্তৃক কর্ণসুবর্ণ বিজয়ের অনুমান স্বীকার্য নহে। হিউয়েন সাঙের পরিদর্শনের পূর্বেই উক্ত রাজ্য সমূহ হর্ষবর্ধনের প্রভুত্বাধীনে থাকিলে চৈনিক পরিব্রাজক নিশ্চয়ই স্পষ্টাকারে নির্দেশ লিপিবদ্ধ করিতেন। এই প্রসঙ্গে হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে অনেক রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনের অবিদ্যমানতা উল্লেখনীয়। উপাদান তথ্যের বিচারে মনে হয় যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর এবং হিউয়েন সাঙের পরিভ্রমণের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ৬৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন সম্ভবতঃ পূর্ব্বভারতে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বিবরণ হইতে শশাঙ্কের মৃত্যুকাল নিরূপণ সম্ভবপর নহে। জ্ঞাত তথ্যানুসারে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ৬২৯-৬৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে শশাঙ্ক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন—সম্ভবতঃ ৬৩৮ খৃষ্টাব্দের অনতিপূর্ব্বে, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত শশাঙ্কের উত্তর ভারত হইতে প্রত্যাগমনের সময় বুদ্ধগয়ায় ধ্বংসকার্য সমাধানের বর্ণন-বিরুদ্ধ। কিন্তু যদি স্বীকার করা যায় যে, শশাঙ্ক ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের অনতিপূর্ব্বে দ্বিতীয়বার মগধ গয়া জয় করিয়াছিলেন তাহা হইলে হিউয়েন সাঙের কর্ণসুবর্ণ রাজার মৃত্যুসম্পর্কিত উক্তি গ্রহণযোগ্য। সুতরাং শশাঙ্কের পরলোকগমনের নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ সম্ভবপর নহে। বাঙলার প্রথম সার্বভৌম নৃপতি শশাঙ্কের জন্মমৃত্যু সম্পর্কিত ইতিকথা অদ্যাপি তমসাচ্ছন্ন।

শশাঙ্ক ও বৌদ্ধধর্ম

(৪৯)

হিউয়েন সাঙ, বাণভট্ট, মঞ্জুশ্রীমূলকল্প প্রভৃতির বর্ণনা-সমূহে কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষী, বুদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন বিনাশকারী এবং বৌদ্ধ মঠ

ও বিহার-বিধ্বংসী রূপে আখ্যাত। চীন-পরিব্রাজকের বিভিন্ন বিবরণীতে লিখিত আছে যে, হর্ষবর্ধনকে সিংহাসনে আরোহণ করিবার নির্দেশ প্রদান সময়ে বোধিসত্ত্ব স্বয়ং শশাঙ্কের সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। সি-ইউ-কীর বর্ণনায় বোধিসত্ত্ব হর্ষবর্ধনকে বৌদ্ধবিদ্বেষী কর্ণসুবর্ণরাজ কর্তৃক বিধ্বস্ত দেশমাতৃকার পুনরুদ্ধারপূর্বক প্রেম ও মৈত্রী দ্বারা তাহাকে শাসন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইয়ান-চোয়াঙের বৃত্তান্তে বোধিসত্ত্ব কর্ণসুবর্ণরাজ কর্তৃক অবনত বৌদ্ধধর্মকে পুনঃউত্তোলন পূর্ব্বক দেশ-শাসন করিবার আজ্ঞা করিয়াছিলেন। এমন কি বোধিসত্ত্ব স্বয়ং হর্ষবর্ধনকে এই কার্যে সাহায্য করিবার আশ্বাসও প্রদান করিয়াছিলেন। সে-কিয়া-ফাঙ-চেতেও অনুরূপ উক্তি বর্তমান। বোধিসত্ত্ব হর্ষবর্ধনকে কর্ণসুবর্ণরাজ কর্তৃক বিধ্বস্ত বৌদ্ধধর্মের পুনরুদ্দীপন কার্যে বিনিয়োগ করিতে নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

(৫০)

এতদ্ব্যতীত হিউয়েন-সাঙের বিভিন্ন বিবরণীতে শশাঙ্ক কর্তৃক বৌদ্ধ স্মৃতিচিহ্নসমূহের ধ্বংসকার্যের অলৌকিক কাহিনী বর্ণন বর্তমান। সি-ইউ-কীতে লিখিত আছে যে, কর্ণসুবর্ণরাজ সাংকাসিয়ায় বৌদ্ধগণের উপর উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ায় প্রত্যাগমনের পথে পাটলীপুত্রে আগমন করিয়া কর্ণসুবর্ণরাজ বুদ্ধপদচিহ্ন-বাহক শিলাফলককে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত শিলাফলক মুহূর্তের মধ্যে পূর্বাকারে রূপায়িত হইয়াছিল। তৎপরে কর্ণসুবর্ণরাজ বুদ্ধপদচিহ্ন বাহক শিলাখণ্ড গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিলাফলক পুনঃ স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইয়ান-চোয়াঙের বিবরণে বিবৃত আছে যে, বুদ্ধপদচিহ্ন বিলোপ সাধনকার্যে ব্যর্থ হইয়া কর্ণসুবর্ণরাজ শিলাখণ্ডটি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিলাফলক পুনরায় স্বীয়স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিল। সে-কিয়া-ফাঙ-চের বর্ণনে শশাঙ্ক বুদ্ধপদচিহ্ন ঘর্ষণ করিয়া উচ্ছেদ সাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার শত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল; পদচিহ্ন পুনরুদ্দীপ্ত হইয়াছিল। হিউয়েন-সাঙের বিভিন্ন বিবরণীতে বুদ্ধপদচিহ্নবাহক শিলাখণ্ডের বিনাশ

সাধনের কাহিনী ভিন্ন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জীবন চরিতে বুদ্ধ পদচিহ্নমূলক শিলাফলকের বর্ণন বর্তমান। কিন্তু কর্ণসুবর্ণরাজ কর্তৃক উহার বিনাশ সাধনের প্রচেষ্টার কাহিনী অবর্তমান।

(৫১)

সি-ইউ-কী ইয়ান-চোয়াঙ এবং সে-কিয়া-ফাঙ-চের বিবরণীতে কর্ণসুবর্ণরাজ কর্তৃক বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধস্মৃতিচিহ্ন নিদর্শন, বুদ্ধমূর্তি প্রভৃতি ধ্বংস প্রচেষ্টার পূর্ণাঙ্গ কাহিনী বিদ্যমান। সি-ইউ-কীতে লিখিত আছে যে, শশাঙ্ক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-নিকেতন ধ্বংস করিয়া অন্তর্ভূমি জলাশয় পর্যন্ত মৃত্তিকা খনন পূর্বক বোধিদ্রুমের মূল উৎপাটনের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিম্নস্থ মূলের সন্ধান করিতে পারেন নাই। অতঃপর বোধিবৃক্ষকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য অগ্নি সংযোগ করিয়া ইক্ষুরস দ্বারা সিক্ত করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে উল্লেখনীয় যে, সি-ইউ-কীর এবং ইয়ান-চোয়াঙের বিবরণীর তথ্য অনুসারে পূর্বে অশোক এবং তাঁহার মহিষী বোধিবৃক্ষ ধ্বংসের অনুরূপ প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। বোধিবৃক্ষ পুনর্বর্ধিত হইলে অশোক দ্বাদশ ফুট প্রাচীর বেষ্টনী দ্বারা বৃক্ষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙ অশোক নির্মিত উক্ত প্রাচীর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অতঃপর 'সম্প্রতি কালে' বৌদ্ধবৈরী ও বিধ্বংসকারী কর্ণসুবর্ণরাজ অন্তর্ভূমি জলাশয় পর্যন্ত বোধিদ্রুমের মূল ছেদন করিয়া অগ্নিসংযোগ পূর্বক ধ্বংস করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। সে-কিয়া ফাঙ চের বর্ণনায় কর্ণসুবর্ণরাজ বোধিবৃক্ষ কর্তন করিয়া অন্তর্ভূমি জলাশয় পর্যন্ত উহার মূল উৎপাটন করিয়াছিলেন। কিন্তু মূলের নিম্নস্থ উৎপত্তি স্থলের সন্ধান করিতে পারেন নাই। উক্ত ত্রয়ী চৈনিক বিবরণে বোধিবৃক্ষের অলৌকিক পরিত্রাণের উক্তি বর্তমান। হিউয়েন সাঙের বুদ্ধগয়া পরিভ্রমণের সময় বোধিদ্রুম ৪০-৫০ ফুট উচ্চ ছিল। ইয়ান্ চোয়াঙের বর্ণনায় বিবৃত আছে যে, উক্ত ঘটনার কতিপয় মাস পরে অশোকের বংশধর মগধের রাজা পূর্ণবর্মার ধর্মনিষ্ঠ প্রয়াসের ফলে বোধিদ্রুম পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিল এবং একই রাত্রেই ১০ ফুট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া-

ছিল। অতঃপর রাজা পূর্ণবর্মা ২৪ ফুট প্রাচীর দ্বারা বোধিদ্রুমকে রক্ষণ করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙের বুদ্ধগয়ায় পরিভ্রমণের সময় বোধিদ্রুম উক্ত প্রাচীর হইতে বিংশতি ফুট উচ্চ ছিল। সুতরাং ইয়ান্ চোয়াঙের বর্ণনে বোধিবৃক্ষ তৎসময়ে ৪৪ ফুটের অধিক উচ্চ ছিল না।

(৫২)

উপরিউক্ত ত্রয়ী বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, শশাঙ্ক কর্তৃক সমূলে বোধিবৃক্ষ ধ্বংসের সর্বপ্রকার উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু জীবন চরিতে-কর্ণসুবর্ণরাজ দ্বারা বোধিবৃক্ষ ধ্বংসের উক্ত কাহিনীর অবিদ্যমানতা বিস্ময়কর। জীবনচরিতে বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধের জীবদ্দশায় বোধিদ্রুম কয়েকশত ফুট উচ্চ ছিল। কিন্তু দুর্মতি নৃপতিবর্গ কর্তৃক ক্রমাগত কর্তনের ও ধ্বংসের ফলে হিউয়েন সাঙের পরিভ্রমণের সময় বোধিদ্রুম মাত্র ৫০ ফুট উচ্চ ছিল। জীবন-চরিতের বর্ণনায় বোধিবৃক্ষ ধ্বংসের কাহিনীতে কোন নৃপতির নাম উল্লিখিত হয় নাই।

হিউয়েন সাঙ বর্ণিত বোধিদ্রুম উৎপাটন প্রচেষ্টার পর কর্ণসুবর্ণরাজ সন্নিকটস্থ মন্দিরে সংরক্ষিত পূত বুদ্ধমূর্তি বিনষ্ট করিতে মনঃস্থির করিয়াছিলেন। সি-ইউ-কীর বিবরণীতে লিখিত আছে যে শশাঙ্ক বুদ্ধমূর্তির সাম্য ও মনোমুগ্ধকর অবয়ব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া মূর্তি বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ পূর্বক গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে উক্ত বুদ্ধমূর্তি অপসারণ করিয়া তৎস্থলে মহেশ্বরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এক রাজ-কর্মচারীকে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। রাজাজ্ঞাধারী কর্মচারী বুদ্ধমূর্তি অপসারণ কার্যে সন্ত্রস্ত হইয়া উহার চারিদিকে একটি প্রাচীর নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। তৎপর উক্ত প্রাচীরের উপর মহেশ্বরের মূর্তি চিত্রিত বা তৈয়ার করিয়াছিলেন। রাজকর্মচারীর কার্যাবলী কর্ণগোচর হইলে কর্ণসুবর্ণরাজ ভীতত্রস্ত হইয়া উক্ত কর্মচারীকে প্রাচীর ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন। ইয়ান্ চোয়াঙের বর্ণনে বুদ্ধমূর্তি অপসারণ পূর্বক মহেশ্বরের মূর্তি স্থাপনের নিষ্ফল প্রয়াসের উল্লেখ বর্তমান। সে-কিয়া-ফাঙ-চের বিবরণে

কর্ণসুবর্ণরাজ কেবলমাত্র বুদ্ধমূর্তি ভগ্ন করিবার নিমিত্ত মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন।

(৫৩)

সি-ইউ-কীর ও সে-কিয়া-ফাঙ-চের বিবরণীতে লিখিত আছে যে, বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধ বিদ্বেষী কার্যক্রমের ফলে কর্ণসুবর্ণরাজ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গের মাংসপিণ্ড গলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সূর্যউপাসক ও কুষ্ঠরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শাকদ্বীপী-ব্রাহ্মণদিগের প্রয়াসে শশাঙ্ক রোগমুক্ত হইয়াছিলেন।

পুরাণের বর্ণন অনুসারে কৃষ্ণপুত্র সাম্ব কুষ্ঠরোগ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগকে ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। রোগমুক্ত হইবার পরে কর্ণসুবর্ণরাজ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগকে বাঙলাদেশে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণই অধুনা বাঙলাদেশে আচার্য-ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। কর্ণসুবর্ণরাজ রোগমুক্ত হইবার অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অনুসারে বুদ্ধগয়ায় উল্লিখিত ঘটনার কিয়ৎসময় পরে শশাঙ্ক দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

———

স্মৃতিকথা

রমেশচন্দ্র মজুমদার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা প্রায় সাত বছর পূর্ণ হবে, এমন সময় ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হল। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয় বটে কিন্তু পূর্ব বাংলার বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের মধ্যে একটি আন্দোলন চলতে থাকে। এই আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইংরাজ সরকার এই বলে তাদের আশ্বাস দিলেন যে, পূর্ব বঙ্গের ঢাকা শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। মুসলমানেরা এতে খুবই খুশী হলেন বটে, কিন্তু হিন্দুদের মনে অসন্তোষ দেখা দেয়। তাঁরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করলেন। সাধারণতঃ যাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকতেন, তাঁরাও এবার এই প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন রাসবিহারী ঘোষ এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের প্রধান যুক্তি হল এই যে, প্রশাসন ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার বদলে এখন সাংস্কৃতিক বিভাগ করা হচ্ছে। ফলে, এতে আরও গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রমেই এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে, বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ হিন্দুদের এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, তাদের এমন আশঙ্কার কোন কারণ নেই। কারণ ঢাকায় যে বিশ্ববিদ্যালয় হবে তার ক্ষমতা এবং অধিকার ঢাকা শহরের দশ মাইল পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এই সঙ্কীর্ণ পরিধির বাইরে সমগ্র পূর্ব বাংলা পূর্বের মতই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে। এরপর এই নতুন বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিকল্পনা করার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই সময় থেকে ভারত সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ বা তারও কিছু বেশী টাকা আলাদা করে রেখে দিতেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং আরও কয়েকটি কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে অনেক দেরী হয়। এ সম্বন্ধে স্যার আশুতোষের কাছে একটি খবর

শুনেছিলাম, যা এখনও সাধারণের অজানা। সে কথাটি তাই এখানে লিখে রাখছি। একদিন বিকালে সেনেট হাউস থেকে বাইরে আসছি, দেখি স্যার আশুতোষ তাঁর গাড়ীতে উঠছেন। আমাকে ডেকে বললেন, 'চলো, আমার সঙ্গে।' আমি তখন ভবানীপুরে থাকি। গাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। পথে স্যার আশুতোষ অনেক বিষয়ে অনেক কথা বললেন; এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে খবরটি আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। স্যার আশুতোষের কথা তাঁর নিজের ভাষাতেই সংক্ষেপে বলছি: "একদিন হাই কোর্টে গেছি, এমন সময় বড়লাটের বাড়ী থেকে জরুরী মার্কা এক চিঠি পেলাম। খুলে দেখি বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী লিখেছেন যে, হাই-কোর্ট থেকে ফেরার পথে আমি যেন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে যাই। চিঠিতে যে সময় লেখা ছিল, ঠিক তখনই আমি গেলাম। যাওয়া মাত্রই প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাকে একেবারে সোজা বড়লাটের কামরায় নিয়ে গিয়ে এবং সেখানে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন। বড়লাট ঘরে ঢুকে দুএক কথার পরেই আমাকে বললেন, "দেখো, এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তোমরা খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করছ। এ বিশ্ববিদ্যালয় আমরা করবই। কিন্তু আমি গোলমাল ভালবাসি না। এই বিরোধী দলের মধ্যে যে তুমি একজন প্রধান তা আমি জানি এবং তোমার প্রতিবাদকে আমি ভয় করি। তুমি তো জান আমি কূটনীতি বিভাগে ছিলাম। কাজ উদ্ধারের রীতি আমার ভালই জানা আছে। তোমাকে আমি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করছি—তোমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কি পেলে তুমি এই প্রতিবাদ বন্ধ করতে রাজী আছ? আমি এর জন্য যথোচিত মূল্য দেব।" হঠাৎ এই প্রস্তাব শুনে আমি প্রথমে কিছুই স্থির করতে পারলাম না। কিন্তু বড়লাট চাইলেন যে আমি যেন তখনই এর একটা জবাব দিই; বাইরে গেলে অন্য লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে হয়তো আমার মতিগতি বদলে যেতে পারে। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলাম—কি বলি। তখন তিনি আবার বললেন যে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হবেই। কিন্তু তুমি ইচ্ছা করলে এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু করে নিতে পার। তখন আমি বললাম, আচ্ছা, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব না যদি ভারত সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি অধ্যাপক-

পদ সৃষ্টি করেন। বড়লাট তখনই এতে রাজী হলেন। বললেন, "তাই হবে। তোমার সঙ্গে আমার এই যে কথাবার্তা হল এটি আমার দপ্তরে ঢাকা প্যাক্ট বলে লেখা থাকবে।" এই কাহিনী শেষ করে স্যার আশুতোষ বললেন যে এভাবে আমি চারটি অধ্যাপকের পদ পেলাম। যতদূর মনে পড়ে এই চারটি পদ হল—Carmichael Professor of Ancient Indian History and Culture, Minto Professor of Economics, George V Professor of Philosophy এবং আর একটি বোধহয় Hardinge Professor of Mathematics।

এই চারটি অধ্যাপক-পদ এখনও আছে। সব শুনে আমি স্যার আশুতোষকে বললাম, "এ ঘটনার কথা বাইরের কেউ জানে না; জানার কোন সম্ভাবনাও নেই। আপনি যদি কোন স্মৃতিকথা লেখেন তবেই এ সব খবর এবং এ ধরনের সাধারনের অজানা আরও কোন কোন খবর লোকে জানতে পারবে। ইতিহাসের দিক থেকে এটা খুবই প্রয়োজনীয় মনে করি।" স্যার আশুতোষ একটু হেসে বললেন, "আমার তো এখন নিজে লেখার সময় নেই। তবে ছেলেরা এবং জামাই (প্রমথ) বড় হয়েছে। ভাবছি আমি মুখে মুখে বলে যাব, ওরা লিখে নেবে।"

সাধারণের অজানা এরকম আর একটি কথা তাঁর কাছে শুনেছিলাম। বড়লাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে প্রথম ভারতীয় সভ্য নিয়োগের কথা উঠলে স্যার আশুতোষের নামই প্রথমে বিবেচিত হয়; কিন্তু পরে স্যার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ ঐ পদে নিযুক্ত হন। স্যার আশুতোষ অবশ্য তাঁর স্মৃতিকথা লেখার বাসনা আর কাজে পরিণত করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পরে তাঁর পুত্র শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে এই ঘটনার উল্লেখ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে এ দুটি ঘটনার কথাই তাঁরা জানেন, তবে বাইরে এর প্রকাশ নেই। এরও অনেকদিন পরে কোন একটি বইএ স্যার আশুতোষকে যে এক সময় বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদে আইন-সদস্য করার প্রস্তাব হয়েছিল, একথা পড়েছি। সে বইটির নাম আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

পূর্বেই বলেছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব কাজে পরিণত হতে

অনেকদিন লেগেছিল। ১৯২১ সনের জুন মাসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। এর কয়েক মাস পূর্বে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক রেজিষ্ট্রার ফিলিপ হার্টগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। এদেশে এসেই তাঁর প্রথম কাজ হল—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়োগ এবং নিয়মকানুন প্রণয়ন করা। অধ্যাপক পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। বেতন হার ছিল এরূপ: প্রফেসার (Professor) ১০০০৲-১৮০০৲; রীডার (Reader) ৬০০৲-১২০০৲। বলা বাহুল্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার এবং এমন কি অধ্যাপকের বেতনের চেয়ে এই বেতন হার ছিল অনেক বেশী। সুতরাং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকই ঢাকায় চাকুরীর জন্য আবেদন করেন। আমি একদিন স্যার আশুতোষের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বললাম যে আমার বাড়ীর সকলের ইচ্ছা ঢাকায় চাকুরীর জন্য আমিও দরখাস্ত করি। তবে আপনার মতামত না নিয়ে নিজে কিছুই করব না স্থির করেছি। স্যার আশুতোষ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "দেখো, ঢাকায় অনেকেই দরখাস্ত করেছে এবং চাকরীও পাবে। আমি তাতে বাধা দিতে চাই না। কারণ তোমরা যদি অনেকে ঢাকায় গিয়ে অধ্যাপনা করো, তাহলে আমি বলতে পারব যে Calcutta University is the Grandmother of Indian Universities। কিন্তু তুমি যদি দরখাস্ত করো তাহলে প্রফেসারের জন্যই করতে হবে; রীডারের জন্য করলে রাজী নই।" তখনকার দিনে আঠার শ' টাকা বেতনের পদ আমাকে কেউ দেবেন, এমন আশা আমার ছিল না। বললাম, 'আপনি যদি নির্দেশ দেন, তাই করব। তবে এ চাকরী পাওয়ার আশা কম।' স্যার আশুতোষ বললেন, 'তুমি দরখাস্ত লিখে আমায় দিয়ে যাবে।' তাই করলাম। স্যার আশুতোষ বললেন যে তিনিই সেটি পাঠিয়ে দেবেন। সাধারণ নিয়ম হল যেখানে কাজ করা হয় সেই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের মারফৎই এ ধরনের দরখাস্ত পাঠাতে হয়। সুতরাং আমি তাঁর হাতেই দরখাস্তটি দিয়েছিলাম। পরে শুনেছিলাম যে কেউ কেউ তাঁকে না জানিয়ে দরখাস্ত করেছে এবং তাতে তিনি খুবই রুষ্ট হয়েছেন।

কয়েকদিন পরে রেজিষ্ট্রারের কাছে খোঁজ নিলাম আমার দরখাস্তটি পাঠান হয়েছে কি না। এসব দরখাস্ত রেজিষ্ট্রারের অফিস থেকেই যায়, এই নিয়ম।

রেজিষ্ট্রার বললেন যে কর্তা আপনার দরখাস্ত নিজেই পাঠিয়ে দিয়েছেন ; অফিসে তা দেখান নি। আমার ঔৎসুক্য হল যে উনি আমার দরখাস্তর উপর কি লিখেছেন তা জানতে পারা যায় কি না। বহু চেষ্টা করেও তা জানতে পারলাম না। এর ষোল সতের বছর পরে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েছি, তখন খোঁজ করে জানলাম যে এই সব দরখাস্ত একটি গোপনীয় ফাইলে এক লোহার সিন্দুকে থাকে এবং তার চাবি ভাইস-চ্যান্সেলারের নিজের কাছেই থাকে। আমার পূর্ববর্তী উপাচার্য যাবার সময় আমাকে দু'তিনটি এরকম চাবি দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে আমি আমার দরখাস্তটি বার করতে পেরেছিলাম। পড়ে দেখি স্যার আশুতোষ নিজের হাতে দরখাস্তর উপরে আমার সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করে প্রফেসার পদের জন্য জোর সুপারিশ করেছেন। স্যার আশুতোষ তখন অমরলোকে। আমার প্রতি তাঁর স্নেহের এই শেষ নিদর্শন দেখে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। অনেক পুরনো স্মৃতি আমার মনে জেগে ওঠে। একথা এখনও ভুলিনি।

ঢাকায় দরখাস্ত করার কিছুদিন পরে একটি চিঠি পেলাম যে কলকাতার ক্যালকাটা ক্লাবে হার্টগ সাহেবের সঙ্গে আমি যেন দেখা করি। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেখানে গেলাম। হার্টগ সাহেব আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা ধরনের কথা বললেন ; চাকরী সম্বন্ধে কোন কথা কিন্তু স্পষ্ট করে বললেন না। এর প্রায় দু'মাস পরে একটি চিঠি পেয়ে জানলাম যে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছি। ইতিহাস বিভাগে দুটি অধ্যাপকের পদ ছিল ; একটি ইউরোপের ইতিহাসের, অন্যটি ভারতীয় ইতিহাসের। ইউরোপের ইতিহাসের অধ্যাপকই বিভাগীয় প্রধান হবেন, এ কথা বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল। যদিও দুই অধ্যাপক পদেরই বেতন এক, তবে বিভাগীয় প্রধানের একটি আলাদা এ্যালাউন্স ছিল ; সেটি আমার পাওয়ার কথা নয়। বলা বাহুল্য চারশ টাকা থেকে একেবারে আঠারশ' টাকার গ্রেডে চাকরী পেয়ে খুবই আনন্দ হল। স্যার আশুতোষকে খবরটি জানাতে গেলাম। তিনি বললেন, "আমি জানি। তুমি এবং আরও কয়েকজন ঢাকায় নিযুক্ত হয়েছে, সেকথা হার্টগ নিজেই আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন। তুমি চলে যাচ্ছ, এতে আমি দুঃখিত

বটে তবে তোমার উন্নতিতে খুসী হয়েছি। একটি কথা বলে দিচ্ছি, সেখানে সর্বদা মাথা উঁচু করে কাজ করবে, ভয় করবে না। কখনও নতি স্বীকার করবে না। তোমায় এই আশ্বাস দিচ্ছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা তোমার জন্য চিরদিনই খোলা থাকবে। ওখানে যদি কোন কারণে তোমার থাকা সম্ভব না হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার ঠাঁই হবে—এটা সর্বদা মনে রাখবে।"

স্যার আশুতোষ আমায় খুব অনুগ্রহ দেখালেও, ঢাকায় যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কয়েকটি ব্যাপার ঘটে যাতে আমি খুবই বেদনা অনুভব করি। প্রথমটি হল—এই সময় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির কারমাইকেল অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর তাঁর নির্দ্ধারিত বার্ষিক চারটি বক্তৃতা দেন। শেষ বক্তৃতার দিন তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করে বললেন, "সম্প্রতি আমি একটি বৃহৎ শিলালিপি (বা তাম্রশাসন) আবিষ্কার করেছি, তাতে অনেক নূতন কথা আছে। আমার বক্তৃতার বিষয়ের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ না থাকলেও সেই শিলালিপি সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই।" স্যার আশুতোষ এবং আরও কয়েকজন অধ্যাপক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমিও ছিলাম। ভাণ্ডারকর একটি লুপ্ত পুরাণের ভবিষ্যৎ উক্তি উদ্ধৃত করে যা বললেন তার সারমর্ম হল এই যে, কলিযুগে বৃদ্ধ গঙ্গা নদীর তীরে হরতগ নামে এক অসুর জন্মগ্রহণ করবে। মূল গঙ্গার তীরে একটি পবিত্র আশ্রম আছে। সেখানে অনেক মুনি ঋষি এবং তাঁদের শিষ্যদের বাস। এই অসুর সেই আশ্রমটি নষ্ট করার জন্য নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে একে একে অনেক শিষ্যকে নিজ আশ্রয় নিয়ে যাবেন। যারা অর্থলোভে পূর্বের আশ্রম ত্যাগ করে এই অসুরের আকর্ষণে বৃদ্ধ গঙ্গার তীরে যাবেন তারাও ক্রমে অসুরত্ব প্রাপ্ত হবেন। তাদের দুর্দ্দশারও অনেক বর্ণনা তিনি করলেন। একথা অনেকেরই জানা যে, ঢাকা শহর বুড়ী গঙ্গার তীরে অবস্থিত। সুতরাং ভাণ্ডারকর যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপলক্ষ্য করেই এই কাহিনীর অবতারণা করেছেন তাতে কারুর মনে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হার্টগকে অসুর এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা সেখানে যাবেন তাঁরাও অসুরত্ব প্রাপ্ত হবেন এবং তাদের অশেষ দুর্গতি সম্বন্ধে যা তিনি বললেন তা শুনে সকলেই তাঁর

রুচির খুব নিন্দা করতে লাগলেন। স্যার আশুতোষ গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। তিনি ভাণ্ডারকরকে পরে কিছু বলেছিলেন কি না জানি না।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল : স্যার আশুতোষের ডি. এল. উপাধি প্রাপ্তির ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'তিন খণ্ডের এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই তাতে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমিও প্রায় এক বছর পূর্বে এই গ্রন্থের জন্য একটি প্রবন্ধ দিয়েছিলাম। আমার ঢাকায় যাওয়ার পর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আমার প্রবন্ধটি এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এর মধ্যে যে ভাণ্ডারকরের হাত ছিল সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ তিনিই ছিলেন এই খণ্ডের সম্পাদক। স্যার আশুতোষের নামের সঙ্গে যুক্ত এই গ্রন্থখানিতে আমার প্রবন্ধটি না থাকায় খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম। এবং সেই দুঃখের আবেগে স্যার আশুতোষকে একটি চিঠিতে ব্যাপারটি জানাই। দুচার দিনের মধ্যেই জবাব এল। স্যার আশুতোষ নিজের হাতে উত্তরে লিখেছিলেন যে এই ঘটনায় তিনি খুব দুঃখিত এবং বিস্মিত হয়েছেন এবং কেন আমার প্রবন্ধ ছাপা হয়নি তার অনুসন্ধান করছেন। আমার এই প্রবন্ধটি যাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত Journal of the Department of Letters নামক পত্রিকায় পরের সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়, সে রকম হুকুম তিনি দিয়েছেন। বাস্তবিকই এই পত্রিকার পরের সংখ্যায় (Vol.X) আমার সেই প্রবন্ধ 'The Gurjara-Pratiharas' ছাপা হয়।

এবার শেষ ঘটনাটির কথা বলছি। আমার পি. এইচ. ডির থিসিস 'Corporate Life in Ancient India' নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ঢাকায় যাওয়ার পরেই আমি একটি চিঠি পেলাম যে, যেহেতু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এখন আমার আর কোন সংযোগ নেই, সেজন্য এই বইয়ের ছাপা খরচ বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে আমি যেন বইএর সমস্ত কপি ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আমার পক্ষে তখন ছাপার খরচ বাবদ প্রায় দু'হাজার টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এ কাজ যে যুক্তিযুক্ত, তা মনে হল না। স্যার আশুতোষের মত নিয়ে এ চিঠি দেওয়া হয়েছিল কিনা জানি না; তবে আমি এ ব্যাপারটি আর তাঁর

কর্ণগোচর করিনি। পুণার ওরিয়েন্টাল এজেন্সির কাছে সামান্য রয়্যালটি নিয়ে এ বইগুলি আমি বিক্রি করে দিই এবং সেই টাকাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপার খরচ শোধ করি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার অনেক মধুর স্মৃতি জড়িত ছিল; এবং এখনও আছে। কিন্তু এরূপ কয়েকটি ঘটনা সে সময় আমার পক্ষে খুবই মনোবেদনার কারণ হয়েছিল। ইতিহাস বিভাগের শিক্ষকদের মনোবৃত্তি যেমনই হউক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব মধুর ছিল। আমার পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভের পর ছাত্রেরা সভা করে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। একটি ক্যাসকেটের মধ্যে সিল্কের উপরে এই অভিনন্দন পত্র তারা দিয়েছিল। কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীশ নন্দী সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র ছিল। সেই এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিল। আমার প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল; পরেও তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কাশিমবাজারে একবার তার বাড়ীতে অতিথি হয়ে বিপুল রাজসমাদর পেয়েছি।

ঢাকায় যাওয়ার সময় ছাত্ররা আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানায়। এর অনেক বছর পরে আমার সম্পর্কে ছাত্রদের মনোভাব কি রকম ছিল, সে কথা একটি বইয়ে পড়ে বিস্মিত ও আনন্দিত হই। বইটির নাম The Autobiography of an Unknown Indian; লেখক নীরদ চন্দ্র চৌধুরী। এই ছাত্রটির নাম আমার মনে ছিল না। সে লিখেছে যে, পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশে পড়বার সময় যাকে তারা শ্রেষ্ঠ মনে করত, তিনি ঢাকায় চলে গেলেন এবং আমার নামও সে উল্লেখ করেছে। আমার এই অজ্ঞাত ছাত্রটির পরিচয় পরে জানতে পারি। নীরদ এখন খ্যাতিমান পণ্ডিত এবং বিশিষ্ট লেখকরূপে পরিচিত। তার সঙ্গে অবশ্য এখনও আমার কোন যোগাযোগ নেই।

এই রকম অপরিচিত ছাত্রের কাছে থেকেই শ্রদ্ধা ও প্রশংসা পাওয়া শিক্ষকমাত্রেরই কাম্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রদের মনে আমার সম্পর্কে এমন মনোভাবের পরিচয় এক অপরিচিত ছাত্রের লেখায় রয়ে গেছে এ ভাবতেও এখন আনন্দ লাভ করি।

(ক্রমশঃ)

অবলুপ্তির পথে তিব্বত

কল্যাণ কুমার চক্রবর্তী

প্রাচীন গ্রীসে প্রবল প্রতাপ এথেন্স্ যখন দুর্বল মেলস্ দ্বীপটি অন্যায়-ভাবে অধিকার করিতে উদ্যত হয়েছিল তখন এথেনীয়রা মেলীয়দের বোঝায় যে তাদের বিনাবাধায় আত্মসমর্পণ করাই উচিত ; কারণ তারা আত্মসমর্পণ করে চূড়ান্ত বিনষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষা করবে আর এথেনীয়রা তাদের রক্ষা করে শোষণ করতে পারবে। তারা আরও বলে যে ক্ষমতার বৈষম্য যেখানে আকাশ ছোঁয়া সেখানে মেলীয়দের নীতিসংক্রান্ত কোন প্রশ্নই তোলা চলে না। ক্ষমতাশালী পুরুষ তার ইষ্ট-সাধন করবেই এবং দুর্বল অক্ষমের তা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

তিব্বতের প্রতি কম্যুনিষ্ট চীনের ব্যবহার এই চিরন্তন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি বিশেষভাবে কম্যুনিষ্ট বা একান্তভাবে চৈনিক নয়. তাই এই নীতির পশ্চাতে যে যুক্তিব্যূহ উপন্যস্ত করা হয়েছে তা নিতান্তই পুরাতন। তাদের আপাতঃ নূতনত্ব ও যৌক্তিকতার কারণ হল চীনের নবলব্ধ শক্তির দম্ভ (Hubris) ও স্বকীয় ন্যায়ধর্মে অটল আস্থা (Self-righteousness)। চীনের অভিলাষ আজ দূরাভিসারী—অভীষ্টসিদ্ধির ক্ষমতাও সুদূরপ্রসারী।

তিব্বতের ওপর আধিপত্য বিস্তারের পশ্চাতে চীনের প্রধান যুক্তি হল যে তিব্বত বহুদিন চীনের একটি অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিরাজ করেছে এবং চীন তিব্বতের ওপর পূর্ণ সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করে এসেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে বিংশ শতাব্দীতে এই অধিকারের কার্য্যকারিতা কিছুদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যায় বটে কিন্তু নৈতিক আধিপত্য কোনদিনই ক্ষুণ্ণ হয় নি। কম্যুনিষ্ট চীন যখন তিব্বত আক্রমণ করল তখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তিব্বতকে তার মাতৃভূমির বৃহৎ পরিবারে ফিরিয়ে আনা।

তিব্বতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে কিন্তু দেখা যায় যে চীন কোনদিনই তিব্বতের উপর যথার্থ সার্ব্বভৌম ক্ষমতা স্থাপন করতে পারেনি, এবং তিব্বত সযত্নে তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসেছে। সত্যি কথা বলতে কি, তিব্বতের

ওপর চীনের আধিপত্য বিংশ শতকের রাজনীতিবিদ্‌দের উর্বরমস্তিষ্কপ্রসূত একটি কুটিল পরিকল্পনা। ব্রিটিশদের বাকায়-রাষ্ট্রে আসক্তি ও স্বাধীন ভারতীয়দের বিশ্ববিমুখ আত্মকেন্দ্রিকতাই ছিল এর মূলে। চীন আন্তর্জাতিক এই অবস্থাবিপর্যায়ের সুযোগ নিয়ে তিব্বতকে কবলিত করল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে টুচিয়াং বা তিব্বতীরা চীনের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমের যাযাবর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল—কোকোনোর এলাকায় তারা তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেখান থেকে তারা বিতাড়িত হয় বটে কিন্তু সপ্তম-শতাব্দীতে নাম-রি-সং-ৎসান্ তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ করে শো-গাই বা ধর্মিষ্ঠ নৃপতিদের বংশ স্থাপন করলেন মধ্যতিব্বতে। প্রবাদ আছে যে গরু এবং ইয়াকের দুধে জমান সিমেন্ট্ দিয়ে তৈরী হয় তাঁর প্রাসাদ। লাডাক্, নেপাল এমন কি সুদূর বাংলাদেশেও তাঁর আধিপত্য বিস্তৃত হয়। তাঁর ঋদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাশালী পুত্র সং-ৎসান-গাম্পো চীন সম্রাটকে একটি অপমানকর চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করেন এবং বলপূর্বক চীনরাজপুত্রী ওয়েন্-চেংকে বিবাহ করেন। গাম্পোর পৌত্র টি-সাং-দেৎসানের রাজত্বকালে চীন তিব্বতকে বাৎসরিক ৫০,০০০ গজ চীনা কিংখাব উপঢৌকন দিত। নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তিব্বতীরা পশ্চিম কানসু ও পশ্চিম সেচোয়ানের বিস্তীর্ণ অংশ অধিকার করে নেয়। চীনের প্রবলপ্রতাপ তাং সম্রাটরা তখন ঐসব দৃঢ়চেতা তিব্বতী রাজাদের সমীহ করে চলতেন।

একাদশ শতাব্দীতে লাংদর্মের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিব্বত আবার বিভক্ত হয়ে গেল সহস্রমুখে। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধেই তাং রাজাদের স্থানে নূতন রাজবংশ এসেছে চীনে—সুং রাজবংশ। কিন্তু সুং রাজারা চতুর্দিক থেকে খিটান, মোঙ্গল, তুঙ্গা, তাঙ্গুট প্রভৃতি দুর্বিনীত বন্য যাযাবর দলের আক্রমণে এতই বিভ্রান্ত ছিলেন যে তিব্বতীদের এই অনৈক্যের সুযোগ নেওয়া দূরে থাক, রৌপ্য ও পদকের প্রলোভন দেখিয়ে বরং তাঁদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই যেন তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অতএব সুং রাজাদের সময়ে তিব্বতীরা তাঁদের চরম রাজনৈতিক অব্যবস্থা সত্ত্বেও স্বাধীনতা রক্ষা করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে মোঙ্গলরা চীন ও তিব্বতের রাজসিংহাসন কুক্ষিগত করল। মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খাঁ তিব্বতী লামাবাদে দীক্ষিত

হলেন। একজন শাক্যপালামাকে তিনি চীনের জাতীয় শিক্ষক ও তিব্বতের বংশানুক্রমিক শাসক নিযুক্ত করলেন। মোঙ্গলরা কিন্তু তিব্বতের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করত না। প্রায় বিশ জন শাক্য লামা রাজত্ব করার পর যখন এক কারগ্যুপালামা তাদের উচ্ছেদ করে সিত্যবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন মোঙ্গল সম্রাট তার নিরপেক্ষ দর্শকের সমুচ্চ নিরাপত্তা থেকে নামার কোন চেষ্টাই করলেন না। য়্যুয়ান্ সম্রাটদের সময় চীনের সম্রাট আর তিব্বতের লামার সম্পর্ক ছিল হোতা-পুরোহিত (Patron-priest relationship) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

চতুর্দ্দশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধে মিং সম্রাটরাও এই নীতির কোন পরিবর্তন করেন নি। সে সময়ে তিব্বতী লামারা দলে দলে চীনের রাজধানীতে এসে ভীড় করতেন এবং বিশেষ রূপে আপ্যায়িত হয়ে নানাবিধ উপহার নিয়ে দেশে ফিরে যেতেন। ইতিমধ্যে লোহিত কর্ম-পা সম্প্রদায় সিত্যলামাদের অধিকার বিচ্যুত ক'রে এবং হরিদ্রা গেলুগ্‌পা সম্প্রদায় মোঙ্গলদের সাহায্যে আবার কর্মপাদের বিতাড়িত করে। গেলুগ্‌পা সম্প্রদায়ের বংশানুক্রমিক অধ্যক্ষ দলাই লামা খাল্‌কা মোঙ্গলদের ধর্মগুরু ছিলেন। তাই কোকোনারের মোঙ্গলদের সঙ্গেই তিব্বতের এ সময় ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ছিল। সম্বন্ধের মূল-নীতি উভয়ক্ষেত্রেই এক ছিল। মোঙ্গলদের অনন্য ধর্মনিষ্ঠার ফলে তিব্বতীরা এসময় কারো অধীন হওয়া দূরে থাক্ চীন ও কোকোনারের বিপুল জনগোষ্ঠীর পারত্রিক অভিভাবকের দেশবাসী হিসাবে সম্মান পেত।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মাঞ্চুরা মিংদের পরাভূত করে চীনের সিংহাসন দখল করলেন। ১৬৫২ সালে চীন সম্রাট শী-হু দলাই লামাকে রাজধানীতে আমন্ত্রণ করে তাঁকে অভিজ্ঞান ও উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৬৮২ সাল থেকে সুরু করে ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত মাঞ্চু সম্রাটরা তিব্বতের গৃহ-বিবাদ প্রভৃতি আভ্যন্তরিক গোলযোগ এবং জুংগার ও গুর্খাদের বহিরাক্রমণের সুযোগ নিয়ে তিব্বতে পর পর চারবার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। দুইজন চীন দেশীয় অম্বান বা প্রতিভূ নিযুক্ত হন। পোটালা ও তাশি-লান্‌পোর অর্থভাণ্ডার এবং ধর্মাধিকরণের ভার তাঁদের হাতেই সমর্পণ করা হয়; দলাই-লামার নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ভারও।

কিন্তু মাঞ্চুদের অধিকার তাদের প্রচণ্ড প্রতাপ সম্রাট সেং-সু, কাও-সুং ও চিয়েন্-লুং এর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মাঞ্চু সাম্রাজ্য দুর্বল সম্রাটদের অধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতের ওপর চীনের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ল। যে সব চীনদেশীয় সৈন্য তিব্বতে নিযুক্ত হয়েছিল, তারা তিব্বতী নারীদের বিবাহ করে তাদের সদ্যোজাত সন্তানদের নাম বাহিনী তালিকায় অনুপ্রবিষ্ট করাতে লাগল, ফলে বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশই অকেজো হয়ে গেল, এবং তিব্বত সংরক্ষণের ভার উত্তরোত্তর তিব্বতী সৈন্যদের হাতে চলে গেল। ১৮৬৪ সালে নিয়ারঙ এর বিদ্রোহী অধিপতিকে তিব্বতীরাই দমন করল। সম্রাট বিজিত ভূমি দলাইলামার হাতে সমর্পণ করে আনুষ্ঠানিক নিদর্শন দিলেন তাঁর অক্ষমতার। দলাই লামা ধীরে ধীরে অন্যানদের সমস্ত ক্ষমতাই আত্মসাৎ করে ফেললেন। ১৮৮০ সালে নিয়ারঙের এক অবাধ্য শাসককে অপসারণ করতে দলাই সরাসরি অস্বীকৃত হলেন। চীন সম্রাটের নির্দেশানুসারে ব্রিটিশদের সঙ্গে দলাই এর সম্পর্ক স্থাপনেও প্রতিনিধির অসমর্থ হলেন। চীন এই সময় সহস্র বিপত্তিতে বিপর্য্যস্ত। দুটি অহিফেন যুদ্ধ ও জাপানের সঙ্গে একটি যুদ্ধে শোচনীয় পরাভব—বিদেশীর হাতে বিভাগের ভীতি—তাইপিং, মুসলিম বক্সারবিদ্রোহ—অগ্রণী ও পশ্চাদ্গামীদের মধ্যে সংগ্রাম—বন্যা, জলাভাব ও পংগপালের উপদ্রব ইত্যাদি। তিব্বতের উপর দৃষ্টি রাখার সামর্থ্য তার ছিল না। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা তিব্বতের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত হল। ব্রিটিশদের এই প্রয়াসে ব্যাকুল হয়ে মাঞ্চুরা তিব্বতে চাও-আর-ফেং এর নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে তাদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল। কিন্তু মাঞ্চুদের এই প্রচেষ্টা নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ শিখার আকস্মিক উদ্দীপনের বেশী কিছু ছিল না। দলাই-লামা তিব্বত ছেড়ে ভারতে পলায়ন করলেন। চাও তাঁকে তাঁর উপাধি থেকে বঞ্চিত করলেন এবং দলাই চীন সম্রাটের প্রতি তাঁর আনুগত্য অস্বীকার করলেন। ১৯১১ সালে তিব্বতে ক্ষীয়মাণ চীন সাম্রাজ্যের পতন হল এবং তিব্বতীরা বিশৃঙ্খল চীনাসৈন্য ও চীনা প্রতিনিধিদের আক্রমণ করে তিব্বত ত্যাগ করতে বাধ্য করল। হোতা-পুরোহিত সম্পর্কের অবসান এখানেই।

চীনের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্কের এই ইতিহাস আলোচনা করে আমরা

দেখতে পাই যে চীন যথার্থ সরাসরি আধিপত্য তিব্বতের উপর কোনদিনই দাবী করতে পারে না। তাং, সুং, য়ুয়েন্, মিং, চিং এরা কেউই চীনের অধিবাসী হান জাতির গোষ্ঠীভুক্ত নয়। সবাই বহিরাগত ভাগ্যসন্ধানী মাত্র। এরা এসে চীন এবং তিব্বত উভয়কেই তাদের প্রভাব মণ্ডলে নিয়ে এসেছে। এদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে চীন ও তিব্বত উভয়েই স্বাধীনতা অর্জন করেছে। যেহেতু চীনের সিংহাসনে বসে বিদেশীরা তিব্বতের উপর অধিকার দাবী করেছে সেহেতু বিদেশী প্রভাবমুক্ত স্বাধীন চীন স্বাধীন তিব্বতকে গ্রাস করতে পারে না।

চীনের মতে—অন্ততঃ চিয়াং-কাই-শেকের মতে—হান, মোঙ্গল, মাঞ্চু, তিব্বতী ও তুংগানরা মিলে এক চীনজাতি গঠন করেছে। কিন্তু সেন্-য়ুং-লিন্ (চিয়াং-কাই-শেকের উপদেষ্টা) তাঁর 'তিব্বত ও তিব্বতী' গ্রন্থে এই দাবীর উল্লেখই করেননি। চৌ-এন্-লাই দিল্লীতে স্বয়ং একবার বলেন যে তিব্বতীরা চীনা নয়—চীন তাদের চীনা বলে মনে করে না। তিব্বতী-বর্ম্মীয় ভাষাও চৈনিক-থাই ভাষাগুচ্ছ হতে ভিন্ন। চীনা ভাষার fixed tones ও Ideograms এতে নেই।

তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্যের অধিকার স্বীকার করে নিলেও দেখা যায় যে একমাত্র ১৭৯৩ সাল ছাড়া কোনসময়ই চীনসম্রাট প্রকৃতভাবে এই অধিকার উপভোগ করেননি। এমনকি ১৭৯৩ সালেও সম্রাট 'হরিদ্রাসম্প্রদায়ের রক্ষক' এই অভিধার চেয়ে বেশী কিছু দাবী করেননি। 'আধিপত্য' শব্দটির উদ্ভব সামন্ততান্ত্রিক আইনে এবং শব্দটি পারস্পরিক দায়িত্বের সূচক। ডাঃ এল্ ওপেনহাইমের মত এই যে সামন্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য দেশগুলির কোন সম্পর্কই নেই—সেটি একটি অর্ধ সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু তিব্বত এই শ্রেণীভুক্ত নয়। বিভিন্ন যুগে বিভিন্নদেশের সঙ্গে তার বাণিজ্যিক, এমন কি রাজনৈতিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছে, এবং আভ্যন্তরিক ব্যাপারে তার স্বাধীনতাও অটুট থেকেছে।

তিব্বত চীনের আধিপত্য কোনদিনই স্বীকার করেনি। তবে পুরোহিত-পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কের সুযোগ নিতে তার আপত্তি ছিল না। কারণ এই সম্পর্কের ফলে তিব্বত একদিকে যেমন এক বিপুল জনসংঘের আত্মিক জীবনের

অনুপ্রেরণামূলক বলে সম্মান পেত অন্যদিকে তেমনই বিদেশী আক্রমণের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে তার প্রাত্যহিক জীবন প্রবাহের স্বতন্ত্র গতি রক্ষা করে চলত। যখনই চীনের বিদেশী সম্রাটরা এই সম্পর্কটির পরিবর্তন করে রাজা প্রজার সম্পর্ক প্রবর্তন করবার চেষ্টা করেছেন তখনই তিব্বতীদের অনুক্ত অথবা সোচ্চার প্রতিবাদে তাঁরা প্রতিহত হয়েছেন। চাও-আর-ফেঙ্-এর প্রয়াসের সমূহ অপচয়ই প্রমাণ করে যে ক্ষমতার দর্পে চীনের নৈকট্য যখনই অতিরিক্ত ভাবে সত্য এবং অতিশয় ভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে তখনই তিব্বত চীনের আনুগত্য অস্বীকার করেছে। দেশনায়করা তিব্বতের নিরপত্তার জন্য যে বৈদেশিক নীতি প্রবর্তন ও অনুসরণ করেছেন সে নীতির বাস্তব অসুবিধা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষরা তাকে অস্বীকার করেছে। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে তিব্বতের ওপর চীনের আধিপত্য শুধু নীতির শুষ্ক প্রস্তরে নিখাত ছিল ; মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

তিব্বত-চীন সম্পর্কের প্রথম পর্বের শেষে দ্বিতীয় পর্ব সূচনা করলেন ভারতের ব্রিটিশ শাসকেরা।

ব্রিটিশ রাজকীয় শক্তি বুঝতে পেরেছিল যে তিব্বতের ওপর চীনের যথার্থ অধিকার কিছু নেই, তবুও প্রথম ভাগে এই সুদূর প্রাচ্যের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে তাঁরা যেন একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। তাছাড়া রাশিয়া তখন এশিয়ায় অগ্রসরমান শক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে পরাক্রান্ত, তিব্বতের সঙ্গে বুরিয়াৎ ও কালমুক্ মোঙ্গলদের মাধ্যমে তাদের আদান প্রদান চলছে এবং চেঙ্গিজ্ খাঁর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলে তারা দাবী করছে। রাশিয়ানদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্যই তিব্বতের ওপর চীনের আধিপত্য স্বীকারের প্রয়োজন ব্রিটিশরা উপলব্ধি করল। যেহেতু চীন তখন দুর্বল শক্তি, সুতরাং তার অধিকার স্বীকার করতে ব্রিটিশদের আপত্তি ছিল না। সবার উপরে তাদের ইচ্ছা ছিল তিব্বতের সঙ্গে একটি বাণিজ্য সম্পর্কের মাধ্যমে তার পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রণ করা। সোজাসুজি তিব্বত অধিকার করে এই ইচ্ছা কার্যে রূপায়িত করলে, অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি, বিশেষ করে রাশিয়া, অন্যত্র প্রভাবমণ্ডল বিস্তার করে শক্তিসাম্য সাধন ও ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করত। অথচ চীনের তাত্ত্বিক অধিকারের প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধা জানিয়ে অথচ চীনের বাস্তবিক দৌর্বল্যের সুযোগ নিয়ে

তিব্বতের উপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করা ব্রিটিশদের পক্ষে খুবই সহজ ছিল।

চীনের প্রতি তিব্বতের ভাবভঙ্গী ব্রিটিশরা শীঘ্রই বুঝতে পারল। ব্রিটিশ প্রতিনিধি George Bogle ও Samuel Turnerকে তিব্বতীরা চীনের অনুমতি ছাড়া দলাই লামার সঙ্গে দেখা করতে দিতে অস্বীকৃত হল। ১৮৯৫ সালে চীনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চেফু চুক্তি অনুযায়ী Coleman Macaulay যখন তিব্বতে প্রবেশ করে চীন ও ভারতবর্ষকে যোজিত করার চেষ্টা করলেন তখনও তাঁকে তিব্বতে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। ব্রিটিশরা তাই একদিকে যেমন তিব্বতের ওপর চীনের অধিকার স্বীকার করে নিল অন্যদিকে তেমনি তিব্বতের সঙ্গে সবলে সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হল। ১৭৯২ সালে কর্ণওয়ালিস্ গুর্খারাজকে তিব্বতের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে অস্বীকৃত হলেন, কারণ তিব্বত চীনের অধীনস্থ প্রদেশ। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ডের নেতৃত্বে একটি সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে তিব্বতীদের সোজাসুজি লাসা কন্‌ভেন্‌শ্যন-এ স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই কন্‌ভেন্‌শ্যনের দ্বারা ব্রিটিশ বাণিজ্য ব্যাপারে সর্বাধিক সুবিধা লাভ করল এবং এই স্বীকৃতিও আদায় করল যে ব্রিটিশ অনুমতি ভিন্ন তিব্বত কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারবে না। অথচ ব্রিটিশ শক্তি চীন সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিকে এই চুক্তিটি পরীক্ষা করতে দিল এবং চীনকে আশ্বাস দিল যে চুক্তি অনুযায়ী চীন তিব্বতে বিদেশী শক্তি বলে গণ্য হবে না। ১৯০৬ সালে পিকিং-এর একটি চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটেন তিব্বতের হয়ে চীনের ক্ষতি পূরণের দাবী স্বীকার করে নিল। ১৯০৭ সালে রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেন সেণ্ট্ পিটার্সবার্গের কন্‌ভেন্‌শ্যান্ স্বাক্ষর করে তিব্বতের ওপর চীনের আধিরাজ্য মেনে নিল, এবং তিব্বতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কই চীনের মাধ্যমে চালাতে রাজী হল। তিব্বতের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার না থাকলেও তিব্বতের বহির্দেশীয় ব্যবহারে ব্রিটেনের বিশেষ আগ্রহ মেনে নেওয়া হল।

এইসব আলাপ আলোচনার পেছনে রাশিয়ার ভীতি ছিল সক্রিয়। ১৮৮০ সালে দর্জিয়েফ্ নামে এক বুরিয়াৎ মোঙ্গল দলাই লামার শিক্ষক রূপে তিব্বতে অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর সঙ্গে জার নিকোলাসের সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করল।

১৯০৪ সালে একটি গোপন চুক্তির কথা শোনা যায় যে চীনকে সাহায্যের পরিবর্তে রাশিয়া তিব্বত লাভ করবে। রাশিয়ার ভীতি প্রণোদিত হয়েই কার্জন ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ড্‌ অভিযান প্রেরণ করেন। জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয়ে রাশিয়ার শক্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হ্রাস, রাশিয়ার প্রথম হুনা অনুষ্ঠিত হওয়ায় তার নূতন প্রগতিশীলতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি, ফ্রান্সের সঙ্গে ব্রিটেনের একটি Entente Cordiale হওয়ায় ফ্রান্সের বন্ধু হিসাবে রাশিয়ার প্রতি নব অনুরাগ এবং কনষ্ট্যাণ্টিনোপ্‌লে জার্মানীর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় জার্মানীর প্রতি বিরাগ এই ভীতির স্থানে একটা সৌহার্দ্য চেতনার জন্ম দিল। এই চেতনার প্রেরণা ছিল সেণ্টপিটার্সবার্গ কন্‌ভেন্‌শ্যানের মূলে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই ব্রিটেনের উদ্দেশ্যে ছিল একই—তিব্বতের উপর চীনের অধিকার স্বীকার করে রাশিয়াকে দূরে সরিয়ে রাখা। ১৯০৪ সালে ব্রিটিশ সেক্রেটারী অফ্‌ ষ্টেট্‌ তিব্বতকে "অন্তরীণ" অবস্থায় রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তখন এই Isolation-এর ব্রিটিশ অর্থ তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে তিব্বতে ব্রিটিশ প্রভাব এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে অন্য কোন শক্তি সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। অতএব তিব্বত যথার্থ অর্থে Buffer State ছিল না। ব্রিটিশ প্রভাব পরিবৃত একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। যাই হোক্‌ Buffer State-এর উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছিল। ১৯২০ সালে দলাই লামা যখন ভারতে পালিয়ে এসে লর্ড মিণ্টোকে তিব্বতকে চীনের অধিকারমুক্ত করে ব্রিটেনের সঙ্গে সরাসরি মৈত্রী গড়ে তুলতে অনুরোধ করেন, মিণ্টো তাতে রাজী হননি। রাশিয়াও দলাই লামাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে।

ইতিমধ্যে মাঞ্চুরাজাদের পতন হয় এবং দলাই লামাও দেশে প্রত্যাবর্তন করে চীনাদের বিদূরিত করলেন। চীনের নতুন জনতন্ত্র কিন্তু চীনের সাম্রাজ্য-বাদনীতি পরিহার করতে রাজী ছিল না। তিব্বতকে চীনের একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে জাতীয় সভায় আসন দেওয়া হল। পাঁচরঙ্গা জাতীয় পতাকায় তিব্বতকে একটি কালো রং-এ চিহ্নিত করা হল। তিব্বতের বিরুদ্ধে একটি সৈন্যবাহিনীও প্রেরণ করা হল তাকে আনুগত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। ব্রিটেন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলল যে যতক্ষণ পর্যন্ত না চীনের নতুন

সরকার ব্রিটেনের সঙ্গে তিব্বত সম্পর্কে একটি লিখিত চুক্তি স্বাক্ষর করবে তৎক্ষণ ব্রিটেন তাকে স্বীকৃতি দেবে না, এমন কি তাকে উপেক্ষা করে তিব্বতের সঙ্গে সোজাসুজি দ্বৈত চুক্তি স্বাক্ষর করবে। চীন বিচলিত হয়ে ১৯১৪ সালে ব্রিটিশ ও তিব্বতী প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করল – লাসা চুক্তি। এই চুক্তির ফলে চীন কয়েকটি সুবিধা পেল—দলাই লামার নির্বাচনের সংবাদ পাওয়ার অধিকার চীনকে দেওয়া হল; অন্তঃতিব্বত অঞ্চলে চীনের নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃতি পেল। কিন্তু তিব্বতের স্বার্থে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। চীনের প্রতিনিধি সভায় তিব্বতের প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার অগ্রাহ্য করা হল।

দলাই লামার নির্বাচন তিব্বতীদের হাতেই রাখা হল। বহিঃতিব্বত অঞ্চলে স্বাধীনতা স্বীকার করা হল; অন্তঃতিব্বতেও চীনকে প্রতিশ্রুত হতে হল যে তিব্বতের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, বিশেষ করে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য কখনো নষ্ট করা হবে না। কার্যতঃ অবশ্য চুক্তিটি চীনের আধিপত্য ও তিব্বতের স্বাতন্ত্র্যের পশ্চাতে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণই ঘোষণা করল। ব্রিটেন স্থির করল যে ১৯০৪ সালের লাসা কনভেনশন ও ১৯০৬ সালের Adhesion Agreement ছাড়া আর কোন তিব্বত সম্পৃক্ত চুক্তিতে চীন সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না। চুক্তি সংক্রান্ত বিবাদে ব্রিটেনই হবে বিচারকর্তা। চীন কিন্তু অন্তঃতিব্বত বহিঃতিব্বতের সীমারেখা সম্বন্ধে তিব্বতের সংগে একমত হতে পারল না এবং তাঁদের প্রতিনিধির 'initial'-কে 'signature' বলে মানতে স্বীকৃত না হয়ে 'ratification' জানাতে অস্বীকৃত হল। সমর্থন না দেওয়ায় চীন চুক্তিদত্ত সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত হল এবং ব্রিটিশ সরকারও ঐ বছরেই তিব্বতের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করে তিব্বতের অর্থনীতির ওপর ব্যাপক অধিকার বিস্তার করল। চীনের অনুচ্চারিত, অনিরূপিত, অনির্দ্দিষ্ট অধিকারের অন্তরালে ব্রিটেন তিব্বতকে দৃঢ়ভাবে নিজের ইচ্ছার অধীনে স্থাপন করল।

১৯১২ সাল থেকে সুরু করে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত তিব্বত বস্তুতঃ, এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, ন্যায়তঃ চীনের প্রভাব পরিমণ্ডল থেকে মুক্ত হয়ে রইল। নতুন চীনের সরকার তিব্বতে কোন বৃহৎ ও স্পর্দ্ধিত অংশ গ্রহণে

স্বীকৃত ছিল না। প্রথমতঃ, প্রথম থেকেই তারা সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত আপামর জাতির সাম্য ও ঐক্য ঘোষণা করে আসায় তিব্বতের ওপর পশুবলের সাহায্যে ক্ষমতা আরোপ করার পথ তাদের কাছে নৈতিক দিক থেকে অন্ততঃ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, কূটনৈতিক দিক থেকেও এইরকম চরম পন্থতি অবলম্বন করা খুব যুক্তিযুক্ত ছিল না। ১৯২৭ সালে চীন রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এই সময় তিব্বত আক্রমণ করে ব্রিটেনের শত্রুতা অর্জ্জন করা চীন সঙ্গত মনে করল না। তৃতীয়তঃ, সামরিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও এইরকম কোন প্রচেষ্টা অবাঞ্ছনীয় ছিল। Yunnan, Szechuan Ch'inghai অথবা Sinkiang এর মধ্য দিয়ে তিব্বতাভিমুখী যে কয়টি রাস্তা ছিল —সবই ছিল শক্তিশালী, নিয়ন্ত্রণ-বিদ্বেষী, অর্ধস্বাধীন সেনানায়কদের হাতে। তিব্বতে পৌঁছুবার জন্য সমস্ত পথে এদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে যেতে হত কারণ যে কোন বৃহৎ সৈন্যসমাবেশকেই এরা তাদের বিরুদ্ধে অবনমিত হবে বলে সন্দেহ করত। এই সুবিপুল অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে গিয়ে তিব্বতকে নির্জ্জিত করার মত সৈন্যবাহিনী তখন কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল না। শুধু তাই নয় তিব্বত সীমান্তে সংরক্ষিত বাহিনীর ওপরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোন আস্থা ছিল না। এরা অত্যন্ত দুর্বিনীত ও উচ্ছৃংখল হয়ে উঠেছিল। চতুর্থতঃ, বিপরীত প্রেরণার এক অভিনব জাতীয়তাবাদের সম্মুখীন হয়ে চীন সরকার তার স্বকীয় জাতীয়তাবাদ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। উত্তর-পশ্চিম চীনের Ch'inghai, Ninghsia ও Kansu প্রদেশে মুসলমানরা অত্যন্ত প্রবল ছিল। মংঙ্গোলীয় ও তিব্বতীয়বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মা-ফু-সিয়াং, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মা হুঁও ছিলেন মুস্লিম। তিব্বতের বিরুদ্ধে এঁরা একটি প্যানমোস্লেম অভিযানের উদ্যোগ করছিলেন। চীনের হান্ সরকার এই আভ্যন্তরীণ সাম্রাজ্যবাদী চেতনার মধ্যে বিপজ্জনক সম্ভাবনা দেখলেন। চীনের ঐক্য রক্ষা তিব্বতে চীনের অধিকার বিস্তারের চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। পঞ্চমতঃ, চীনের কুয়োমিন্টাং শাসকরা প্রায় সকলেই দক্ষিণ চীনের মানুষ ছিলেন, তাঁদের শাসনকেন্দ্রও ছিল একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে ক্যাণ্টন, পরে নানকিং-এ. পিকিংএ নয়। তাঁরা তিব্বতের অবস্থা সম্বন্ধে একেবারেই ওয়াকিবহাল ছিলেন না।

ষষ্ঠতঃ, অর্থনৈতিক অসুবিধাও ছিল। জাতীয় সরকার সাংহাইএর শক্তিশালী প্রেসার গ্রুপের হাতে ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিল। এই গ্রুপটি সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বাইরে জাতীয় স্বার্থের কোন অর্থ খুঁজে পেতো না। এদের একমাত্র অভিপ্রায় ছিল অসম চুক্তিগুলির সাহায্যে এবং সওদাগরি ও স্পেকুলেশনের সরল ও প্রশস্ত পথে তুহাতে অর্থ লুণ্ঠন করা। বৃথা অর্থ ও সৈন্য অপচয় করে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের এক তুষারাকীর্ণ, শৈলবন্ধুর, অনুর্ব্বর দেশ জয় করার আকাঙ্ক্ষা তাদের ছিল না। সপ্তমতঃ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১৯৩১ সালে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে চীন সমূহ বিলুপ্তির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এতই ব্যস্ত হয়ে উঠল যে তিব্বতের জাতীয় বিনষ্টির ব্যাপারে তারা বিশেষ অভিনিবেশ করতে পারল না। অষ্টমতঃ, আন্তর্জাতিক ব্যাপার ছেড়ে দিলেও আভ্যন্তরিক সমস্যাও অত্যন্ত জটিল ও কুটিল হয়ে উঠেছিল। জাতীয় সরকারের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট ও কয়েকজন সামরিক অধিনায়কের কলহের সূত্রপাত হ'ল। দেশে বিদেশী শত্রু রেখে তিব্বত জয় করতে যাওয়ার চেষ্টা খুঁটি শিথিল রেখে দড়ি দীর্ঘ করার মতই অপচেষ্টা হত। তাতে তিব্বত হয়ত জয় করা যেত, কিন্তু চীন জাতীয় সরকারের হাত থেকে খসে পড়ত। নবমতঃ, সব প্রশ্নেরই দুটো দিক আছে। তিব্বতেরও যে এসময় চীনের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির প্রতি তীব্র বিরাগ গড়ে উঠতে পারে, সে কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। তিব্বতে এই সময় জাতীয়তাবাদের আগ্রহ উদগ্র হয়ে উঠেছে। তিয়ে সিং লি'র 'তরুণ তিব্বত বাহিনী' চীনের বিরুদ্ধে ছিল সত্যি, কিন্তু তাই বলে তারা ব্রিটেনের পক্ষেও ছিল না। তারা তিব্বতকে স্বাধীন, প্রগতিশীল, ধর্মসংস্কারবিবর্জিত একটি সুঠাম রাষ্ট্রের আকৃতি দিতে চাইছিল। নতুন করে অধীনতার শৃঙ্খল পরাবার চেষ্টা হলে এরা সংগ্রামের অনমনীয় সংকল্প করেছিল। বিশেষ করে অব্যবস্থ, বহিরাক্রান্ত ও অন্তঃক্ষুব্ধ চীনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতেই তারা প্রস্তুত ছিল না। চীন তাদের সংকল্পের রূপটি সহজেই বুঝেছিল। সবশেষে, এই সব অসুবিধার বাস্তব মূর্ত্তির সামনে জাতীয় বিপ্লবের প্রারম্ভিক দাহ, আত্মোপলব্ধির দুর্বার আগ্রহ ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে এল। বিপ্লবের জন্মের সেই বিপুল উল্লাস, সেই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ক্রমশঃ ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে

পড়ল। ক্যাণ্টন থেকে নানকিংএর স্থানান্তরের পর বিশেষ করে বিপ্লবীরা সব ব্যাপারেই উত্তরোত্তর বাস্তবাতিশায়ী ভাবাতিবেগ ছেড়ে মধ্যনীতি প্রযুক্ত ফলশালার পক্ষপাতী হয়ে উঠল। নূতন অভিযান, দুঃসহ উচ্চাভিলাষের ইচ্ছা বিলীন হয়ে যাওয়ার ফলে তিব্বত নিঃশ্বাস গ্রহণ করার অবকাশ পেল।

সিমলা চুক্তি চীন অস্বীকার করার ফলে ব্রিটেন অসুবিধাগ্রস্ত হল, কারণ রাশিয়ার ঈর্ষ্যা বিরত করার জন্য চীনের অলীক আধিপত্যই ছিল একমাত্র উপায়। অগত্যা তারা ভূয়া অভিমান ও ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ঘোষণা করল যে চীন কোন চুক্তিতে রাজী না হলে তিব্বতকে চৈনিক আধিপত্যে স্বায়ত্ত শাসিত রাজ্য বলে গণ্য করা হবে। এই ভাবে চীন যে আধিপত্য চুক্তি স্বাক্ষর না করে প্রত্যাখ্যান করেছিল—তাই শাস্তি দেবার এক মধুর ছল করে তার মাথায় আবার চাপিয়ে দেওয়া হল। তিব্বত অবশ্য এই ব্রিটিশ মনোভাবের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারল না। কিন্তু অন্য সব ভাবেই তারা তাদের স্বাধীন মতে চলতে শুরু করল। ১৯২৯ সালে মিস লিউ-মান-চিং এলেন চীনের দৌত্যে এবং দলাই লামাকে আটটি প্রশ্ন করলেন। দলাইএর উত্তর থেকে জানা যায় যে তিনি হে'তা-পৃষ্ঠপোষক সম্বন্ধ পুনরুদ্বোধনে মোটেই বিরাগী ছিলেন না, মৌখিক শ্রদ্ধা পেতে ও জানাতে তাঁর অকুণ্ঠ আগ্রহ ছিল। কিন্তু এর বদলে তিনি দাবী করলেন অনেক কিছু সুবিধা—দাবী করলেন ভূমি স্বত্ব, সামরিক সাহায্য, তাঁর বিরুদ্ধবাদী পাঞ্চেন লামার চীন থেকে তিব্বতে প্রত্যাবর্তন ও চীনের স্বীকৃতি যে পাঞ্চেনের অধিকার তাশি-লান-পো মাঠের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। চীন অবশ্য রাজি হয়নি। ১৯৩৪ সালে জেনারেল হুয়ং-মা-সুং এসে দাবী করলেন যে তিব্বত বৈদেশিক ব্যবহার, দেশ সংরক্ষণ, পরিবহন, কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে মেনে চলবে। তিব্বতী সরকার পররাষ্ট্র ব্যবস্থায় চীনের নির্দেশ মানতে রাজী হল, কিন্তু কর্মচারী নিয়োগে চীনকে কোন হস্তক্ষেপের অধিকার দিতে অস্বীকৃত হল। এর পরিবর্তে তারা তিব্বতের চীনা অধিবাসীদের উপর তিব্বতী নিয়ন্ত্রণ, চীনে পলায়িত সমস্ত তিব্বতীদের সমর্পণ, Dege Nyorong, Tachich, Ssu প্রভৃতি স্থানের স্বত্বাধিকার দাবী করল এবং চৈনিক প্রতিনিধিকে ২৫ জনের বেশী সহকর্মী নিয়ে আসতে

দিতে অথবা ব্রিটেনকে বাদ দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করতে গররাজী হল। ১৯৩৩ সালে ত্রয়োদশ দলাই মারা যান এবং ১৯৪০সালে চীনের প্রতিনিধি য়্যাং-চুং-সিন ব্রিটিশ প্রতিনিধি ব্যাসিল গোল্ড-এর সঙ্গে চতুর্দশ দলাই-এর সিংহাসন আরোহণের অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। এই সুযোগে য়্যাং একজন চীনা সিয়াঁজ অফিসার ও ওয়ারলেস অপারেটার তিব্বতে বসিয়ে গেলেন। এঁরা দুইজন তিব্বতে চীনের সার্বভৌম অধিকারের অভিজ্ঞান তথা মুখপাত্র হিসাবে রয়ে গেলেন। তিব্বত এই চাতুরীর উত্তর দিল একটি Foreign Bureau স্থাপন করে এবং Kashag-এর সঙ্গে বিদেশীদের সম্পর্ক ছেদন করে। চীন এই নতুন বিভাগের ব্যবস্থা মানল না বটে, কিন্তু তিব্বত যে তাকে বিদেশী শক্তি হিসাবে দেখে সেটা খুবই বোঝা গেল। জাপানী আক্রমণের ফলে বার্মার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চীন Szechuan ও তিব্বতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করতে চাইল। ব্রিটেন রাজী হলেও তিব্বত রাজী হল না, এবং জবরীপকারী দলকে সবলে বহিষ্কৃত করল। চীন অগত্যা ব্যক্তিগত সংস্থার মাধ্যমেই তিব্বতের মধ্য দিয়ে ভারতের সঙ্গে সরঞ্জাম সরবরাহ ও বাণিজ্যিক আদান প্রদানের ব্যবস্থা করল। ১৯৪৬ সালে তিব্বতী প্রতিনিধিরা চীনের জাতীয় সভায় যোগদান করেছিল বটে, কিন্তু সে শুধু পরিদর্শক হিসাবে, প্রাদেশিক প্রতিভূ হিসাবে নয়। জাতীয় সভার সিদ্ধান্ত স্বাক্ষর করতে বলা হলে তারা সরাসরি অস্বীকার করে।

১৯৪৮ সালে তিব্বতীদের একটি ডেলিগেশ্যান ভারত ফ্রান্স, ইটালী, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে গিয়েছিল। সর্বত্রই তাদের passport স্বীকৃতি পেয়েছিল। সবশেষে ১৯৪৯ সালে তিব্বতীরা কম্যুনিষ্ট মনোভাবের জন্য চীনের সমস্ত প্রতিনিধিকেই তিব্বত থেকে বিতাড়িত করল।

ধারাবাহিক এই কয়েকটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে তিব্বতীরা ব্রিটিশদের শঠতা সত্ত্বেও চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নানাভাবে নিজেকে চীনের প্রভাবমুক্ত করতে সচেষ্ট ছিল। তাদের চেষ্টা সার্থক হয়েছিল সেটা মূল কথা নয়। মূল কথা এই যে, তারা এই চেষ্টা না করে থাকতে পারত না। তাদের এই চেষ্টার আগ্রহ তাদের স্বাধীনতার আগ্রহকেই প্রমাণ করে, প্রমাণ করে তাদের আত্মাভিব্যক্তির নিগূঢ় বেদনা। দেশের নাভিমূল থেকে এই অনুভূতির

উৎসার ; তাই এর প্রকাশও এমনি অবিরত এমনি নিরবচ্ছিন্ন। তিয়ে সিং লি' তাঁর গ্রন্থে এই অনুভূতিকে স্বীকার করেন নি এবং তিব্বতের এই চেষ্টাকে একটা সংকীর্ণ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে এই সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার পশ্চাতে ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন সামরিক নেতা। ব্রিটিশদের কাছে গিয়ানসি অথবা ভারতে এঁরা শিক্ষা পেয়েছিলেন। এঁদের ইচ্ছা ছিল ব্রিটিশদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এবং লামাদের সমূলে উন্মূলিত করে তাঁরা চীনের নিয়ন্ত্রণবিমুক্ত, ধর্মাসক্তি বিবর্জ্জিত পাশ্চাত্য সংস্কার অনুপ্রাণিত একটি বৃহত্তর তিব্বত রাষ্ট্র গড়ে তুলবেন। লি' এর মতে এদের নেতা ছিলেন শারোং। ত্রয়োদশ দলাইএর মৃত্যুর পরেই এঁরা সমধিক প্রবল হয়ে উঠেছিলেন এবং ব্রিটিশদের কাছ থেকে শিক্ষণ ও উপকরণের মাধ্যমে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন। রিচার্ডসন কিন্তু দেখিয়েছেন যে তিব্বতে তিনটি বৃহৎ মঠের লামারা ছাড়া ধার্মিক সামরিক কোন রকম pressuregrat ই ছিল না। তাছাড়া ইয়াংসির পূর্ব্বদিকের ভূমিখণ্ড কুক্ষিগত করে বৃহত্তর তিব্বত গড়ে তোলার ইচ্ছা লামাদের মনেও বেশ প্রবল ছিল—সমর নেতাদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। সমর নেতারা প্রগতিশীল ও যুদ্ধাভিলাষী ছিলেন সত্যি, কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের কখনো সাহায্য করে নি। এ ছাড়া এঁরা চীনের আধিপত্য থেকেই শুধু মুক্ত হতে উৎসুক ছিলেন না—ব্রিটেনের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার দুর্ব্বহ ভার থেকেও মুক্তি পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল ছিলেন। এঁরা pro-Chinese অথবা pro-British কিছুই ছিলেন না। এরা ছিলেন pro-Tibet। সর্বোপরি এঁদের নেতা ছিলেম কুম্‌ফালা নামে একজন লামা—শারোং নয়। সুতরাং তিব্বতের স্বাধীনতার এই প্রথম প্রয়াসকে আমরা শুধুমাত্র কয়েকজন অভিসন্ধী চক্রান্তকারীর দুর্বিনীত ক্ষমতাভিলাষ বলে অগ্রাহ্য করতে পারি না। এর পেছনে ছিল জাতীয় নেতৃত্বের সামগ্রিক সমর্থন।

চীন-তিব্বত সম্পর্কের এই দ্বিতীয় অধ্যায় বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ব্রিটেন প্রথমে তিব্বতের স্বাতন্ত্র্যের বদলে তিব্বতের ওপর চীনের আধিপত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল। চীন চুক্তির দ্বারা তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য মেনে নেয়নি, কিন্তু ব্রিটেন তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বৃহত্তর স্বার্থে তিব্বতের ওপর চীনের আধিপত্য মেনে নেয়। তিব্বত কিন্তু চীন

সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর না করায় বৃটেনের এই একক ঘোষণায় তার সমর্থন দেয় নি। চীনেরও তার অলৌকিক ক্ষমতাকে দৃশ্যরূপ দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না।

অতএব ১৯১১ সাল থেকে এবং ১৯১৪ সাল থেকে ন্যায়তঃ তিব্বত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছিল। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টি-ভি-সুং এই কথাটি স্বীকার করেন। চিয়াং-কাই-শেকের উপদেষ্টা সেন-সুং-লিন্‌ও তাঁর Tibet and the Tibetans গ্রন্থে এই মতের সমর্থন জানান। বহুদিন পর তিব্বতীরা এই প্রথম আন্তর্জাতিক সমস্যা ও সাম্রাজ্যবাদী বিজিগীষার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে জাতীয় সত্তা আবিষ্কারের পথে শিথিল ও স্খলিত পদে অগ্রসর হয়েছিল। তাদের তিমির পরিবৃত অচলায়তনের বাহিরে এসে তারা এই প্রথম বিংশ শতাব্দীর আলোকিত প্রাঙ্গণে পদার্পণ করেছিল। দৃষ্টি তাঁদের ক্ষীণ, দেহে তাদের জড়িমা, গতি তাদের মন্থর, কিন্তু অন্তরে তাদের সদ্য মুকুলিত কৌতূহল ; বক্ষে অদম্য আশা ও এগিয়ে যাবার বিপুল আগ্রহ। কিন্তু তাদের এই সদ্যোজাগ্রত অনুসন্ধিৎসা তাদের প্রতিবেশীদের কাছে গর্হনীয়, নিন্দনীয় বলে বোধ হল। নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত করে তাদের আবার পরাধীনতার কারাগারে ফিরিয়ে নেওয়া হল।

(ক্রমশঃ)

চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘ ও বন্দেমাতরম পত্রিকা

কুণাল সিংহ

প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি মতিলাল রায় চন্দননগরের বোড়াই-চণ্ডীতলায় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে কানাইলাল দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীদের সহযোগিতায় মতিলাল স্বদেশী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমা মামলা সুরু হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার মুরারিপুকুরের বিপ্লব কেন্দ্রটি ভেঙ্গে যায়। এর পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মধারার মূল কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় চন্দননগরে। সেখানে ১৯১০ সালে বিপ্লব দল গড়ে তোলেন মতিলাল রায়। পলাতক রাজবন্দীদের আশ্রয়ের স্থল ছিল মতিলাল রায়ের এই বাসগৃহ। চন্দননগরে মতিলাল রায়ের আশ্রয়ে বিভিন্ন সময়ে থেকে গিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ, রাসবিহারী বসু, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি ১০১ জন বিপ্লবী। ১৯২১ সালে মহাত্মাজীর অহিংস আন্দোলনের ডাক চন্দননগরেও এসে পৌঁছায়। গান্ধীর আশ্রমের আদর্শকে সম্মুখে রেখে ১৯২৫ সালে চন্দননগরের যুবগোষ্ঠী প্রবর্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন মতিলাল রায়ের বাস গৃহে। মতিলাল রায় হ'লেন সঙ্ঘগুরু। ১৯২৫ সালের পর থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে প্রবর্তক সঙ্ঘের একাধিক শাখা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘের কর্মতৎপরতাও অনেক বেড়ে যায়। বহুবিধ সেবা প্রতিষ্ঠান আছে প্রবর্তক সঙ্ঘের। আর সেগুলির ব্যয়ভার বহন করবার জন্য আছে বিভিন্ন অর্থ-প্রতিষ্ঠান।

ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাছে চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ সেখানকার দৈনিক বন্দেমাতরম পত্রিকাগুলি। সেখানে ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত বন্দেমাতরম পত্রিকাগুলি সংরক্ষিত আছে। ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে প্রবর্তক সঙ্ঘের এই পত্রিকাগুলির microfilm করা হয়েছে। বন্দেমাতরমের সাপ্তাহিক ও দৈনিক দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হত। চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘে দৈনিক সংখ্যাগুলিই পাওয়া যাবে। এই

পত্রিকাটির কয়েকটি প্রয়োজনীয় সম্পাদকীয় বর্তমানে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথমে যে পত্রিকাটি প্রবর্তক সঙ্ঘে পাওয়া যায় সেটি ১৯০৬ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখের। অবশ্য বন্দেমাতরমের প্রথম প্রকাশ সুরু হয় ১৯০৬ সালের ৬ই আগষ্ট থেকে। সামান্য পাঁচশত টাকা পুঁজি নিয়ে বিপিনচন্দ্র পাল পত্রিকাটির প্রকাশনা আরম্ভ করেন। কিছুকাল পর শ্রীঅরবিন্দ এই কাজে যোগ দেন। শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পালের যুগ্ম সম্পাদনায় পত্রিকাটি ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। তারপর মত-পার্থক্যের জন্য বিপিনচন্দ্র পত্রিকাটির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন। তখন থেকে সম্পাদনার ভার নেন শ্রীঅরবিন্দ, যদিও সম্পাদক হিসাবে তাঁর নাম প্রকাশিত হ'ত না। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনার কাজে শ্রীঅরবিন্দকে সাহায্য করতেন। ১৯০৬ সালের ৩১শে অক্টোবর পত্রিকাটিতে পরদিনের অর্থাৎ ১লা নভেম্বর, ১৯০৬ সালের সাময়িকী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় :—

Supplement of Bande Mataram—The Swadesi paper of India—Our policy "India for Indians."

Bande Matarm, the first November issue of the daily organ of Indian nationalism, will be the first of new and enlarged edition sold everywhere.

All the latest news of Indian nationl question —special features not hitherto attempted by other papers.

১৯০৭ সালের ২৩শে এপ্রিল পত্রিকাটিতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়।

Bande Mataram Printers and Publishers Ltd. A limited liability company with a capital of Rs. 50,000/- divided in 5,000 shares of Rs. 10 each, has been registered and called the Bande Mataram Printers and

Publishers Ltd. which has taken over the daily journal Bande Mataram.

Another distinguishing feature of the Bande Mataram will be that it is not the property or organ of a single individual, but the voice of a party. Many writers of ability are on the staff. The execution of the scheme needs time and general support from the public. It will be gradually developed and in a few months perfected.

All applications for shares and remittances should be sent to The Managing Director, 2-1, Creek Row, Calcutta.

চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘে ১৯০৬ সালের ২২শে আগষ্ট থেকে ১৯০৮ সালের ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত দৈনিক বন্দেমাতরম পত্রিকাগুলি সংরক্ষিত আছে। তবে প্রবর্তক সঙ্ঘের পরিচালকের সমস্ত যত্ন সত্ত্বেও বন্দেমাতরমের অতি জীর্ণ দশা আজ। কিছু কিছু জায়গা পাঠের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, কয়েকটি পাতার অংশ বিশেষ কাটা। তবে আশার কথা এই যে, ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে ও বোড়াই চণ্ডীতলার প্রবর্তক সঙ্ঘে বন্দেমাতরমের মাইক্রোফিল্ম কপি সংরক্ষিত আছে। কিন্তু পাঠযন্ত্রের অভাবে সেই মাইক্রোফিল্ম কপি পড়ার সুযোগ সাধারণ পাঠকের হয়ে ওঠে না। ফলে চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের পুরাতন কাগজপত্র পড়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না।

বন্দেমাতরম পত্রিকায় সংবাদ, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় ইত্যাদির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি বিষয়ের আলোচনা গবেষকদের বিশেষ কাজে আসে—বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ, বিদেশী দ্রব্য বর্জন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ ও সংবাদ, তিলক ও তাঁর কার্যাবলীর আলোচনা, রাজনীতিক্ষেত্রে মধ্যপন্থীদের (Moderate) সম্বন্ধে মন্তব্য, সুরাট কংগ্রেস, Passive Resistance (পরে এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে), বহু স্বদেশী মামলার বিচারের বিবরণ ও সেগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য। চিঠিপত্র কলমে

৩১ শে জানুয়ারী তারিখে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি পত্র প্রকাশিত হয়—A new nut for moderate leaders to crack ; an open letter to Srijut Surendranath Banerjee by an old nationalist

এ ছাড়া "স্বরাজ, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা"—এই শিরোনামায় বহু সংবাদ, প্রবন্ধ, চিঠি ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য এই অংশের অধিকাংশ সংবাদ ও প্রবন্ধই বিভিন্ন পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে।

বাংলার ইতিহাসে ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত সময়কাল এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ১৯০৫এর পর বাংলার দিকে দিকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই সময় বহু পত্রিকা ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছে. তার পর সরকারী দমন নীতির ফলে তাদের অনেকগুলির প্রকাশনা ১৯১১ সালের আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ১৯১১ সালে দিল্লীর রাজ দরবারে বঙ্গভঙ্গ রোধের কথা ঘোষণা করার পর বাংলার অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে এসেছিল। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে সন্ধ্যা, নবশক্তি ও যুগান্তরে অনেক বিপ্লবাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়। তাই এই পত্রিকাগুলির বিরুদ্ধে আইন অমান্যের অভিযোগ আসে। ফলে এই তিনটি পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর একাধিকবার অভিযুক্ত হন। একটি ক্ষেত্রে বিচার শেষ হওয়ার পূর্বেই "সন্ধ্যার" সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মারা যান। বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে। তখন বন্দেমাতরমের সম্পাদক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই মামলাটি সংঘটিত হয়। সন্ধ্যা বা যুগান্তরের মত অনলবর্ষী ভাষা ছিল না বন্দেমাতরমের। তার ভাষা মার্জিত এবং তৎকালে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় বন্দেমাতরমের মান ছিল অনেক উচ্চ। তবু সরকারের রোষ দৃষ্টিতে পড়েছিল এই পত্রিকাটি। কাগজ পত্রে কোথাও সম্পাদক হিসাবে শ্রীঅরবিন্দের নাম ছিল না। কিন্তু বন্দেমাতরম বলতে যে শ্রীঅরবিন্দকেই বোঝাতো তা সরকার পক্ষের উকিলদের অবিদিত ছিল না। সরকারী সাক্ষী হিসাবে তলব করা হয়েছিল বিপিনচন্দ্র পালকে। কারণ পত্রিকাটির পূর্বতন সম্পাদক ছিলেন তিনি। কিন্তু বিপিনচন্দ্র পাল সাক্ষ্য

দিতে অস্বীকার করলেন। তাই ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ড হ'ল তাঁর। শ্রীঅরবিন্দকে অভিযুক্ত করা সম্ভব হ'ল না।

১৯০৮ সালের ২৫শে মে তারিখে মজঃফরপুর মামলার সংবাদ প্রকাশিত হ'ল বন্দেমাতরম পত্রিকায়। মামলার সমস্ত সংবাদ বন্দেমাতরমের পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হ'য়েছে। তারপর শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর বোমা মামলার মূল আসামী হিসাবে ধৃত হ'লেন। মামলায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে উকিল নির্বাচিত হলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ১৯০৭ সালের ১২ই, ১৩ই, ১৭ই, ১৮ই, ২০শে ও ২৩শে এপ্রিল প্রকাশিত The Doctrine of Passive Resistance নামক প্রবন্ধটির সাহায্যে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দ মোটেই উগ্রপন্থীদের সহযোগী হতে পারেন না। বক্তা ও আইনজ্ঞ হিসাবে অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন। মামলার বিচারপতি ছিলেন জাস্টিস বিচক্রফট। একসময়ে তিনি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠী। চিত্তরঞ্জনের দক্ষতায় শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণ করা সম্ভব হ'ল না। মুক্তি লাভ করলেন শ্রীঅরবিন্দ। কিন্তু তাঁর মুক্তিতে অসন্তুষ্ট হলেন লর্ড মিণ্টো। ১৯১০ সালের প্রথমদিকে সংবাদপত্রে একটি বিপ্লবাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য শ্রীঅরবিন্দের নামে গ্রেপ্তারের এক পরোয়ানা জারি করা হয়। গভর্নর-জেনারেল মিণ্টো তখন লর্ড মর্লিকে লিখেছিলেন "The Government of India was of opinion that Arabindo openly preached political boycott with the intention of making government impossible. Therfore if his propaganda transgressed the criminal law, that law should unhesitatingly be put into operation against him." কিন্তু লর্ড মর্লির বাধাদানের জন্য মিণ্টো শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা থেকে বিরত থেকেছেন। আর এই সব বিতর্কের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর হয়ে পণ্ডিচেরীর দিকে রওনা হয়েছেন। পণ্ডিচেরী থেকে খবর এসেছে যে, "Arabindo was a converted sinner and that he meant to retire from the business of political agitator."

আলিপুর বোমা মামলায় শ্রীঅরবিন্দ ধৃত হওয়ার পর বন্দেমাতরম পত্রিকাটি এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে। কিছুকালের জন্য বিপিনচন্দ্র পাল পুনরায় বন্দেমাতরম প্রকাশনার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এটি প্রকাশের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পণ্ডিচেরীতে প্রস্থানের পর থেকে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সুরু। সেখানে যোগ সাধনায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন তিনি। বাংলার বিপ্লবের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

— - —

মাদাম দুপ্লেক্স

অজিত নিয়োগী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

দক্ষিণ ভারতে দুপ্লেক্স এবং মাদাম দুপ্লেক্সের কার্যকলাপের জন্য আমাদের অনেকাংশেই নির্ভর করতে হয় আনন্দ রাঙাপুলের (আনন্দ রঙ্গ পিল্লে) ডায়েরীর (Journal d' Ananda Rangapoulli) ওপর। তাঁর ডায়েরীতে তিনি পণ্ডিচেরী তথা দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে ফরাসীদের ভূমিকা সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। পণ্ডিচেরীর এই হিন্দু ভদ্রলোকের কোন পাণ্ডিত্য ছিল না ; কিন্তু যোগ্যতাবলে তিনি দুপ্লেক্সের বাণিজ্যবিষয়ক দোভাষী (dubash) নিযুক্ত হয়েছিলেন। দুপ্লেক্স ব্যক্তিগতভাবে রাঙাপুলের প্রতি কখনও কোন প্রকার অসংযত ব্যবহার করেন নি ; বরং দোভাষী পদে নিযুক্ত হওয়ার ফলে তিনি দুপ্লেক্সের খুব বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছিলেন। কিন্তু মাদাম দুপ্লেক্সের সঙ্গে রাঙাপুলের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত তিক্ত এবং কোন দিনই তাঁদের এই সম্পর্কের কোন উন্নতি ঘটেনি। রাঙাপুলে দোভাষী হিসাবে কাজ করা অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে ফরাসী কোম্পানীর ব্যবসায়ের দালালী করাটাই বেশী পছন্দ করতেন এবং ঐ পদে নিযুক্ত হওয়ার বাসনাও তাঁর ছিল। কিন্তু মাদাম দুপ্লেক্সের বিরোধিতা তাঁর বাসনা চরিতার্থ হওয়ার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তিনি একজন ভারতীয় খৃষ্টানকে ঐ পদে নিযুক্ত করেছিলেন। বলা বাহুল্য, মাদাম দুপ্লেক্সের এই পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, পণ্ডিচেরী তথা দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে মাদাম দুপ্লেক্সের হস্তক্ষেপ তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ধর্মীয় বিশ্বাসে তিনি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে মাদাম দুপ্লেক্স হিন্দু ধর্মের অনুশাসনবিরোধী কাজ করেছেন বলে তিনি মনে করতেন। আর মাদাম দুপ্লেক্সও হিন্দু অপেক্ষা খৃষ্টানদের বেশী পছন্দ করতেন এবং তাঁদের ওপর কৃপা বর্ষণ করতেন অনেক উদার

ভাবে। তাঁর ব্যক্তিগত দোভাষী উরাভু নারায়ণন্ (Uravu Narayanan) ছিলেন খৃষ্টান। দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ওপর তিনি দুর্ব্যবহার করেছেন এবং অযথা তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় খৃষ্টানদের উত্তেজিত করেছেন। সূক্ষ্ম রাজনৈতিক জ্ঞানের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও যে ভাবে তিনি ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন তার জন্য তাঁকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্যের গভর্ণর-পত্নী হিসেবে মাদাম দুপ্লেক্স যে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখবেন তা সহজেই অনুমেয়। আনন্দ রাঙাপুলেও একথা তাঁর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে এই বহুগুণসমন্বিতা রমণী—যাঁর নারীসুলভ কোমলতা এবং সৌন্দর্য্যের খ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত, পণ্ডিচেরীতে ফিরে যাওয়ার পর তাঁকে একজন অর্থগৃধ্নু এবং ক্ষমতালোলুপ রমণীর ভূমিকায় দেখি। রাঙাপুলে তাঁর ডায়েরীতে মাদাম দুপ্লেক্সের সঙ্গে তাঁর বহু সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেছেন এবং অধিকাংশ সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু ছিল অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক। অর্থ উপার্জ্জনের দিকে লক্ষ্য থাকার জন্য তিনি ন্যায় এবং অন্যায়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যের কোন সীমারেখা টানার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। বিবেকের দংশনের কাছে নতি স্বীকার করার কথাও চিন্তা করেন নি অসৎ পন্থায় অর্থ উপার্জ্জন এবং উপহার গ্রহণ করেও তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নি—তিনি প্রায়ই নানা অজুহাতে উপহার দাবী করতেন। রাঙাপুলে ডায়েরীর এক জায়গায় লিখেছেন যে, একবার মাদাম দুপ্লেক্স তাঁর কাছ থেকে বিনামূল্যে ১৫০০ সৈন্যের পোষাক তৈরী করা যেতে পারে এই আয়তনের একটি সুতী কাপড়ের থান চেয়ে পাঠান। আর একবার তিনি আনন্দ রাঙাপুলের কাছ থেকে দু'টি বড় আকারের ফুলের ছাপ-সমন্বিত সুতি বিছানার চাদর চেয়ে পাঠালেন। এ সবের জন্য মূল্য দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠত না। দুপ্লেক্সের প্রধান দোভাষী কানাকারাইয়া মুদালির মৃত্যুর পর তানাপ্পা মুদালি নামে এক ব্যক্তি তাঁর সম্পত্তি বেদখল করতে চান এবং মাদাম দুপ্লেক্স তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করার পরিবর্তে মোটা টাকার সেলামী আদায় করেন। এই ভাবে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতে সক্ষম

হন ; আবার এই সঞ্চিত অর্থ তিনি শতকরা দশ টাকা সুদের হারে ঋণ দিতেন। সে যুগের তুলনায় সুদের হার ছিল অস্বাভাবিক রকমের বেশী। অর্থ উপার্জ্জনের এই সব প্রচলিত প্রথা ছাড়াও দুপ্লেক্স এবং মাদাম দুপ্লেক্স একটি অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেন। সে যুগে পণ্ডিচেরীতে বহু ধনী হিন্দু এবং মুসলমান বাস করতেন এবং এই সব অভিজাত লোকেরা বিবাহ উৎসবাদি বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করতেন এবং সামাজিক মর্য্যাদা এবং প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা বিবাহ-উৎসবাদিতে গভর্ণর এবং গভর্ণর-পত্নীকে নিমন্ত্রণ করতেন। দুপ্লেক্স এবং মাদাম দুপ্লেক্স এই ধরনের বিবাহ উৎসবাদিতে উপস্থিত থাকতেন। রাঙাপুলে তাঁর ডায়েরীতে গভর্ণরের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বিবাহ-উৎসবের ঘটনা লিখেছেন এবং সব চেয়ে চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে লিখেছেন যে, ঐ ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার পরিবর্তে তাঁরা অর্থ গ্রহণ করতেন। কেশাসালাচেট্টি (Cechacalachetty) নামে এক ব্যক্তির দুই কন্যার বিবাহ-বাসরে উপস্থিত থেকে দুপ্লেক্স এবং মাদাম দুপ্লেক্স যথাক্রমে এক হাজার এবং একশ' টাকা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁরা হিন্দু অথবা মুসলমান পরিবারে বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার বিনিময়ে যথাক্রমে ১৫০০ টাকা এবং ২৫০ টাকা গ্রহণ করতেন। মাদাম দুপ্লেক্সের অর্থলোলুপতার ইতিহাস এইখানেই শেষ হয়নি। মাদ্রাজের পতনের পর বহু ইঙ্গ-ভারতীয় বণিক বাণিজ্যিক নিরাপত্তার জন্য মাদ্রাজ ত্যাগ করে পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। আনন্দ রাঙাপুলে দুপ্লেক্সের বাণিজ্য বিষয়ক দোভাষী। সুতরাং আইনতঃ কেবল তিনিই এই সব ধনী বণিকদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু মাদাম দুপ্লেক্স এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন। মাদ্রাজ থেকে আগত ধনী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাঙাপুলের যোগাযোগ ঘটলে তাঁদের ওপর তাঁর (রাঙাপুলের) প্রভাব শক্তিশালী হয়ে উঠবে এটা মাদাম দুপ্লেক্সের কাছে অসহনীয় হল এবং অর্থ উপার্জ্জনের এই সুবর্ণ সুযোগ তিনি হাত ছাড়া করতে চাইলেন না। তিনি আনন্দ রাঙাপুলের প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব করতে বদ্ধপরিকর হলেন এবং তাঁরই ইচ্ছানুক্রমে দুপ্লেক্স পণ্ডিচেরীতে আগত ইঙ্গ-ভারতীয় বণিকদের ব্যাপারে

তাঁকে (আনন্দ রাঙাপুলেকে) মাথা ঘামাতে নিষেধ করে দিলেন। মাদাম দুপ্লেক্স ঐ বণিক গোষ্ঠির ওপর নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা বর্ষণ করলেন এবং ফরাসীদের আশ্রয় থেকে ঐ সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করার পরিবর্তে তাঁদের কাছ থেকে মোটা টাকা দাবী করলেন। অর্থ উপার্জনের এই সব বিচিত্র পন্থা তাঁরই উর্ব্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার এবং এসব ব্যাপারে তিনি লজ্জা বোধ করতেন না। মন্তব্য প্রসঙ্গে কেবলমাত্র বলা যায় যে, অর্থ উপার্জনের এই সব রীতি সে যুগে নিন্দনীয় ছিল না ; বরং এগুলোই ছিল রেওয়াজ।

ইংরেজদের মাদ্রাজে অবস্থিত ঘাঁটি পণ্ডিচেরীর নিরাপত্তার পক্ষে ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। গভর্নর হয়ে আসার পর থেকেই দুপ্লেক্স পণ্ডিচেরীর নিরাপত্তা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য দেন এবং মাদ্রাজ আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। ফরাসী কোম্পানীর কর্তা-ব্যক্তিরা পণ্ডিচেরীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অর্থ বরাদ্দ করতেও রাজী নন। দুপ্লেক্স সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিলেন ; আর মাদ্রাজ আক্রমণের জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হতে লাগলেন। ১৭৪৭ খৃঃ দুপ্লেক্স লাবুর্দনের (Labourdonne) সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে মাদ্রাজ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। কিন্তু ১৭৪৬ খৃঃ পূর্বে মাদ্রাজ আক্রমণ সম্ভব হয়ে উঠল না। ইতিমধ্যে দুপ্লেক্স পারাদিজ (Paradis) নামে এক সৈন্যাধ্যক্ষকে ইংরেজদের ওপর গুপ্তচর বৃত্তির জন্য মাদ্রাজ পাঠালেন। তিনি মাদ্রাজ শহরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে দুপ্লেক্সকে একটা গোপন তথ্য পাঠালেন। এছাড়া মাদাম দুপ্লেক্সের এক মেয়ের বিয়ে হয়েছিল মাদ্রাজে। জামাই এবং মেয়েও ফরাসীদের জন্য বহু গোপন সংবাদ চালাচালি করতেন। কিন্তু পণ্ডিচেরীকে ইংরেজ গুপ্তচরদের কার্য্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখার জন্য দুপ্লেক্স এবং মাদাম দুপ্লেক্স বিশেষ যত্নবান ছিলেন। মাদ্রাজ আক্রমণকালে দুপ্লেক্স আদেশ দেন যে তাঁর এবং মাদাম দুপ্লেক্সের সীল করা চিঠি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির চিঠিপত্র শহরের ভিতরে অথবা বাইরে যাতয়াত নিষিদ্ধ। মাদ্রাজের পতনের পর মাদাম দুপ্লেক্স শহরের ওপর তাঁর একছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ঐ শহরে আনন্দ রাঙাপুলে এবং তাঁর অনুচরদের কার্যকলাপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হলো। মাদ্রাজের রাজনৈতিক, সামাজিক

এবং বাণিজ্যিক প্রতিটি ব্যাপারে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। শহরে কোন নতুন ঘটনা ঘটল কিনা, বণিকদের সঙ্গে কোন নতুন চুক্তি হল কি না, ফরাসী-বিরোধী কোন ষড়যন্ত্র চলছে কিনা—এ সমস্ত ব্যাপার ছিল তাঁর নখদর্পণে।

ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও ইংরেজ এবং ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হল। মাদ্রাজ ইংরেজদের ফেরৎ দেওয়া হল। ডুপ্লেক্স ব্যক্তিগত ভাবে মাদ্রাজ ফেরৎ দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন এবং এই প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে লাবুরদনের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধতাও হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে তিনি ইংরেজদের নির্বান্ধব এবং বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চেয়েছিলেন; তাই মাদ্রাজ ফেরৎ দেওয়ার পরেও ডুপ্লেক্স চুপ করে বসে রইলেন না। তিনি মাদ্রাজের কাছেই অবস্থিত ইংরেজদের আর এক আড্ডা গুদ্‌লুর (Goodelour) জয় করে নেবার চেষ্টা করলেন। আক্রমণ আরম্ভ হল ১৭৪৮ খৃঃ মাঝামাঝি। এই আক্রমণের গতি ইংরেজরা এবং দক্ষিণ ভারতের ইংরেজ পক্ষীয় সিপাহীরা প্রতিরোধ করতে পারল না এবং গুদ্‌লুরের পথে কুদালোরের (Cuddalore) পতন হল। এই অভিযানের পরিকল্পনা রচনায় এবং রূপায়ণে, গুপ্তচর বাহিনীর পরিচালনায় এবং সৈন্যবাহিনী মোতায়েন ব্যাপারে মাদাম ডুপ্লেক্স অসাধারণ বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। রাঙাপুলে তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন যে, এই যুদ্ধের সময় মাদাম ডুপ্লেক্স এতই ব্যস্ত ছিলেন যে বিশেষ পার্বন উপলক্ষে গীর্জায় আয়োজিত উৎসবে যোগদানের তিনি সময় পাননি। ডুপ্লেক্স নিজেও এই আক্রমণের সাফল্যে খুশী হয়েছিলেন এবং অনেকের কাছেই স্বীকার করেছেন যে সমস্ত কৃতিত্বটাই মাদাম ডুপ্লেক্সের প্রাপ্য। গুদ্‌লুর আক্রমণের ছ'মাস আগে থেকে তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন এবং বহুসংখ্যক বিশ্বস্ত গুপ্তচর-বৃন্দের সহায়তায় গোপন খবরাখবর সংগ্রহ করে নিপুণ শিল্পীর মতো যে আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা রচনা এবং রূপায়ণ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কুদালোর জয় দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। গুদ্‌লুর আক্রমণের জন্য মাদাম ডুপ্লেক্স দীর্ঘদিন পরিশ্রম করেছিলেন, বহু কূটনৈতিক বুদ্ধির প্রয়োগ করেছিলেন—

কিন্তু সৈন্যবাহিনী পরিচালনার ত্রুটিতে, সৈন্যবাহিনীর বিশ্বাসঘাতকায়, সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যাপ্তেঁ দ্য মেঁভির (Captain de Mainvillo) অপরিণামদর্শিতায় এবং রণক্ষেত্রে সঠিক খবরাখবর সময়মত প্রেরণে বিলম্ব ঘটায় ফরাসীদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং তারা কুদালোর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আনন্দ রাঙাপুলে অবশ্য এই শোচনীয় বিপর্যয়ের জন্য মাদাম দুপ্লেক্সের উদ্ধত আচরণ, গর্বিত মনোভাব এবং রাজনৈতিক ভ্রান্তিকে দায়ী করেছেন।

ইংরেজরা এবার আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করল। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি তারা পণ্ডিচেরী আক্রমণের জন্য সবেগে ধাবিত হল এবং পণ্ডিচেরীর প্রবেশ পথে আরিয়াকুপ্‌ম (Ariacoupam) গীর্জার পতন ঘটল। ফরাসী সৈন্যবাহিনী এই হঠাৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। দুপ্লেক্স ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে সপরিবারে একটি পুরাণো গীর্জায় আশ্রয় নিলেন।

আরিয়াকুপ্‌ম গীর্জার পতনের সংবাদে পণ্ডিচেরীতে রটনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। ভীত এবং সন্ত্রস্ত নগরবাসী প্রাণ এবং সম্পত্তির নিরাপত্তার অভাবে অনেকেই পণ্ডিচেরী ত্যাগ করলেন। শহরত্যাগী নগরবাসীর মধ্যে চাঁদা সাহেবের বেগম, তানাপ্পা মুদালি ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন। পণ্ডিচেরীর চরম বিপদের দিনেও মাদাম দুপ্লেক্স অর্থ উপার্জনের লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না। রাঙাপুলে লিখেছেন যে মাদাম দুপ্লেক্স অত্যন্ত গোপনে শহর এবং দুর্গের আশেপাশে কয়েকশত গুপ্তচর মোতায়েন রেখেছিলেন যাদের কাজ ছিল শহরত্যাগী নরনারীদের কাছ থেকে বলপূর্বক অর্থ এবং অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে গভর্ণর পত্নীর কাছে জমা দেওয়া। নিরীহ এবং আতঙ্কিত নাগরিকদের এইভাবে সর্বস্বান্ত করার পন্থাকে অনেকে অপছন্দ করলেও গভর্ণর পত্নীর আদেশকে কেউই প্রতিবাদ করতে সাহসী হন নি; কারণ তারা জানতেন যে তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করলে যে কোন সময়ে তাদের বিপদে পড়তে হবে। এই সব ঘটনা মাদাম দুপ্লেক্সের নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার জলন্ত নিদর্শন। এবং অর্থগৃধ্নুতার যূপকাষ্ঠে আপন বিবেককে বলি দিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

ইংরেজদের ক্রমাগত গোলাবর্ষণে শহরের রীতিমত ক্ষয় ক্ষতি হল। বহু

ঘর-বাড়ী গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত হল। নিহতও হয়েছিল কিছু সংখ্যক লোক। কিন্তু পণ্ডিচেরীর পতন ঘটে নি। প্রায় দু'মাস শহরটি অবরুদ্ধ ছিল। গভর্ণর হিসেবে পণ্ডিচেরীকে রক্ষা করার যা কিছু করণীয় দুপ্লেক্স তা সবই করেছিলেন। কিন্তু মাদাম দুপ্লেক্সের অসীম সাহসিকতা, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং রাজনৈতিক চাতুর্য পণ্ডিচেরীর ওপর ইংরেজদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। শহরের নাগরিকবৃন্দের চালচলন ও মনোভাব এবং শত্রু পক্ষের তৎপরতা সম্বন্ধে খবর সংগ্রহের জন্য তিনি একটি বৃহৎ গুপ্তচর চক্র সংগঠিত করেন এবং গীর্জার মধ্য থেকেই প্রয়োজন অনুযায়ী আবদুর রহমনকে সৈন্য পরিচালনার টুকিটাকি উপদেশ দিতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিচেরীকে রক্ষা করার জন্য মাদাম দুপ্লেক্সের ভূমিকা গভর্ণরের অপেক্ষায় কোন অংশেই তুচ্ছ ছিল না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আক্রমণকারী ইংরেজ সৈন্য বাহিনীর একটি বৃহৎ অংশ আমাশায় রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। এছাড়া স্যাঁত-স্যাঁতে জলাভূমির ওপর দিয়ে চলাফেরার জন্য তাদের হাত-পা রীতিমত ফুলে ওঠার ফলে তারা সৈনিকসুলভ তৎপরতা হারিয়ে ফেলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল খাদ্যাভাব এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আরও কয়েকটি জিনিষের অভাব। এই সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ইংরেজ সৈন্যরা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেনি। শেষ পর্যন্ত তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। পণ্ডিচেরীকে মুক্ত করার পশ্চাতে মাদাম দুপ্লেক্সের ভূমিকা দুপ্লেক্স সকলের কাছেই স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে লিখলেন "Ma femme est tre´s sensible aux marques d'estime que vous voulez bien lui accorder, elle vous en est fort oblige´ et je puis vous assurer que cette amiable personne est bien digne de l'estime general de tout la nation, pour sa conducte pendant la siege de cette place, air elle a rendu des services essentials et tenu des propos dignes de l'ancienne Rome."

পণ্ডিচেরীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মাদাম দুপ্লেক্স তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। দক্ষিণ ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের

দরবারে মাদাম দুপ্লেক্স একটি পরিচিত নাম। চাঁদা সাহেব বহুদিন ধরেই ফরাসীদের বন্ধু। তিনি বহুবার পণ্ডিচেরীতে মাদাম দুপ্লেক্সের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। চাঁদা সাহেবের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। কর্ণাটের নবাব আনওয়ারউদ্দীন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মাফুজ খাঁর সঙ্গে প্রথমে তাঁর একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে উত্তরাধিকারীর যুদ্ধ আরম্ভ হলে ফরাসীরা চাঁদা সাহেব এবং মুজাফর জঙ্গের পক্ষ সমর্থন করে। আনওয়ারউদ্দীন যুদ্ধে নিহত হন; মাফুজ খাঁ বন্দী হন। নাজির জঙ্গও নিহত হন। নবাবী পাওয়ার পর মুজাফর জঙ্গ মাদাম দুপ্লেক্সকে কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি স্বরূপ দুটি ছিট মহল উপহার দেন। আর দুপ্লেক্স পেলেন সাতহাজার মনসবদারীর খেতাব। মহীশূরের রাজার সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বসূচক চিঠি পত্র লিখতেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের রাজা এক দূত মারফৎ দুপ্লেক্স এবং মাদাম দুপ্লেক্সকে কিছু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠান। তাঞ্জোরের রাজদরবারে ফরাসী প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এই সব দেশীয় নৃপতিদের সঙ্গে পত্রালাপে মাদাম দুপ্লেক্স কখনই নিজের নাম ব্যবহার করতেন না; গভর্ণরের নামেই চিঠিপত্র লিখতেন। দক্ষিণভারতে দেশীয় রাজন্যবর্গের দরবারে ফরাসী প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুদৃঢ় করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ধুরন্ধর বৈদেশিক মন্ত্রীর সমস্ত গুণাবলীই তিনি আয়ত্ত করতে সক্ষম হন এবং ফরাসী স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁর কূটনৈতিক জ্ঞানকে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে প্রয়োগ করেন।

১৭৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে দুপ্লেক্স এবং মাদাম দুপ্লেক্স গৌরব এবং সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করলেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে মাদাম্ দ্য পম্পাদুর (Madam Pompadour) ফ্রান্স থেকে তাঁদের জন্য কিছু উপহার পাঠালেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে দুপ্লেক্স ফরাসী সম্রাটের অনুমতিক্রমে "মারকুইজ" (Marquis) উপাধি ব্যবহারের অনুমতি পেলেন। কিন্তু সম্মান বা গৌরব তাঁদের জীবনে চিরস্থায়ী হয় নি। ভাগ্যদেবীর বদান্যতা থেকে তাঁরা ধীরে ধীরে বঞ্চিত হতে লাগলেন। জীবনে তাঁরা সম্মান, শ্রদ্ধা, ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি—সবই পেয়েছিলেন। দুপ্লেক্স বাংলাদেশে থাকাকালীন মোগল সম্রাটের কাছ থেকে পাঁচ হাজারী মনসবদারের খেতাব পেয়েছিলেন। ব্যক্তিগত এবং কোম্পানীর

বাণিজ্য অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন। বীরত্বের সঙ্গে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। মাদাম দুপ্লেক্সও একাধিকবার তাঁর যোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার পরিচয় পেয়েছেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং রাজনৈতিক সচেতনতার কথা মাদাম দ্য পম্পাদুরের কানে পৌঁচেছে। দিল্লীর বাদশাহ তাঁর যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের চাকা কখনই সমান তালে চলে না ; উত্থান এবং পতন স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। দুপ্লেক্স এবং মাদাম দুপ্লেক্সের জীবনেও সেই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নি। পূর্বেই দেখেছি পণ্ডিচেরীতে নবাগত যুবক দুপ্লেক্সকে অত্যন্ত ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বলি হতে হয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে পণ্ডিচেরীতে ফিরে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিপত্তি এবং মাদাম দুপ্লেক্সের গর্বিত মনোভাব এবং সকল বিষয়ে প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ অনেকেরই বিরক্তির কারণ হয়েছিল এবং তাঁদের দোষত্রুটির ওপর বিপক্ষ দল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে আসছিলেন। দুপ্লেক্সের কদলুর আক্রমণের পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যর্থতা, ইংরেজ কর্তৃক পণ্ডিচেরী আক্রমণ এবং আক্রমণের ফলে পণ্ডিচেরীর ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহতের সংখ্যা ইত্যাদি ঘটনা বিরোধী পক্ষীয়দের হাতে তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ এনে দিয়েছিল। দুপ্লেক্সের বিরুদ্ধে অবশ্য আরও মারাত্মক অভিযোগ ছিল। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন পণ্ডিচেরীর বহু ধনী বণিক গভর্ণরের কাছে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা জমা রেখেছিলেন। দুপ্লেক্স এই অর্থ আত্মসাৎ করেছিলেন কি না তার কোন প্রমাণ নেই। তবে তিনি ঐ অর্থের কোন হিসেব দিতে পারেন নি। গদেউ (Godheu) আসার সাথে সাথেই তাঁরা সদলবলে গচ্ছিত অর্থ আদায়ের জন্য তাঁর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেন। দুপ্লেক্সের এই অপকীর্ত্তির দায়িত্ব ফরাসী কোম্পানী বা সরকার বহন করতে রাজি হন নি এবং এই অভিযোগ থেকে দুপ্লেক্সকে মুক্ত করার জন্য মাদাম দুপ্লেক্স বহু চেষ্টা করেছিলেন। এই ধরনের বহু দোষ ত্রুটি একত্রিত করে বিপক্ষ দল ফ্রান্সে একটি অভিযোগ পত্র পাঠালেন। তাঁরা আরো অভিযোগ করলেন যে, দুপ্লেক্স সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খেয়াল খুসী দ্বারা পরিচালিত হয়েই ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের যুদ্ধে লিপ্ত করেছেন, বিশেষতঃ কর্তৃপক্ষ যখন তাঁকে সকল রকম যুদ্ধ এড়িয়ে চলার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল। এছাড়া ইংরেজদের

সঙ্গে যুদ্ধ চলার সময়ে করমণ্ডল উপকূলে ফরাসীদের ব্যবসা বাণিজ্য বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কোম্পানী ব্যবসায়ের সমঝদার, সুতরাং বাণিজ্যিক ক্ষতি স্বীকার করতে ডিরেক্টররা প্রস্তুত নন। তাঁরা ছুপ্লেক্সকে ডেকে পাঠানই মনস্থ করলেন এবং ফরাসীরাজের এক আদেশনামা অনুযায়ী তাঁকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হল। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য মঁসিয়ে গদেউ ('Monsieur Godheu') নামে এক ব্যক্তিকে পাঠান হল। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট গদেউ কারিকলে অবতরণ করলেন। ছুপ্লেক্স এবং মাদাম ছুপ্লেক্স এই দুঃসংবাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এবং অসম্মানজনক সংবাদটি পণ্ডিচেরীতে ছড়িয়ে পড়তে বেশী সময় লাগল না। পণ্ডিচেরীতে আবার গভর্ণর এবং গভর্ণর পত্নীকে নিয়ে চাপা কানাঘুষা চলল। ছুপ্লেক্স অপেক্ষা মাদাম ছুপ্লেক্স বেশী অপমানিত বোধ করলেন যখন তাঁর বিশ্বস্ত এবং প্রিয়ভাজন পাপিয়াপুলকে * (Papiapoulle) বন্দী করা হল।

ভারতবর্ষ ত্যাগ করার নির্দেশ পাওয়ার পর থেকেই মাদাম ছুপ্লেক্সের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটল। শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে এবং অপমানে তিনি ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর প্রিয় সহর পণ্ডিচেরী ত্যাগ করে যাওয়ার কথা তিনি কোনদিনই কল্পনা করেন নি। বহুদিন রাতে তিনি গোপনে অশ্রুপাত করেছেন। অবশেষে তাঁরা সপরিবারে ভারতবর্ষ থেকে চির বিদায় নিলেন—১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে। দীর্ঘ সমুদ্র পথ অতিক্রম করে তাঁরা পরের বছর মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সে পৌছলেন। কিন্তু ফ্রান্সের মূল ভূ-খণ্ডে অবতরণ করার আগেই লোরিয়া (Lorient) দ্বীপে তাঁদের তিনটি জাহাজ ভর্ত্তি জিনিষপত্র আটক করা হল এবং সামান্য কিছু জিনিষপত্র ছাড়া সবই বাজেয়াপ্ত করা হল। ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্যের এককালীন কর্ণধার ছুপ্লেক্স চরম লাঞ্ছনার মধ্যে পড়লেন।

প্যারিসে ছুপ্লেক্স পরিবার একটি সাধারণ হোটেলে আশ্রয় নিলেন।

* মাদাম ছুপ্লেক্সের আশ্রয়ে লালিত এই ভদ্রলোক নানা অবৈধ পন্থায় বহু অর্থ উপার্জন করেন। খাস পণ্ডিচেরী শহরে তিনি ছিলেন ১৭টি বাড়ীর মালিক, মাদ্রাজ এবং তদ্‌নুরে ছিল তাঁর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আরো কিছু সম্পত্তি।

দুপ্লেক্স কর্তৃপক্ষের প্রায় সকলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করলেন। নিজেকে অভিযোগ মুক্ত করার জন্য তিনি ভারতবর্ষে ফরাসী বাণিজ্য এবং ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটা আলোচনা করলেন। কেউ কেউ তাঁর বক্তব্যে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু নব নিযুক্ত কণ্ট্রোলার জেনারেল দ্য ফিনান্স মঁসিয়ে দ্য মোরাজ (Monsieur de Moras) তাঁর বক্তব্যকে কোন গুরুত্ব দিলেন না। ইতিমধ্যে দুপ্লেক্স পরিবার শোচনীয় আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়লেন। পাওনাদারদের তাগিদে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেল। অবস্থার এতই অবনতি ঘটল যে, জীবন ধারণের জন্য প্রত্যহই মাদাম দুপ্লেক্সকে কিছু কিছু অলঙ্কার পত্র বিক্রী করতে হল। ভারতবর্ষ থেকে যে সব চাকর-বাকর তাঁরা সঙ্গে এনেছিলেন তাঁরাই এ ব্যাপারে তাঁদের প্রধান সহায়ক ছিল। পারিবারিক জীবনের ওপর যখন এই ধরনের বিপর্যয় নেমে এল মাদাম দুপ্লেক্সের পক্ষে তখন নিশ্চুপ থাকা সম্ভব হয় নি। অতীতে স্বামীর বিপদের দিনে তিনি সব সময়েই তাঁকে সাহায্য করেছেন। তিনি একাধিকবার মসিয়ে দ্য মোরাজকে চিঠি লিখলেন এবং ভারতবর্ষে দুপ্লেক্সের কার্যকলাপের সমস্ত ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। সরকারী কৃপালাভের জন্য অত্যন্ত নমনীয় ভাষায় লেখা চিঠিতে তিনি দুপ্লেক্সের বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার প্রশংসা করলেন এবং ভারতবর্ষে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ফরাসী স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষায় তাঁর নিষ্ঠার কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি আরও উল্লেখ করলেন যে দীর্ঘদিন দুপ্লেক্স ভারতবর্ষে কোম্পানী তথা ফরাসী স্বার্থ রক্ষার জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন—প্রতিদানে তিনি কিছুই পাননি; পরন্তু কয়েকটি দুর্বল অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে ভিক্ষুকের পর্যায়ে অবনমিত করা হয়েছে। তাই তিনি বারবার আবেদন করেছেন তাঁর স্বামীকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য—করুণ মিনতি জানিয়েছেন পাওনাদাররা যেন তাঁর স্বামীকে জেলখানায় পাঠিয়ে সম্মানের অবশিষ্ট অংশটুকুও ধূলুণ্ঠিত না করে।

প্যারিসে ব্যস্ততা এবং দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিচেরীর কথা মাদাম দুপ্লেক্সের স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মাদ্রাজের ইংরেজ গভর্ণর-পত্নী মাদাম মর্স'কে (Madame Morse) এক

চিঠিতে লিখলেন : "পণ্ডিচেরী থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিচেরীকে তিনি ভোলেন নি—ভুলতে পারা সম্ভবও নয়। ফ্রান্সে থাকলেও তাঁর মন পড়ে আছে পণ্ডিচেরীতে। তাঁর প্রিয় শহর ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার জন্য তিনি অত্যন্ত কাতর; কিন্তু পণ্ডিচেরীর সবুজ এবং শ্যামল প্রাকৃতিক দৃশ্য সব সময়েই তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।" সরকারের নিকট তাঁর অনুরোধ ব্যর্থ হয়েছে। অনাস্বাদিত দারিদ্র্য, প্রতিকূল পরিবেশ এবং অপরিচিত সমাজ অতীতের গর্বিত জোহানা বেগমকে অক্টোপাশের মতন পিষ্ট করে দিল। ফ্রান্সে আসার পর থেকেই নাদান ডুপ্লেক্সের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। ফ্রান্সের জলবায়ু তাঁর সহ্য হয়নি একথা তিনি পণ্ডিচেরীতে পরিচিত অনেককেই জানিয়েছিলেন। সরকারের রূঢ় এবং বিবেচনাহীন ব্যবহারও তাঁকে রীতিমত আঘাত দিয়েছিল। দুশ্চিন্তা, দারিদ্র্য এবং অপমানের দংশনে তিনি মানসিক স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেললেন এবং ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে এক করুণ পরিবেশের মধ্যে নাদান ডুপ্লেক্স শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

———

UNIVERSITY

ইতিহাস

নব পর্য্যায় দ্বিতীয় বর্ষ ঃ বৈশাখ-চৈত্র ১৩৭৪

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অবলুপ্তির পথে তিব্বত কল্যাণকুমার চক্রবর্তী	২৫৬
উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার কুণাল সিংহ	১৮৪
কর্ণসুবর্ণ সুধীররঞ্জন দাস	১, ৭৭, ২১৯
খাকসার আন্দোলনের ইতিহাস অমলেন্দু দে	২০০
চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘ ও বন্দেমাতরম পত্রিকা কুণাল সিংহ	২৭১
জিয়াউদ্দীন বারাণীর ইতিহাস দর্শন গৌতম ভদ্র	৯৯, ১৬৭
দক্ষিণ চব্বিশপরগণায় পর্তুগীজ কালিদাস দত্ত	১৭৬
পত্র পত্রিকার ইতিহাস	৬৮
প্রাচীন শিবিজাতির ইতিহাস বেলা লাহিড়ী	৫৪
বহু বিবাহ সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা অসীম মুখোপাধ্যায়	৪১

বিদ্রোহী বীর প্রতাপাদিত্য (প্রতিবাদ ও উত্তর) ১৩৩
বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারতে গ্রামীণ সংস্কৃতির উদ্ভব ও প্রসার ৬২
দিলীপ কুমার চক্রবর্তী
মধ্যযুগের যুদ্ধ ও ভারতীয় সমাজ ১৪৫
ভক্তপ্রসাদ মজুমদার
মাদাম হুমায়ুন ৩৩, ২৭৭
অজিত নিয়োগী
র‍্যাল্‌ফ ফিচের চোখে বাঙালা দেশ ১২৫
সাধা দত্ত
শিশুমেধ ১৯০
বেলা দত্তগুপ্ত
স্মৃতিকথা ২২, ১১২, ১৪৭,২৪৮
রমেশচন্দ্র মজুমদার

ইতিহাস

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি।

১।	সংবাদ পত্রের নাম	ইতিহাস
২।	যে ভাষায় প্রকাশিত হইবে	বাংলা
৩।	প্রকাশের সময় ব্যবধান	ত্রৈমাসিক, বৈশাখ হইতে বৎসর আরম্ভ।
৪।	খুচরা বিক্রয় মূল্য	২·৫০ প্রতি সংখ্যা
৫।	প্রকাশক	শ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী (ভারতীয়)
		ঠিকানা : ৩০২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা—৯
৬।	প্রকাশের স্থান	৩০২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা—৯।
৭।	মুদ্রক	শ্রীনলিন রায় (ভারতীয়)
৮।	যে প্রেসে ছাপা হইবে তাহার নাম ঠিকানা	অটো প্রিন্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস ৪৯ বলদেও পাড়া রোড। কলিকাতা-৬
৯।	সম্পাদক	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার (ভারতীয়) ৪ বিপিন পাল রোড কলিকাতা-২৬।
		শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ (ভারতীয়) ৮৫এ, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯।
		শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী (ভারতীয়) গভর্নমেণ্ট হাউসিং এস্টেট। গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা ১৯।
১০।	সত্বাধিকারী	ক্যালকাটা হিস্টরিকাল সোসাইটি ঠিকানা : ৩০।১, আনহাইট্রীট, কলিকাতা-৯

আমি, শ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

স্বাঃ শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
প্রকাশক, ইতিহাস ত্রৈমাসিক পত্রিকা।